নারায়ণ সান্যাল

ষাট, একষট্টি...

ষাট, একষট্টি...

শঙ্খ ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন : ২২৪১ ২৩৩০, ২২১৯ ৭৯২০, ফ্যাক্স : (৯১-০৩৩) ২২১৯ ২০৪১
e-mail : deyspublishing@hotmail.com

SHAT, EKSHATTY...
a Reminiscence by NARAYAN SANYAL
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 60.00

ISBN : 81-7079-572-9

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল 1985, বৈশাখ ১৩৯২
তৃতীয় মুদ্রণ : জুলাই 2005, আষাঢ় ১৪১২
রচনাকাল : 1984
গ্রন্থক্রম : 64

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

দাম : ৬০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শ্রীমতী অনিন্দিতা বাসু

এবং

শ্রীমান অমিতাভ বাসুর

যুগ্মকরকমলে

আশীর্বাদসহ

নারায়ণ সান্যাল

নারায়ণ সান্যাল রচিত গ্রন্থতালিকা, বইমেলা 2005 পর্যন্ত

বিষয়বস্তুর ক্রমানুসারে সজ্জিত। নামের পর সংখ্যাটি রচনার ক্রম চিহ্ন। Ψ দে'জ পাবলিশিং এবং ❋ চিহ্ন দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত। ৺চিহ্নিত গ্রন্থ নিঃশেষিত, লেখকের নির্দেশমতো পুনঃপ্রকাশিত হবে না। অচিহ্নিত পুস্তক অন্যান্য প্রকাশকের।

(A) যুক্তাক্ষরবর্জিত শিশু সাহিত্য; (B) সদ্যসাক্ষর বয়স্ক সাহিত্য। (C) কিশোর-কিশোরীদের জন্য, (D) না-মানুষ সংক্রান্ত; (E) দেবদাসী সম্পৃক্ত; (F) বিজ্ঞান আশ্রয়ী (G) প্রযুক্তি-আশ্রয়ী,(H) চিত্র-স্থাপত্য-ভাস্কর্য বিষয়ক,(I) স্মৃতিচারণধর্মী; (J) ভ্রমণ সাহিত্য, (K) মনোবিজ্ঞান আশ্রয়ী, (L) গোয়েন্দা কাহিনি; (M) গবেষণাধর্মী; (N) উদ্‌বাস্তু সংক্রান্ত (O) ইতিহাস আশ্রয়ী (P) নাটক (Q) জীবনী-আশ্রয়ী (R) সামাজিক উপন্যাস (S) সংকলন গ্রন্থ ও হরেকরকম্বা

(A) যুক্তাক্ষর বর্জিত শিশু সাহিত্য :

Ψ নাকউঁচু 66
❋ হাতি আর হাতি 79
❋ গাছ-মা 86
Ψ কড়ুরয় ও খুকু মা

(B) সদ্যসাক্ষর বয়স্ক সাহিত্য :

৺ গ্রাম্যবাস্তু 4
৺ পরিকল্পিত পরিবার 5
৺ দশেমিলি 8
৺ গ্রামের বাড়ি 11

(C) কিশোর-কিশোরী সাহিত্য :

Ψ কালোকালো 25
শার্লক হেবো 26
৺ কিশোর অমনিবাস 51
Ψ ডিজনেল্যান্ড 67
❋ ভূতায়ন 109

(D) না-মানুষ সংক্রান্ত :

Ψ গজমুক্তা 30
তিমিতিমিঙ্গিল 50
Ψ না-মানুষের পাঁচালী 57
Ψ রাস্কেল 60
Ψ না মানুষী বিশ্বকোষ (এক) 74
Ψ না মানুষের কাহিনী 76
Ψ না-মানুষী বিশ্বকোষ (দুই) 83

(E) দেবদাসী-সম্পৃক্ত :

❋ সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম 58
❋ সুতনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয় 59

(F) বিজ্ঞান-আশ্রয়ী :

Ψ বিশ্বাসঘাতক 32
বিহঙ্গ বাসনা 33
অবাক পৃথিবী 39
নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা 40

(G) প্রযুক্তি আশ্রয়ী :

বাস্তুবিজ্ঞান 6
Handbook of Estimating 12
Ψ আজি হতে শতবর্ষ পরে 38
অরিগামি 55
Ψ বাস্তুশিল্প 99

(H) চিত্র স্থাপত্য ভাস্কর্য :

অজন্তা অপরূপা 19
কারুতীর্থ কলিঙ্গ 29
Ψ ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন 52
লা জবাব দেহ্‌লী, অপরূপা আগ্রা 66
Ajanta 61
Erotica in Indian Temples 62
Ψ রোদ্যাঁ 63
Ψ প্রবঞ্চক 7
❋ আর্টিমিসিয়া 140

(I) স্মৃতিচারণ ধর্মী :

Ψ পঞ্চাশোর্ধ্বে 41
Ψ ষাট-একষট্টি... 64
Ψ আবার সে এসেছে ফিরিয়া 80

(J) ভ্রমণ সাহিত্য :

Ψ পথের মহাপ্রস্থান 16
Ψ জাপান থেকে ফিরে 27
পয়োমুখম্ 73

(K) মনোবিজ্ঞান আশ্রয়ী :

Ψ অন্তর্লীনা 18

(L) গোয়েন্দা কাহিনি :

Ψ নাগচম্পা 21
Ψ সোনার কাঁটা 34
Ψ মাছের কাঁটা 35
Ψ পথের কাঁটা 42
ঘড়ির কাঁটা 46
উলের কাঁটা 68
Ψ অ-আ-ক-খুনের কাঁটা 72
Ψ সারমেয় গেণ্ডুকের কাঁটা 77
রিস্তেদারের কাঁটা 92
কৌতূহলী কনের কাঁটা 95
Ψ যাদু এতো বড় রঙ্গের কাঁটা 94
Ψ 'অভিপূর্বক, নী-ধাতু অ'-এর কাঁটা 95
ন্যায়নিষ্ঠ ন্যাসনাশীর কাঁটা 96
Ψ দ্বি-বৈবাহিক কাঁটা 97
Ψ যমদুয়ারে পড়ল কাঁটা 98
❋ দর্পণে প্রতিবিম্বিত কাঁটা 118
Ψ একবৃন্তে দুটি কাঁটা 112
সকল কাঁটা ধন্য করে 119
❋ বিশের কাঁটা 104
❋ ড্রেস-রিহর্সালের কাঁটা 120
❋ মোনালিজার কাঁটা 122

(M) গবেষণাধর্মী :

Ψ দণ্ডকশবরী 11
Ψ নেতাজী রহস্য সন্ধানে 22
Ψ চীন-ভারত লঙ মার্চ 43
Ψ এক দুই তিন 100
Ψ খাণ্ডবদাহন 108
Ψ রূপমঞ্জরী, এক 82
Ψ লেঅনার্দোর নোটবই এবং 89
স্বর্গীয় নরকের দ্বার 90
Ψ রূপমঞ্জরী, দুই 115
অগ্নিকন্যা মমতা 116
Ψ শহিদ-তর্পণ—প্রসঙ্গ কাশ্মীর 121
বাঙালিয়ানা 134
পয়োমুখম্ 73

(N) উদবাস্তু সংক্রান্ত :

বকুলতলা পি.এল. ক্যাম্প 2
বল্মীক 3
Ψ অরণ্যদণ্ডক 10

(O) ইতিহাস-আশ্রয়ী :

মহাকালের মন্দির 14
হংসেশ্বরী 44
আনন্দস্বরূপিণী 44
Ψ লাডলি বেগম 69
❋ শের-ই-শহিদ দ্বীপ 131
ফিরে দেখা, গান্ধীজি ও নেতাজি 133

(P) নাটক :

৺ মুশকিল আসান

(Q) জীবনী আশ্রয়ী :

Ψ আমি নেতাজিকে দেখেছি 23
আমি রাসবিহারীকে দেখেছি 23
Ψ লিন্ডবার্গ 49
রানী কাদম্বিনী 111
Ψ দান্তে ও বিয়াত্রিচে 112
❋ কনকলতার সন্ধানে 132

(R) সামাজিক উপন্যাস ইত্যাদি :

মনামী 9
অলকানন্দা 12
Ψ নীলিমায় নীল 15

সত্যকাম 17
Ψ তাজের স্বপ্ন 20
Ψ পাষণ্ডপন্ডিত 24
আবার যদি ইচ্ছা কর 28
অশ্লীলতার দায়ে 36
Ψ লালত্রিকোণ 37
প্যারাবোলা স্যার 45
মিলনান্তক 65
পূরবৈয়াঁ 70
অচ্ছেদ্যবন্ধন 75
ছয়তানের ছওয়াল 78
ছোঁবল 91
Ψ মান মানে কচু 87
Ψ আম্রপালী 88
Ψ রানী হওয়া 101
Ψ এমনটা তো হয়েই থাকে 91
Ψ বুলডোজার লেডি 107
Ψ হিন্দু না ওরা মুসলিম 102
❋ মৃত্যোর্মা অমৃতম 136
প্রেম 135

(S) সংকলন গ্রন্থ ও হরেকরকম্বা

Ψ কাঁটায় কাঁটায়, এক 84
Ψ কাঁটায় কাঁটায়, দুই 85
Ψ কাঁটায় কাঁটায়, তিন 103
সেরা বারো 105
Ψ খোলামনে 106
❋ দেবদাসী সুতনুকা 113
Ψ কাঁটায় কাঁটায়, চার 114
Ψ অবিস্মরণীয়া 123
Ψ অনির্বচনীয়া 124
বাছাই গল্প 125
Ψ কিশোরী সমগ্র 126
Ψ কিশোর সমগ্র 127
Ψ সোনার বাঙলা 128
Ψ কাঁটায় কাঁটায়, পাঁচ 129
Ψ কাঁটায় কাঁটায়, ছয় 130
Ψ দশটি উপন্যাস 138
❋ কাঁটা চার 139

নারায়ণ সান্যাল ও প্রদীপ দত্ত
অরিগামি ও কাগজ-ভাঁজের খেলা

কৈফিয়ৎ

পঞ্চাশটা বছর পাড়ি দিয়ে রচনা করেছিলুম : পঞ্চাশোর্ধ্বে। সেটা ছিল পরস্মৈপদী ধাতুতে গড়া—অর্থাৎ আমার দেখা গুটিকতক পঞ্চাশোর্ধ্ব বৃদ্ধের কথা। দশ বছর বাদে এবার লিখেছি নিছক আত্মনেপদী ধাতুতে একটিমাত্র বৃদ্ধের কাহিনি। প্রথম সমস্যা হল : নামকরণ। অনেক ভেবেচিন্তে প্রথম কেতায় নাম দিয়েছিলুম : 'ষাটের ঘাটে'।

বেশ একটা জবর ধ্বনিসাযুজ্য আছে পাশাপাশি ঠাঁই পাওয়া শব্দ দুটির। বাদ সাধল সুধাংশু, মানে প্রকাশক স্বয়ং। পরিণত-বয়স্ক লেখকের গ্রন্থে ওই নামকরণটা তার ভালো লাগল না। 'তালব্যশ-য়ে ম-য়ে' দিয়ে শুরু কী একটা অলক্ষুণে শব্দের সঙ্গে ওই 'ঘাট' শব্দটার ধ্বনিসাযুজ্যই কানে বাজল তার। বোধকরি শেষ লেখাটির শেষাশেষি পৌঁছে। বললে, 'ষাট-ষাট, অমন একটা বিশ্রী নাম দেবেন না।'

আমি বলি, ঠিক আছে, তবে ওই নামই থাক। তুমি যা বললে।

—আমি আবার কী বললাম?

—ওই যে, 'ষাট-ষাট'!

শুনে আর এক বন্ধু বললে, 'এটা ন্যাকামি। ক্রেতাপাঠক যখন ভাবতে বসবে টাকাগুলো জলে গেল, তখন তোমার ওই নামকরণের সান্ত্বনাবাণীটা হবে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে!'

কথাটা ভাববার!

বইটা যে ওকেই উৎসর্গ করা হচ্ছে এ সংবাদটা গোপন রেখে আমি অমিতের পরামর্শ চেয়ে পাঠাই। দেখি, ও কী বলে! অচিরে আধখানা পৃথিবী পাড়ি দিয়ে এসে গেল জামাই-এর জবর জবাব, "আপনার পরিণত জীবনের ঘটনা-পরম্পরা পড়তে বসাটা পাঠকের কাছে এমন কিছু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার নয় যে, তাদের পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দেবার কোনো দায়িত্ব বা প্রয়োজন আছে আপনার। বরং নামের মধ্যে দিয়ে আপনার লেখনীর প্রবাহ যে নিত্যবৃত্ত অতীত থেকে ঘটমান বর্তমান অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পথে...পা বাড়াতে চলেছে সেই প্রবহমানতার একটা ইঙ্গিতই থাক না? ওর নাম হোক—'ষাট, একষট্টি, বাষট্টি...'

আমি ভাবি, সেই ভালো। পাঁঠাটি যখন ওকেই উচ্ছুগ্যু করা হচ্ছে তখন ল্যাজামুড়ো কোনদিকে কাটবে তা ওই বরং স্থির করুক। তাছাড়া সুকুমারসাহিত্যের নির্দেশটাও তো তাই। এই 'হ-য-ব-র-ল' রচনায় উধো-বুধোর নিলামের ডাক যদি বাড়তে থাকে তাতে আমি বাধা দেবার কে?

নামকরণের দায়িত্ব এড়ানো গেছে। এবার রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ :

প্রথম তিনটি রচনার বিষয়-নির্ধারণের দায়-দায়িত্ব আমার নয়। সেগুলি নিতান্তই 'দেশ'-এর ডাকে সাড়া দেওয়া। প্রসঙ্গত বলি, ওই তিনটি ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে রচিত নিবন্ধে আনুমানিক পনেরো হাজার শব্দ আছে, অর্থাৎ প্রায় দেড়হাজার পংক্তি। 'দেশ'-সম্পাদক তার ভিতর একটিমাত্র পংক্তি লেখকের বিনা অনুমতিতে সংশোধন করে ছেপেছেন। সংবাদ-সাহিত্যের প্রচলিত রীতি—আমন্ত্রিত রচনায় সম্পাদক কলম চালাবেন না। অন্তত লেখকের অনুমতি নেবেন। 'দেশ'-সম্পাদক তা নেননি। প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করলেও তিনি তাঁর অধিকার-বহির্ভূত কিছু করেননি। সেই পংক্তিটি এ-গ্রন্থের পৃষ্ঠা ২০-র প্রথম লাইন। মূল প্রবন্ধে আমি যা লিখেছিলুম সম্পাদকের উপর টেক্কা দিতে—আমি তাই এখানে ছেপেছি। দেশ-সম্পাদকের সংশোধিত পংক্তিটি—যা ১৯৮৩-র সাহিত্য-সংখ্যা দেশ-এ ছাপা হয়েছিল, তা এই : "ধন্যবাদ প্রাপ্য 'দেশ'-পত্রিকার সম্পাদকের।"

এত কথা বলছি একটা বিশেষ কারণে। ওই সম্পাদকটির চরিত্রের একটা বিশেষ দিক পাঠকবর্গকে জানাতে। প্রচারবিমুখ সাগরময়বাবু (আজ্ঞে হ্যাঁ, যদিচ তিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং যদিও আমরা দুজন এক পাড়াতেই দীর্ঘদিন বসবাস করেছি তবু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়টা এমন ঘনিষ্ঠ হয়নি যাতে, আরও অনেক সমকালীন কথা-সাহিত্যিকের মতো তাঁকে 'সাগরদা' ডাকতে পারি) কীভাবে অন্তরালে থেকে সাহিত্যসেবা করেন তার একটা উদাহরণ এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়ে থাক না।

আর একটা কৈফিয়ৎ দেবার আছে এ-গ্রন্থের দ্বাবিংশ পৃষ্ঠায় লেখা বিষয়টির সম্বন্ধে। কৈফিয়ৎ ঠিক নয়, কনফেশন। শুনেছি, স্বীকারোক্তিতে পাপস্খালন হয়। রোমান ক্যাথলিকরা তো তাই বলেন।

বছর দুয়েক আগে লিখেছিলুম—'নাম-সাযুজ্যে কেউ যদি বিদেশে আমাকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলে ভুল করে তবে আমার উচিত হবে ভ্রমণ-কাহিনিতে সে-কথা ছেপে যাওয়া নয়, চেপে যাওয়া। তখন জানতুম না, ঘটনাটা সত্যিই আমার জীবনে একদিন ঘটবে এবং তখন আমি ভিন্ন অর্থে তা 'চেপে' যাব।

লস্-অ্যাঞ্জেলেস্-এর দুর্গাপূজা মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে গেছি। আমার সহপাঠী অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। হয় তার মাধ্যমে, অথবা যাদের বাড়িতে আমি অতিথি সেই শ্যামল-বাবলুর মাধ্যমে আমার পরিচয়টা জানাজানি হয়ে যায়। পূজা-মণ্ডপে নাচ-গান অভিনয়ের ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম। বাচ্চারা 'আলিবাবা' অভিনয় করবে। উদ্যোক্তরা বললেন, এসেই যখন পড়েছেন তখন মঞ্চে উঠে দু-চার কথা বলুন।

আমি রাজি হয়ে যাই। বছর চল্লিশের একজন ভদ্রলোক—কর্মকর্তাদের কেউ হবেন—আমাকে দর্শকদলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিলেন। প্রেক্ষাগৃহে শ-পাঁচেক লোক, তার বৃকোদর-ভাগ প্রাক্তন-বঙ্গ-ভাষাভাষী। মঞ্চে অবতীর্ণ হবার আগে ভদ্রলোক জনান্তিকে আত্মীয় সম্বোধন করে বললেন, মেসোমশাই, আমি ইলেক্‌ট্রনিক্স এঞ্জিনিয়ার, বাংলা বই-টই, মানে বিশেষ পড়ি-টড়িনি; ...ইয়ে হয়েছে, আপনি যদি আপনার লেখা খানকতক বইয়ের নাম বলে দেন...

আমি বলি, কী দরকার? তুমি শুধু বলো, ইনি বই-টই লেখেন—

—না মানে, অন্তত আপনার একাদেমী পুরস্কার পাওয়া বইটার নাম যদি...

আবার বাধা দিয়ে বলি, তুমি ভুল করছ ভাই। একাদেমী পুরস্কার আমি আদৌ পাইনি। তুমি আমার উপর যা-ইচ্ছে গুণের আরোপ করতে পার; শুধু বোলো না—আমি ভালো গান গাই বা ভালো রাঁধতে জানি। কারণ এ পূজা-মণ্ডপে তা যাচাই হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

ইলেক্‌ট্রনিক্স এঞ্জিনিয়ার ক্ষুব্ধ হল। বাবলু আর শ্যামলের সঙ্গে মিনিটপাঁচেক গুজগুজ ফুসফুস করে মঞ্চে উঠল। বেশ বাগিয়ে আমার পরিচয় দিল। আমার লেখা খানকয়েক বইয়ের নামও বাৎলে দিল। বেশ কিছু বাছাবাছা বিশেষণও যোগ করল। তবে আমার অনুরোধটা রেখেছে—গান গাওয়া বা রন্ধন-পারদর্শিতার বিষয়ে সে কিছু বলেনি।

মিনিট কুড়ি বক্তিমে দিয়ে যখন নেমে এলুম তখন—সচরাচর যেমন হয়, কিছু কিশোর-কিশোরী তাদের ডায়েরি অথবা গানের খাতা বাড়িয়ে দিল স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য।

একটি অতি সুদর্শনা বাঙালি ভদ্রমহিলা—মাথায় বব-ছাঁট চুল অথচ পরনে জমকালো বালুচরী—ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখে বললেন, দেশে থাকতে আপনার অনেক-অনেক বই পড়েছি। চাক্ষুষ কখনো দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল আপনার 'দেবতাত্মা হিমালয়'।

মর্মাহত হলুম।

সত্যের খাতিরে ঢোঁক গিলে বলি, ইয়ে....ওটা যিনি লিখেছিলেন, আপনার সেই প্রিয় লেখক স্বর্গত। তাঁর উপাধিটা সান্যাল বটে, কিন্তু নামটা....

ফর্সা মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেল। সলজ্জে বললেন, আয়াম সো সরি! না, আপনিই আমার প্রিয় লেখক। আই মেন্ট : 'শিলালিপি'!

আমি ম্লান হাসি। প্রতিবাদ করিনি। চেপে যাই!

তিনটি কারণে। প্রথম কথা, এবার যদি আমি বলতুম 'শিলালিপি'-র লেখকও স্বর্গত; তাঁর নামটা নারায়ণ হলেও উপাধিটা ছিল ভিন্ন, তাহলেও নিস্তার পেতুম না। ভুলে যাওয়া কৈশোর-স্মৃতি থেকে তিনি আর কোনও ভাগ্যবানকে টেনে আনতেন। আমার মনে হয়েছিল সেক্ষেত্রে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় প্রতিভা অথবা প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরির পাণ্ডিত্যের খানিকটা ভার আমাকে বহন করতে হত। তার চেয়ে এই ভালো। দ্বিতীয় হেতু—ভদ্রমহিলাকে সর্বসমক্ষে বারে বারে অপ্রস্তুত করতে সৌজন্যে বাধছিল। তৃতীয় এবং মুখ্য কারণ যেটি সেটা জনান্তিকে আপনাদের জানাই : ভদ্রমহিলার সঙ্গে গল্পগুজব করতে আমার ভালোই লাগছিল। তিনি খুব দামি সেন্ট মেখেছিলেন এবং প্রকৃতই সুন্দরী।

জানি, শুধু বুলবুলের মা একাই নন, আপনারা সবাই এ কন্‌ফেশান শুনে সমস্বরে আমাকে ধিক্কার দেবেন। বললেন—'ছিছি' বললেও যেন তৃপ্তি হয় না, বলতে ইচ্ছে করে 'তোবা-তোবা'!

কিন্তু সেদিন, সেই মুহূর্তে আমি কর্ণমূলে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলুম—স্বর্গ থেকে স্বয়ং সুনন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হেসে বলেছিলেন—আমি কিছু মনে করিনি 'মিতে'! চালিয়ে যাও ভায়া।

এ-গ্রন্থের পঞ্চম রচনাটি সম্বন্ধে একটা মস্ত কৈফিয়ৎ দেবার আছে।

এবার আমি নিজেই গ্রন্থ-লেখকের প্রচলিত রীতি ভেঙেছি। ওটা আদ্যন্ত অপরের রচনা। আমি সংকলক মাত্র। প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর অন্তরালের ইতিহাসটুকু দাখিল করি—

ওয়ালনাট ক্রীকে বুলবুল, মানে শ্রীমতী অনিন্দিতা বাসু, আমাকে প্রশ্ন করেছিল, 'বাবা, দেশে ফিরে তুমি মার্কিন সমাজ-জীবনের জটিলতা নিয়ে কিছু লিখবে না?'

আমি বলেছিলুম, সম্ভবত না। মাত্র চার-ছয় মাসে সে অধিকার জন্মায় না। আমি তো ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পাইনি। প্রবাসী ভারতীয় সমাজের ছবি আঁকবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু ওদের নয়—

ও বলেছিল, আমি কিন্তু কিছু কিছু লিখেছি। ডায়েরি ধরনের। কিছু গল্পও।

লেখাগুলি পড়েছিলাম। তার ভিতর একটা গল্প—ও নাম দিয়েছিল 'বেলাশেষের গান', আমি চেয়ে এনেছিলাম। ও শর্ত করেছিল কোনো পত্র-পত্রিকায় ছাপাব না আমি। বোকা মেয়েটা বিদেশে থাকে, জানে না, তার বাপের লেখাই কোনো খানদানী পত্র-পত্রিকা ছাপে না, তায় মেয়ের লেখা! নামটা আমিই বদলেছি। আমার 'ষাট-ষাট' নাম যদি ওরা বদলাতে পারে, তাহলে....

তাছাড়া বইটা যখন ওদের নামেই উৎসর্গ করা হচ্ছে তখন যার লেখা তার কাছেই ফিরে যাচ্ছে। শর্ত তো আমি ভাঙিনি। ও রাগ করবে কেন?

আর শেষ রচনাটি সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ আমি দেব না। তলব করব। রচনার শিরোনামা দেখার পরেও ওটা কেন পড়লেন সে কৈফিয়ৎ তো আপনারা পাঁচজন দেবেন আমাকে!

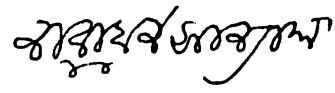

ষাট, একষট্টি...

স্থায়ী, সঞ্চারী, সবশেষে : 'অন্তরা'!

আপনারা যদি আপত্তি না করেন তো বলি, ভ্রমণ-সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি—বাঙলায় উপেন্দ্রকিশোর-এ, ইংরেজিতে লুই ক্যারল-এ। সে আমার ঘুন্সিযুগ আর নিকার-বোকার-যুগের সন্ধিক্ষণে। কোনোক্রমে তখন পড়তে পারি যুক্তাক্ষর-বর্জিত : "আর পারে আমবন তালবন চলে গাঁয়ের বামুন-পাড়া তারি ছায়াতলে।" ইংরেজিতে 'স্লাই ফক্স্' তখনও 'হেন'-এর সাক্ষাৎ পায়নি। উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে প্রথম প্রেম মেজদির জবানিতে; আর এ্যালিস্-এর যাত্রাসঙ্গী হয়েছিলুম বাবার হাত ধরে।

কিন্তু জানি, আপনারা আপত্তি করবেনই। বলবেন, এ কেমন কথা? উপেন্দ্রকিশোরের গপ্পো কিংবা এ্যালিস-এর আজবদেশের কিস্সা ভ্রমণসাহিত্য হতে যাবে কোন দুঃখে? ও-সব তো নেহাৎ গাঁজাখুরি রূপকথা। জবাব দেওয়ার আগে আমি প্রতিপ্রশ্ন তুলব : ভ্রমণ-সাহিত্য বলতে আপনি কী বোঝেন?

আপনি ধমকে উঠবেন—এ কেমন আবদার! আমি পাঠক, আমি কেন তা বলতে যাব? তুমি লেখক, কলম ধরার দুঃসাহস দেখিয়েছ, তুমিই বল দিকিন?

আমি সবিনয়ে বলব, মশাই! আমি কিছু বাঙলাসাহিত্যের অধ্যাপক নই। পেশায় আমি সিমেন্ট-স্টিলের আঁক কষি, নেশায় গপ্পো-টপ্পো লিখে থাকি। আপনি যেমন—পেশায় খোদায়-মালুম, নেশায় 'দেশ' পত্রিকার পাতা ওলটান; যদিচ বর্তমান সংখ্যায় দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকেই আপনার ঝোঁক। তা আসুন, আমরা দু'জনেই ওই ভ্রমণ-সাহিত্যের পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হই। আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন, আমিও আমার সওয়াল পেশ করি। দেখা যাক, অনারেবল জাস্টিস কার তরফে রায় দেন।

আপনি রাজি হলেন।

প্রারম্ভিক ভাষণে বললেন, মি লর্ড! লেখক-মশায়ের প্রাথমিক অনুচ্ছেদেই আমাদের আপত্তি। তাঁকে তিন-তিনটি 'স্পেসিফিক পয়েন্ট অব রেফারেন্স' দেওয়া হয়েছিল : "কোন বই পড়ে ভ্রমণের প্রেরণা প্রথম পেয়েছিলেন; ভ্রমণের নেশা আপনার কবে থেকে জেগেছিল; এবং নানা সময়ে ভ্রমণকালে আপনার স্মৃতিতে কি কিছু দাগ কেটে আছে?" তা উনি শুরুতেই আমদানি করলেন এমন দুটি বইয়ের প্রসঙ্গ, যা আদৌ ভ্রমণ-সাহিত্য নয়। আয়নায় দেখা আবোল-তাবোল। আমাদের মতে, ভ্রমণ-সাহিত্যের প্রথম শর্ত হচ্ছে : কাহিনির মূল নায়ক বা নায়িকা ঘর ছেড়ে পথে নামবে? দ্বিতীয়ত, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবে এবং তৃতীয়ত, নানান অদেখা-অচেনা দেশের বিবরণ দেব, যা পড়ে পাঠক বিমল আনন্দ পাবে। সুতরাং প্রথমেই আপত্তি দাখিল করছি : অবজেকশান! হেতু : অ্যাবসার্ড; ইম্মেটিরিয়াল! নো ফাউন্ডেশান হ্যাজ বিন লেড!

বিচারক রুলিং দেবার আগে ডিফেন্স কাউন্সেলের বক্তব্যটা শুনতে চাইলেন।

আমি সবিনয়ে বলি, মি লর্ড! সহযাগীর সওয়াল শুনে একটা কথা মনে পড়ল; আমি আমার প্রারম্ভিক বক্তব্য কিঞ্চিৎ সংশোধন করে বলব—শুধু উপেন্দ্রকিশোর নন, তস্যপুত্রের 'আবোল-তাবোল'-ও আমার প্রথম শ্রুত ভ্রমণ কাহিনি।

আপনি রুখে উঠবেন : সেম অবজেকশান।

এবার আমার সওয়াল : সহযোগী ভ্রমণ-সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, গুপীগাইন ও অ্যালিস তার প্রত্যেকটি শর্ত পূরণ করেছে। তারাও ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে; পাঠকের না-দেখা না-শোনা রাজ্যের বিবরণ শুনিয়েছে, তাকে বিমল আনন্দ দিয়েছে।

বেকায়দায় পড়ে আপনি হয়তো সংজ্ঞাটা কিছু শুধরে নিয়ে বলতে চাইবেন—না, মানে শুধু পাঠকের অদেখা হলেই চলবে না, সেই রাজ্যের বাস্তব অস্তিত্ব থাকা চাই।

এবার আমার প্রশ্ন : রামায়ণ তাহলে একটি ভ্রমণ-সাহিত্য? যে-হেতু কাহিনির নায়ক ঘর ছেড়ে পথে নেমেছে; ক্রমাগত স্থান থেকে স্থানান্তরে গেছে এবং কাব্য-বর্ণিত অঞ্চলের বাস্তব ভৌগোলিক অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। এমন কি মহাকবি কাব্যের নামকরণের সময় ওই 'পথ' কথাটিও ঢুকিয়েছেন।

আপনি ধমকে উঠবেন, গ্রন্থের নামকরণের সময় 'পথ' শব্দটা ব্যবহৃত হলেই তা ভ্রমণ-সাহিত্য হয় না। 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ-সাহিত্য, 'মহাপ্রস্থানের পথে'-ও তাই; কিন্তু তাই বলে 'পথের পাঁচালী' ভ্রমণ-সাহিত্য নয়। ঠিক তেমনি রামায়ণের মধ্যে 'অয়ন' শব্দটা থাকলেও তা ভ্রমণ-সাহিত্য নয়, মহাকাব্য! রামায়ণ রাম + অয়ন নয়; রাম + ঞায়ন, তাছাড়া 'অয়ন' শব্দের অর্থও শুধু পথ নয়; অয়ন মানে 'গৃহ', ঞায়ন মানে 'শাস্ত্র'। বুঝেছেন? লেখক হবার সাধ হয়েছে, এক-আধটু অভিধান ওল্টানো অভ্যাস করুন।

বিচারক তাঁর টেবিলে হাতুড়িটা ঠুকে গম্ভীরস্বরে হয়তো বলবেন, অর্ডার। অর্ডার! এ জাতীয় ব্যক্তিগত বাদানুবাদ আদালত অনুমোদন করেন না।

আপনি হয়তো নিজেকে সামলে নেবেন। বলবেন, পার্ডন মি-লর্ড! আমি শুধু বলতে চাইছি—বাল্মীকির হতভাগ্য নায়ক বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে; মানছি, বউ চুরি যাওয়ায় বউ-এর তল্লাসিতে তাকে কালাপানিও পাড়ি দিতে হয়েছে; কিন্তু রামায়ণের মূল উদ্দেশ্য : শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা-কীর্তন। কোনও অর্থেই তা ভ্রমণকাহিনি নয়।

—তাহলে ফা-হিয়েন-এর বিবরণ?

—নিঃসন্দেহে তা সার্থক ভ্রমণ-কাহিনি।

এবার আমি সওয়াল করব, মি লর্ড! সহযোগী তাঁর ডাইরেক্ট এভিডেন্সে বলেছেন, রামায়ণ একটি ভ্রমণকাহিনি নয়। অথচ বাল্মীকির রচনায় অযোধ্যা-মিথিলা-প্রয়াগ-চিত্রকূট-পম্পাহ্রদ-দণ্ডকারণ্য-প্রস্রবণ গিরি এবং লঙ্কার অপূর্ব বর্ণনা আছে। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের আঠাশ থেকে ত্রিশ সর্গ পড়ে দেখুন, হুজুর, বর্ষা-শরতের যে আরণ্যক বর্ণনা আছে তা বিশ্বের যে-কোনো ভ্রমণকাহিনির প্রাকৃতিক বর্ণনাকে লজ্জা দেবে। তবু তা

নাকি ভ্রমণ-সাহিত্য নয়, শুধুমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন। অথচ সহযোগীর মতে ফা-হিয়েন-এর 'ফো-কু-কি' (বুদ্ধভূমির বিবরণ) একটি সার্থক ভ্রমণ-সাহিত্য, যদিচ প্রাকৃতিক বর্ণনা সেখানে আছে-কি নেই; তার মূল লক্ষ্য : বুদ্ধদেবের মহিমা-কীর্তন। ভ্রমণকারী যে-সময় ভারতবর্ষে আসেন তখন গুপ্ত-সংস্কৃতির সূর্য জেনিথে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা স্বয়ং বিক্রমাদিত্য তখন মগধ-সম্রাট। লেখক পাটলিপুত্রের ভিতর দিয়েই রাজগীরের গৃধ্রকূট পর্বতে গেছিলেন। তবু তাঁর দিনপঞ্জীতে সম্রাট বিক্রমাদিত্য, ক্ষপণক, বরাহ-মিহির, সূর্যসিদ্ধান্ত-লেখক আর্যভট্ট এমন কি স্বয়ং কালিদাস পর্যন্ত অনুল্লেখিত। পরিবর্তে গৃধ্রকূট পর্বতচূড়ায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা সাতকাহন করে শুনিয়েছেন। একেই কি আপনারা সার্থক ভ্রমণকাহিনি বলবেন?

আবার বেকায়দায় পড়ে আপনি বলবেন, লেখক-মশাই একটি গোড়ায় গলদ করেছেন। ভ্রমণ-সাহিত্যে দ্রষ্টব্যস্থানের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের বা মনীষীর পরিচয় যে থাকতেই হবে, এমন কোনও মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। ভ্রমণকাহিনি লেখকের ব্যক্তিগত রুচি তথা দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণিত-অঞ্চলের আংশিক-চিত্রও অস্বাভাবিক নয়। যেমন ধরুন, 'রাশিয়ার চিঠি'। একটি অনবদ্য ভ্রমণ-সাহিত্য; যদিও লেখক রাশিয়ার নদী-পর্বত-প্রান্তরের বর্ণনা সংক্ষেপ করে একটি বিশেষ তত্ত্বের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি : মানবসভ্যতার বিবর্তন-ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বাস্তব ফলশ্রুতিকে তৌল করতেই যেন তিনি কলম ধরেছেন। যেমন ধরুন, 'পথে-প্রবাসে'। এটিও একটি সার্থক ভ্রমণ-সাহিত্য, যদিও লেখক তদানীন্তন ইউরোপীয় মনীষীদের—বার্নাড শ, বার্ট্রান্ড রাসেল বা আইনস্টাইন-এর প্রতিভা তৌল করতে চাননি, যেমনভাবে চেয়েছিলেন দিলীপ রায়। কিন্তু মি লর্ড! আমরা লক্ষ্য করছি, ডিফেন্স কাউন্সেল ক্রমাগত পাঁকাল মাছের মতো পিছলে যাচ্ছেন! আমাদের প্রাথমিক বক্তব্য ছিল : গুপীগাইন/বাঘাবাইন অথবা এ্যালিস্-এর এ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ-সাহিত্য নয়, যেহেতু ওই কাহিনিদ্বয়ে-বর্ণিত রাজ্যে লেখক আদৌ পদার্পণ করেননি।

এবারও মূল প্রশ্নটা এড়িয়ে একটি প্রতিপ্রশ্ন তুললুম আমি, বিভূতিবাবুর 'চাঁদের পাহাড়' কি আপনার মতে একটি সার্থক অ্যাডভেঞ্চার-আশ্রিত ভ্রমণকাহিনি?

আপনি ঘড়িয়ালস্য ঘড়িয়াল। বুঝে ফেলেছেন, কী-কায়দায় লেঙ্গি-মারবার তাল ভাঁজছি আমি। তাই চট করে বললেন, হ্যাঁ বলব। যেহেতু আফ্রিকায় না গিয়েও লেখক অতি যত্ন নিয়ে বইখানা লিখেছেন। ভূগোলকে কোথাও অতিক্রম করেননি। লিখেছেন, কিসুমু-ভিক্টোরিয়া-নায়ানজা হ্রদের ধারে শঙ্কর যেখানে প্রথম চাকরিতে যোগদান করল "সেই জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়ে তিনশো মাইল পশ্চিমে।" ম্যাপ খুলে, স্কেল ফেলে মেপে দেখবেন, দূরত্বটা নির্ভুল! লেখক যদিও নিজে যাননি, কিন্তু পাঠক ইচ্ছে করলে সেখানে যেতে পারে, প্রতিটি বর্ণনা মিলিয়ে যাচাই করতে পারে।

—আর মার্কো পোলোর রচনা?

—হ্যাঁ, সেটাও ভ্রমণ-সাহিত্য, যদিও পাঠক আজ ইচ্ছে করলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর কুবলাই খান-এর বর্ণাঢ্য রাজসভায় উপস্থিত হতে পারবে না। কারণ ঘড়ির কাঁটা পিছনের দিকে ঘোরে না!

—কিন্তু সামনের দিকে তো ঘোরে? সে-ক্ষেত্রে আর্থার ক্লার্কের স্পেস-ওডিসি-2001? যেখানে লেখক নিজে যাননি, পাঠকও যেতে পারে না, তার প্র-নাতি যেতে পারবে কি না সন্দেহ, অথচ সৌরমণ্ডলে যার বাস্তব অস্তিত্ব অনস্বীকার্য?

অনারেবল জাস্টিস এই পর্যায়ে আমাদের বাদানুবাদ থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, মিস্টার লেখক, তর্কাতর্কি আপাতত বন্ধ রেখে আপনি বরং বলুন, ভ্রমণ-সাহিত্য বলতে আপনি নিজে কী বোঝেন?

অগত্যা আমাকে 'সাম-আপ' করতে হবে :

—মি লর্ড! আমার মতে, নামকরণের শব্দদ্বয়ের মধ্যেই তাঁর সংজ্ঞা বিধৃত। 'ভ্রমণ-সাহিত্য' তাকেই বলব যার মুখ্য ভূমিকা 'ভ্রমণ' এবং যা 'সাহিত্য' হয়ে উঠেছে। ত্রয়োদশ অথবা একবিংশ শতাব্দী আপনার আমার কাছে 'আউট-অব-বাউন্ডস্'; তা সত্ত্বেও মার্কো পোলো এবং আর্থার ক্লার্কের রচনা সার্থক ভ্রমণ-সাহিত্য। স্বীকার্য, দ্বিতীয়টিতে প্রয়োগবিজ্ঞান একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। তাতে ক্ষতি হয়নি কিছু—এ বিষয়ে সহযোগীর সঙ্গে আমি একমত। ভ্রমণ-সাহিত্যের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিমানস—'সাবজেক্টিভ' চিন্তাধারা যুক্ত হতেই পারে, কিছুটা হবেই। তাই অ্যাডভেঞ্চারমূলক 'চাঁদের পাহাড়', বুদ্ধভক্তিপূত ফা-হিয়েন-এর 'ফো-কু-কি' এবং সাম্যবাদ-মূল্যায়নে নিবদ্ধদৃষ্টি 'রাশিয়ার চিঠি' সার্থক ভ্রমণ-সাহিত্য। লেখক ব্যক্তিগতভাবে বর্ণিত রাজ্যে গেছেন কি যাননি এটা অবান্তর। রামায়ণকে ব্যতিক্রম হিসাবে বাদ দিলে আমি তো মনে করি—ভারতীয় ভাষায় প্রথম সার্থক ভ্রমণ-সাহিত্য হচ্ছে : 'মেঘদূতম্'। যা নাকি সম্ভবত ফা-হিয়েন-এর 'ফো-কু-কি'র প্রায় সমকালীন রচনা। কালিদাসও বিভূতি বাঁড়ুজ্জ্যের মতো ভূগোলটা গুলে খেয়েছেন। রামগিরি পর্বত থেকে অলকা যেতে হলে উজ্জয়িনীটা যে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে পড়বে এটা তিনি সার্ভে অব ইন্ডিয়ার মদৎ ছাড়াই সমঝে নিয়ে লিখেছিলেন—"বক্রপন্থা ভবতি যদপঃ প্রস্থিতোত্তরস্যাং...." অর্থাৎ উজ্জয়িনী তোমার যাত্রাপথে পড়বে না। তবু হে বন্ধু একটু ঘুর পথে ওই নগরীটা একনজর দেখে যেও (ম্যাপে স্কেল ফেলে মেপে দেখবেন হুজুর, এখানে ও সেই সাড়ে তিন শো মাইল!) কারণ বিদ্যুদ্দামস্ফূরিত চকিতৈঃ পৌরাঙ্গণাদের না দেখেই যদি যাত্রাপথে এগিয়ে যাও তাহলে দিনের শেষে দিনপঞ্জিকায় লিখে রেখ—'লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লৌবনৈর্বঞ্চিতোঽসি' অর্থাৎ অমিট্রায়ের ভাষায়; 'ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তুলবার সময় পাইনি'।

কালিদাস তাঁর কল্পিত নায়কের দৃষ্টিভঙ্গিতে গরুড়াবলোকনে নিশ্চয় দেখতে পাননি ভ্রূবিলাস-অনভিজ্ঞ ঊর্ধ্বমুখ গ্রাম্য জনপদবধূদের; কিন্তু বর্ণনা তাঁর নিখুঁত। এরোপ্লেন তখনও পয়দা হয়নি। কিন্তু তাতে কী? রঘুবংশেই তো কবি পুষ্পকরথে চড়ে কল্পনায় দেখতে পেয়েছিলেন সমুদ্রের উপর থেকে ভারত-ভূখণ্ডের তটরেখাকে : 'তমালতালিবনরাজীনীলা।'

কালিদাস থেকে মার্কিন রাইট-ব্রাদার্স-দের মধ্যে কালের যে ব্যাপ্তি, আর্থার ক্লার্ক থেকে শনিগ্রহের প্রথম অভিযাত্রীর সময়ের ব্যবধান যে তার চেয়ে অনেক, অনেক কম হয়ে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ফলে রোমান্স-আশ্রিত কাব্যরসাত্মক 'মেঘদূত' যদি ভ্রমণ-সাহিত্য, তবে প্রয়োগ বিজ্ঞান আশ্রিত 'স্পেসওডিসি'ও নিছক সায়েন্স ফিকশান নয়, বিকল্পে ভ্রমণ-সাহিত্য।

ফর্ম-এর দিক থেকে ভ্রমণকাহিনি দু' জাতের। প্রথমটায় কাহিনির লেখক হচ্ছেন স্বয়ং নায়ক; উত্তরপুরুষে লেখা। যেমন, পালামৌ, পরিব্রাজক, দ্বীপময় ভারত, পথে-প্রবাসে, মহাপ্রস্থানের পথে, দেশে-বিদেশে, পূর্ণকুম্ভ, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে উমাপ্রসাদবাবুর যাবতীয় ভ্রমণ-সাহিত্য। দ্বিতীয় জাতের রচনায় লেখক নিজ অভিজ্ঞতা কল্পিত নায়কের স্কন্ধে অর্পণ করতে চান; যেমন—রম্যাণি বীক্ষ্যে উচ্চবিত্তের রেল কোম্পানির অফিসার বারে বারে চেপেছেন নিম্নবিত্তের করণিক গোপাল বেচারির কাঁধে। কেউবা নামটা গোপন রেখে, পেশাটা প্রকাশ করে। কল্পিত নায়ককে হত্যা করেছেন বিমান দুর্ঘটনায়। ফর্মটা যাই হোক, সার্থক ভ্রমণ-সাহিত্য বাছাইয়ের বেলা দুটি জিনিস লক্ষ্য করা চাই :

যেমন, "পাত্র বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা চাই—নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাপিয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে", ঠিক তেমনটি ভ্রমণ-সাহিত্য বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা চাই : লেখকপ্রবর যেন সাহিত্যরসকে ছাপিয়ে না যান, আর রোমান্সের দ্বারা রম্যকে!

তাই বলব—উত্তমপুরুষে-লেখা ভ্রমণকাহিনি তখনই উত্তম, যখন 'উত্তম' অধম থাকতে গররাজি নন। অর্থাৎ 'আমি'-টা যেন শুধুমাত্র মিছরিদানার সুতোটুকুর ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তার নির্গলিতার্থ : 'আমি'-টাকে বাইরে থেকে অতি-আবছা দেখা যাবে কৃস্টালের ভিতর দিয়ে; সে আছে কি নেই। অথচ তাকে ঘিরেই, তার উপস্থিতিজনিত হেতুতেই তিল-তিল করে তরলিত মিষ্টরস ঘনীভূত হবে, দানা বেঁধে উঠবে, নিটোল একটি মিছরি-স্ফটিকে পরিণত হবে। ক্রমাগত যদি শুনতে হয় লেখককে কে কী সম্মান জানালো, কে কতটা খাতির করল, তবে তা ভ্রমণ-সাহিত্য নয়, বিড়ম্বনা। একটা উদাহরণ দিই—মনে করুন নাম-সাজুজ্যের সুবাদে বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমার মতো একজন নগণ্য লেখককে কেউ যদি ভুল করে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভেবে বসে, তবে ভ্রমণকাহিনিতে সেটা চেপে যেতে হয়, ছেপে যেতে নয়। এদিক থেকে ইদানীংকালে ভ্রমণ-সাহিত্যিক উমাপ্রসাদবাবু আদর্শস্থানীয়। কল্পনায় আশ্রয় তিনি কদাচ নেন; আত্মশ্লাঘার বাষ্পমাত্র নেই তাঁর রচনায়—যদিও হিমালয়ের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে নামোল্লেখমাত্র সুধীজন তাঁকে চিনতে পারে, বাঙলাভাষা জানুক-না-জানুক।

দ্বিতীয় শর্তটা ছিল : 'রোমান্স যেন রম্যকে ছাপিয়ে না যায়।' খেয়ানৌকার দাঁড়িমাঝি যদি মাঝগাঙে ভাটিয়ালির দ্বৈতসঙ্গীত ধরে তবে পারানির যাত্রীরা খুশিই হয়; সমের মাথায় মাথা ঝাঁকায়। ভাটিয়ালি গানে মাঝিমাল্লার অধিকার, অপিচ ওই সঙ্গীত নদীপারের সময়টুকুকে মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। ঠিক তেমনি ভ্রমণকাহিনির

কল্পিত নায়ক-নায়িকারও প্রেম করার মৌলিক অধিকার অনস্বীকার্য এবং তা মাধুর্যরসই পরিবেশন করে। কিন্তু মাঝগাঙে যদি দাঁড়ি-মাঝি সঙ্গীতের উন্মাদনায় হাল-বৈঠা গুটিয়ে ডুগি-তবলা আর একতারা টেনে নেয়? লা-ভর্তি পারানির যাত্রী তখন ঘূর্ণিপাকে পড়ে আঁতকে ওঠে! ঠিক তেমনি ভ্রমণ-কাহিনির নায়ক-নায়িকার অল্প-স্বল্প প্রেম-ট্রেম আমরা বরদাস্ত করতে রাজি; কিন্তু তারা যখন বৈঠা গুটিয়ে চুটিয়ে প্রেম করে তখন আমরা, লা-ভর্তি পাঠককুল আতঙ্কে শিউরে উঠি। দ্বৈতসঙ্গীত ততক্ষণে দৈত্যসঙ্গীত! ভ্রমণ-সাহিত্যিককে এভাবে ঘূর্ণিপাক বেমক্কা পাক খেতে নিশ্চয় দেখেছেন, এমন কি ভরাডুবি হতেও। সৌজন্যবোধে উদাহরণ দাখিল করার বিষয়ে 'অলমিতি' হতে হচ্ছে।

তৃতীয়ত, শুধু রোমান্স নয়, লেখকের পেশাগত, নেশাগত একদেশদর্শিতায় অন্যান্য জাতের উপসর্গও ভ্রমণকাহিনিকে ঘূর্ণিপাকে ফেলে। এমন কি ভরাডুবিও করায়। এবার উদাহরণ দিতে সৌজন্যে বাধবে না। কারণ উদাহরণগুলি দাখিল করছি অধমের রচনা থেকে—

'পথের মহাপ্রস্থান', 'অজন্ত-অপরূপা' অথবা 'লা-জবাব দেহলী—অপরূপা আগ্রা' নির্ভেজাল ভ্রমণ-সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি! প্রথমটিতে লেখকের 'পেশা' বোধকরি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই কেদার-বদ্রীর ভ্রমণকাহিনি রূপান্তরিত হয়েছে একটা পায়ে-চলা-পথের মৃত্যুর ট্র্যাজেডিতে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিল্পের প্রতি অনুসন্ধিৎসা এবং তৃতীয়ে 'স্থাপত্য' ওদের নিছক ভ্রমণ-সাহিত্য হতে দেয়নি। 'দণ্ডকশবরী' তো কোনোক্রমেই ভ্রমণ-সাহিত্য নয়, যদিও একটি অপরিচিত রাজ্যে অজানা-অচেনা এক আদিবাসী সমাজের ছবি আঁকার প্রচেষ্টা ছিল লেখকের।

ভ্রমণ-সাহিত্য সার্থক হয়ে ওঠার জন্য আরও একটি শর্ত আরোপ করতে মন চাইছে, যে বিষয়ে হয়তো সকলে আমার সঙ্গে একমত হবেন না। কথাটা এই : ভ্রমণের ব্যয়ভার যেন লেখক স্বয়ং বহন করেন! এটা আবশ্যিক শর্ত নয়; তবে অনেক ক্ষেত্রে এটাও বাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোম্পানির পয়সায়, সরকারি পয়সায় এবং বিশেষ করে বিদেশি সরকারের আমন্ত্রণে কেউ কেউ বিদেশ ভ্রমণ করে এসে যে ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করেছেন তা ওই কারণেই সার্থক হয়ে ওঠেনি। লেখক যা দেখেছেন, বুঝেছেন, তা খোলা মনে স্বীকার করতে পারেননি। সেটা নিমকহারামির পর্যায়ে পড়ে যায়!

ভ্রমণ সাহিত্যে 'পথ'টাই বড় কথা, পথের প্রান্তটা নয়। একটু আগে 'পথের পাঁচালি'র প্রসঙ্গ উঠেছিল. আপনারা সবাই একবাক্যে বলবেন, সেটা কোনো মতেই ভ্রমণ-সাহিত্য নয়। কিন্তু মাপ করবেন, এ বিষয়ে একটি বিরুদ্ধ মতও আমি শুনেছি—এবং শুনেছি এক বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভাধরের মুখে। তাঁর মতে 'পথের পাঁচালী' একটি ভ্রমণ-সাহিত্য। আজ্ঞে না, স্বকর্ণে শুনিনি, তাই আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ্ নিয়ে ও-কথা বলতে পারব না। তবে বৈঠকী গল্প যখন হচ্ছে তখন ব্যাপারটা খুলেই বলি। ঘটনাটা শুনেছিলুম পশ্চিমবঙ্গ পূর্তবিভাগের তদানীন্তন মুখ্য-বাস্তুকারের মুখে। তিনি নাকি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সেই প্রয়াত মুখ্য-বাস্তুকারের মুখে শোনা কাহিনিটিই এই—

'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের তখন সামান্য কিছুটা তৈরি হয়েছে। অর্থাভাবে আর অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না। সরকারি সাহায্যলাভের চেষ্টা হয়েছে; চিড়ে ভেজেনি! বিভাগীয় বড়কর্তা বিরূপ। এতে নাকি পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্যটুকুই প্রতিফলিত। চলচ্চিত্রের দীর্ঘদেহী পরিচালক নাকি কোনও সুযোগে ছবিটা দেখান পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন দীর্ঘদেহী মুখ্যমন্ত্রীকে। পুরোটা নয়, খানিকটা—যেটুকু তোলা হয়েছে; হয়তো বা রাশ প্রিন্ট। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন পেশায় চিকিৎসক; কিন্তু বাস্তবে : জিনিয়াস! সিকিভাগ রাশ প্রিন্ট দেখেই সমঝে নিলেন, শেষ হলে ছবিটা কেমন রূপ নেবে। সে ক্ষমতা তাঁর ছিল। হরিণঘাটা-চিত্তরঞ্জন-দুর্গাপুরের জঙ্গল দেখেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শেষ করতে পারলে সেগুলি কী রূপ নেবে। একান্ত-সচিবকে ডেকে বললেন, ওহে ব্যবস্থা করো তো—ওই ছবিটার প্রযোজক হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

যে বিভাগীয় কর্তার দায়িত্ব, এবং যিনি ইতিপূর্বেই সে পরিকল্পনায় ঠাণ্ডা জলের বালতি উবুড় করেছেন, তাঁর ডাক পড়ল। তিনি বিরলকেশ-মাথায় হাত বুলাবার পর হাত দুটি কচলে বললেন, আপনি যখন বলছেন স্যার, তখন....তবে ইয়ে হয়েছে, এ বছর তো আমার বিভাগীয় বাজেটে টাকা নেই?

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাতে কী? পি. ডাবলু, ডি-র সেক্রেটারি এই যে সেদিন বললে রোডস ডিপার্টমেন্টে এবার সারপ্লাস বাজেট? তাকে নাকি বাধ্য হয়ে টাকা সারেন্ডার করতে হচ্ছে?

ভ্রূবিলাস-অনভিজ্ঞ গ্রাম্য জনপদবধূ যে-ভঙ্গিতে কালিদাসের সেই আদিম ভ্রমণ-সাহিত্যের গগনচারী নায়কের দিকে তাকিয়েছিল তেমনি ঊর্ধ্বমুখে খর্বকায় বিভাগীয় বড়কর্তা মুখ্যমন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, রোডস্-এর বাজেট থেকে 'পথের পাঁচালী' সিনেমা হবে!!

ধন্বন্তরী এবার অন্তিম নিদান হাঁকলেন : তোমার মাথায় কি নিরেট গোবর? শুনছ না, ওটা 'পথ'-এর পাঁচালী—পাব্‌লিসিটি অন রোড ডেভালপমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল?

খোদায় মালুম, মুখরোচক কিস্‌সাটা চিফ এঞ্জিনিয়ার সাহেব মওকামাফিক বানিয়ে বানিয়ে ঝেড়েছিলেন অথবা এটা বাস্তাব ঘটনার কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জনমাত্র। তথ্যটা আজও সম্ভবত যাচাই করা যায়—সে বছরের রিভাইজড-বাজেটটা ঘাঁটলে। ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের কোনও সাহিত্যপ্রেমিক করণিক কি এ পরিশ্রমটুকু স্বীকার করে দেশ পত্রিকার সম্পাদককে একটি পত্রাঘাত করতে পারেন না? কিন্তু তাতেই বা কী লাভ? কী প্রয়োজন এ কাহিনির সত্যতা যাচাই করে? গল্পটা বলে আমি আনন্দ পেলুম, শুনে আপনারা।

সম্ভবত সবটাই গল্পকথা। না হলে, ওই চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত পরিচালক তাঁর সাম্প্রতিক সুপ্রচারিত বক্তৃতা—'মাই লাইফ অ্যান্ড মাই ওয়ার্কস'-এ সেই শালপ্রাংশু মুখ্যমন্ত্রীর নামটা অন্তত উচ্চারণ করতেন। তা ভ্রমণ-সাহিত্য হক, বা না হক 'পথের পাঁচালী' কী সাহিত্যে, কী চলচ্চিত্রে একটি ক্রান্তিকারী দিকচিহ্ন। প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারার সে এক সেতুবন্ধন। সেই সেতুবন্ধনের কাজে কোনও ব্রব্‌ডিংন্যাগিয়ান চিকিৎসক কাঠবিড়ালীর ভূমিকা নিয়েছিলেন কি নেননি তা এত বিলম্বে গবেষণা করে উদ্ধার করার কী প্রয়োজন আপনার আমার মতো লিলিপুটিয়ানের? ফলে, কাঠবিড়ালীর নামটা অনুল্লেখিতই থাক।

কী কথা থেকে কী কথায় এসে পড়েছি। আমার মোদ্দা বক্তব্য—ভ্রমণকালীন দিনপঞ্জী বা 'ট্যুর-ডায়েরি' তখনই ভ্রমণ-সাহিত্য বা 'ট্রাভলগ' হয়ে ওঠে যখন লেখকের হাত থেকে পাঠক একটি 'ভিসা' পায়। বিপুলা এ পৃথিবীর অধিকাংশই রয়ে গেল অগোচরে। 'সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে'। ধকলটা এড়িয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়েই অজানা-অচেনা দেশে ভ্রমণের বিমল আনন্দ পাই। অবাক চোখে দেখি আমবন তালবন স্বাভাবিক নিয়মে আর সারি-সারি খাড়া দাঁড়িয়ে নেই; তারা : 'চলে'! ভ্রমণ-কাহিনির লেখকের ভূমিকা হচ্ছে 'ভূতের রাজার' সেই তিন নম্বর বরদানটুকু : গুপীগাইন/বাঘাবাইনের হাতে নকশা-তোলা একজোড়া ভানুমতীর নাগরা ধরিয়ে দেওয়া। তারপর পাঠক যাক না যেথায় খুশি যেতে চায়। লেখক শুধু বাঁশির তানে একটি সুর তুলেই খালাস—'আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায় মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর!"

প্রশ্ন হতে পারে : 'দিনপঞ্জী' আর 'ভ্রমণ-সাহিত্যে'র ফারাকটা কী, সীমারেখাটা কোথায়? এক কথায় তা : 'অহং' যখন 'ত্বমসি' হতে পারে। উত্তমপুরুষেই হক, অথবা প্রথম পুরুষেই হক ভ্রমণকাহিনির নায়কের দেখা (অর্থাৎ লেখকের দেখা-নাদেখা) দেশটা যখন পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাল্মীকির না-দেখা দৃশ্যটা শ্রীরামচন্দ্র দেখেছিলেন, কালিদাসের না-দেখা ছবিটা রামচন্দ্র সীতাকে দেখিয়েছিলেন, বঙ্কিমের দেখা-না-দেখা চিত্রটা নবকুমারও দেখেছিল—কিন্তু ওই পংক্তিটা শুধুমাত্র তখনই সার্থক যখন আপনি আমি মনের চোখে দেখে নবকুমারের ভাষাতে আবেগভরে বলে উঠি : 'আহা! কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।'

লেখক তথ্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নন, সত্যের নির্দেশে পরিচালিত। সে সত্য এখানে রসসৃষ্টি : 'রস'-এই তিনি আছেন। তাই প্রয়োজনে ভ্রমণ-সাহিত্যের লেখক বাস্তবের কিছু ছাঁটকাট করতে পারেন—ভূগোলকে অস্বীকার না করে। ঐতিহাসক উপন্যাসের লেখক যেমন তাঁর কাহিনি সাজাতে পারেন, ইতিহাসকে অতিক্রম না করে। একটি উদাহরণ দিলে হয়তো বক্তব্যটা পরিষ্কার হবে। আমার 'পথের মহাপ্রস্থান' ভ্রমণকাহিনি যদি পড়ে থাকেন তাহলেও উদাহরণটা ধরতে পারবেন। কুণ্ডু-চটিতে এক পাগলি বুড়ির কথা লিখেছিলুম, যিনি আমাকে একটা মোয়া খেতে দিয়েছিলেন। ঘটনাটা আদ্যন্ত বাস্তব, আমার জীবনেই ঘটেছে—কিন্তু কেদারবদ্রীর পথে নয়, পুরীতে। ফলে বাস্তবকে আমি কিছুটা অস্বীকার করেছি, বুড়ির নাতির গায়ে অহেতুক গরম ওভারকোট চাপিয়েছি, কিন্তু রস-সাহিত্যের আইনে আমার ধারণায় আমি যা বলেছি তা : ট্রুথ, হোল ট্রুথ, অ্যান্ড নাথিং বাট দ্য ট্রুথ।

সংক্ষেপে : 'দিনপঞ্জী' আর 'ভ্রমণ-সাহিত্যে'র প্রভেদটা কোথায় তার ব্যাকরণগত সূত্র ব্যাখ্যার অতীত, সেটা বোধের রাজ্যে। পাণিনি বা উপক্রমণিকায় নয়, তা 'মুগ্ধবোধে'। বোধের রাজ্য মুগ্ধ হলে।

....আমার দীর্ঘ সওয়াল শুনে অনারেব্‌ল্ জাস্টিস্ কী রায় দিলেন? সেটা যদি জানতে চান তাহলে এই সাহিত্য-সংখ্যাটি আপনাকে আদ্যন্ত পড়তে হবে। আমার মতো অর্বাচীনের রচনায় নয়,—বর্তমান বাংলা সাহিত্যে 'ভ্রমণ-কাহিনি।' বিষয়ে যারা 'কনৌসার' তাঁদের ফুল-বেঞ্চ এখানে ও বিষয়ে জাজমেন্ট দিয়েছেন।

* * *

দ্বিতীয় প্রশ্নটা কী-যেন ছিল? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে : "ভ্রমণের নেশা আপনার কবে জেগেছিল?"

সেটা আবার আমার নিকার-বোকার আর হাফ-প্যান্ট যুগের সন্ধিক্ষণে। বাবামশাইও ছিলেন আমার মতো পি. ডাব্‌লু. ডি-র এঞ্জিনিয়ার। অবসর নেবার পর মা, ছোড়দি আর আমাকে নিয়ে এক আশ্চর্য ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। 'আশ্চর্য' বলছি এজন্যে যে, সে যাত্রাপথও নিঃশেষে হারিয়ে গেছে মার্কো পোলোর ভ্রমণপথের মতো। না হলে সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত আমি নিজেও আমার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সেই পথ দ্বিতীয়বার পরিক্রমা করতুম। আমরা রওনা হয়েছিলুম স্টিমারে। কলকাতার জগন্নাথ ঘাট থেকে সিধে দক্ষিণমুখো। মালবাহী জাহাজ—পুব-বাঙলা-আসামে মাল নিয়ে যেত, চা-পাট নিয়ে আসত কলকাত্তাওয়ালাদের জন্য। তাতে দুটিমাত্র কেবিনে আমরা কজন : যাত্রাপথে দ্বিতীয় যাত্রী ওঠেনি। হুগলি নদী বেয়ে প্রথমে পৌঁছাই সাগরদ্বীপের কাছাকাছি। তারপর পুবমুখো সেঁদোই সোঁদরবন। আঁকা-বাঁকা খাড়িপথে ক্রমাগত পাঁচদিন সেই অবাক-অরণ্যে! ঠিক মনে নেই—তবে মেঘনা নয়—কী একটা নদী বেয়ে উত্তরমুখো এগিয়ে ভিড়েছিলুম গোয়ালন্দের টিনে-ছাওয়া গঞ্জে। সবশেষে ব্রহ্মপুত্র ধরে গৌহাটি। একুনে এগারো দিনের নদীপথ। স্টিমারের নামটা আজও মনে আছে—যদিও তাকে আর কোনদিন দেখিনি গঙ্গাঘাটে : 'মবিঙ্'। আর আবছা মনে

আছে বসন্তের দাগ-ওয়ালা, লুঙ্গিধারী মুসলমান বড় সারেঙের মুখখানা। প্রথমদিনেরই তাঁর সঙ্গে 'খোঁকাবাবু'র দোস্তি হয়ে যায়; তখনও মবিঙ্ স্টিমার ডায়মন্ডহারবার পৌঁছায়নি। লোকটা গল্প করতে জানত। শুনিয়েছিল—কতবার সোঁদরবনে সে রয়্যাল বেঙ্গল, ময়াল সাপ, আর মানুষখেকো কুমির দেখেছে। ডোরা-কাটা বাঘ স্টিমারের উপর কীভাবে হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর বড় সারেঙ তাকে স্প্যানার পেটা করে তাড়ায় তার আজগুবি গল্প শোনাতেও কসুর করেনি। বেশ মনে আছে, সুন্দরবনের পাঁচদিন আমি ডেক ছেড়ে কেবিনে আদপে ঢুকিনি; আর গুলতি-বাঁটুল সবসময় রেডি থাকত আমার হাফপ্যান্টের পকেটে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ডোরাকাটা দক্ষিণরায়ের সাক্ষাৎই মেলেনি। তবে কৃষ্ণসার হরিণের পাল দেখিছি, রোদ পোহানো মেছো-কুমিরও একবার। ধনেশ, নানান জাতের পাখি আর বাঁদর। জ্যান্ত ইলিশ শুধু সেই প্রথম নয়, আজও দ্বিতীয়বার দেখিনি। তখন বুঝবার বয়স ছিল না, পরে মায়ের কাছে শুনেছি, জেলে-ডিঙি থেকে যে দেড়-দু'কেজির জ্যান্ত ইলিশ কেনা হত তা চার আনা জোড়ায়। এবার নিশ্চয় স্বীকার করবেন—সে-যুগ কুব্‌লাই খানের সমসাময়িক!

মাত্র এগারোটি দিন। কিন্তু তাতেই খুলে গেল শিশুমনের এক রুদ্ধ কবাট। বউবাজার অঞ্চলের ঘিঞ্জি-গলির হাফপ্যান্টধারীর চোখের সামনে সেই প্রথম ধরা দিল দিগন্ত-অনুসারী গৈরিক-বসনা পদ্মা, লতা পাতায় জড়াজড়ি করা সুঁদরিগাছের অরণ্যশোভা! আর শ্রুতিতে ধরা দিল স্টিমারের ভোঁ!

আমরা কথায় বলি—'দেখা-শোনা'। ওটা 'শোনা-দেখা' হওয়া উচিত। সদ্যোজাত মানবশিশুর শ্রুতি আগে, দৃষ্টি পরে পয়দা হয়। শ্রীরাধাও চোখে দেখার আগে শুনেছিলেন বাঁশির তান। ভ্রমণ-বিষয়েও, আগেই বলেছি—শ্রুতির অগ্রাধিকার ছিল আমার জীবনে। কানে-শোনা রূপকথার সোনা আর 'আবোল-তাবোল'-এর হীরে-মানিক ছন্দ! এবারও আর সব কিছু ছাপিয়ে ওই স্টিমারের 'ভোঁটা'ই আমার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে পাকাপাকি বাসা বাঁধল। সে-আমলে বিদেশযাত্রা বলতে আমরা বুঝতুম জাহাজে সাগরপাড়ি দেওয়া। শৈশবে আর কৈশোরে মধ্যরাত্রে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হত জাহাজের ভোঁ শুনলে। বউবাজার অঞ্চলের বাড়িতে গঙ্গাঘাট থেকে ভেসে আসা সে বংশীধ্বনি স্পষ্ট শোনা যেত। ঘুম-না আসা রাতে সেই ভোঁ শুনে মনে মনে জপ করতুম :

—বন্দরে ওই দাঁড়িয়ে জাহাজ, বেরিয়ে পড় বন্ধুদল!

ভারতের বাইরে গেছি দুবার। একবার হংকং, ব্যাঙ্কক, তাইহকু হয়ে জাপানে। আর বার য়ুরোপে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—দুবারই মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে। দুবারই কিন্তু উড়োজাহাজে; জাহাজে নয়। জলযানে আর চাপাই হয়নি, 'বম্বে-এলিফান্টা', 'ক্যালে-ডোভার' অথবা 'রোম-কাপ্রি'র সামান্য সমুদ্রযাত্রা বাদ দিলে।

ভ্রমণের সুযোগ আমাকে দিয়েছেন সদাশয় সরকার বাহাদুর। বারে বারে এ-জেলা থেকে সে-জেলায় বদলি করে। ব্যান্ডো সাহেব এখনও বহাল তবিয়ৎ; তাই জনান্তিকে আপনাদের জানাই বারে বারেই মনে মনে তাঁকে গালমন্দ করেছি! তিনিই ছিলেন

আমার চিফ এঞ্জিনিয়ার—বদলি করার মালিক। সরকারি মহলে একটা হিসেব আছে : তিনবার বদলি = গৃহদাহ। আসবাব খুঁতো হবে, আয়না ভাঙবে, চিনেমাটির বাসনপত্র সব তছনছ। আজ স্বীকার করি—তিনি আমাকে ভুয়োদর্শনের দুর্লভ সুযোগ দিয়েছেন। গোটা পশ্চিমবঙ্গটাই মোটামুটি ঘোরা গেছে। মায় ডেপুটেশনে দণ্ডকারণ্য।

ধন্যবাদ প্রাপ্য দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের। দণ্ডকারণ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ব্যাপকতর পাঠকসমাজের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছি তাঁরই সহায়তায়। দ্বিতীয় ভ্রমণ-কাহিনি 'পথের মহাপ্রস্থান' আনন্দবাজার রবিবাসরীয় সংখ্যায় সিরিয়ালাইজড হয়েছিল। 'অজন্তা-অপরূপা' অথবা 'লা-জবাব দেহলী—অপরূপা আগ্রা'ও যদি কোনও পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বার করা যেত তাহলে স্বল্পবিত্ত ভ্রমণ-পাগল পাঠকের অশেষ উপকার করা যেত। আকাশ-ছোঁয়া দামের বই বইমেলায় পাতা উল্টে দেখেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হত না। ঘটনাচক্রে সে সুযোগ তাঁদের দিতে পারিনি।

তিন নম্বর প্রশ্নটা ছিল : 'নানা সময়ে ভ্রমণকালে আপনার স্মৃতিতে কি কিছু দাগ কেটে আছে?"

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে। কিছু নয়, অনেক কিছু। তার অধিকাংশই নানান গ্রন্থে লিখেছি। যা এখনও ছাপার হরফে প্রকাশ পায়নি তার দুটি উদাহরণ এখানে পেশ করি—

পূর্ব এশিয়া ঘুরে এসে দুখানি বই লিখেছিলাম। একটি ভ্রমণ-কাহিনি : 'জাপান থেকে ফিরে'। দ্বিতীয়টি—'অধম'-পুরুষে লেখা আধা-গোয়েন্দা অভিজ্ঞতা : 'নেতাজী রহস্য সন্ধানে'। নতুন করে বলার কিছু নেই। ইউরোপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনও ভ্রমণ-কাহিনি লিখিনি। তার একটিই হেতু—আমার চারিত্রিক ত্রুটি। আমি স্বভাবত পল্লবগ্রাহী। ক্রমাগত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নাক গলাবার চেষ্টা করি—মায় যে-রাজ্যে দেবদূতেরাও পদসঞ্চারে সশঙ্কচিত্ত। ফলে, এ ক'বছর ভ্রমণ-কাহিনি ছেড়ে আর পাঁচটি বিষয় নিয়ে মেতে ছিলুম। সেই ইউরোপ ভ্রমণের একটা অভিজ্ঞতা শোনাই বরং—

সেবার প্লেনে চেপে পৌঁছেছিলুম রোমে। সেখানে থেকে ট্র্যভ্‌ল এজেন্ট আয়োজিত একটি লাক্সারি বাসে আমরা জানা চল্লিশ ভারতবাসী পথে-পথে ইউরোপ পরিক্রমা করি ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, সুইৎজারল্যান্ডে এবং ফেরার পথে মিশরের পিরামিড। কিন্তু ভ্রমণকালে সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুটি ইউরোপ-আফ্রিকা আমাকে দেখাতে পারেনি! তা দেখিয়েছে এই ভারতই!

আমার পাশের আসনটি যাঁর নামে চিহ্নিত তিনি উত্তর ভারতের পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী—কলকাতার খাস বড়বাজারে তাঁর 'বেওসা'। 'ইঞ্জিরিটা' ঠিকমতো রপ্ত নয়, থোড়া বহুৎ 'বংলা' বলতে পারেন; আমার সঙ্গে রাষ্ট্রভাষাতেই বাৎচিৎ করতেন সচরাচর। কি জানি কেন আমাকেই তিনি মুরুব্বি ঠাউরে ছিলেন। দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করে দিতে হত আমাকে। গাইডের ইংরেজি ব্যাখ্যার অজিভঙ্গ 'হিন্দ্যনুবাদ'। বিনিময়ে তিনি আমাকে ক্রমাগত অফার করেছেন :

চকলেট-বার, আইসক্রিম অথবা দামি সিগ্রেট, যা-নাকি সীমিত বিদেশি মুদ্রায় আমার কাছে ছিল দুষ্প্রাপ্য। কলকাতার গদিতে তিনি হয়তো মাথায় পরেন কাজকরা টুপি, কপালে গণেশজীর চরণচুম্বিত সিঁদুরের টিপ; কিন্তু য়ুরোপখণ্ডে তিনি রীতিমতো স্যুটেড-বুটেড। পাঁচ সাতটি বিচিত্রবর্ণা টাই ছিল তাঁর—নিখুঁত 'অক্সফোর্ড-নাট'। কিন্তু ফাঁসগুলি কলকাতা থেকেই বানিয়ে আনা। প্রতিদিন সকালে নট আলগা করে মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে পরতেন, এবং শয়নের পূর্বে একই কায়দায় খুলে রাখতেন। সবচেয়ে খোলতাই বাহার হত যখন প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিখুঁত স্যুটধারী এসে বসতেন ব্রেকফাস্ট টেবিলে, আর আমি তাঁর কানে কানে বলতুম, শেঠ্‌জি, আপনি কান থেকে জনৌ-টা খুলে নিতে ভুলে গেছেন!

ক্রমাগত চার্চ আর ক্যাথিড্রাল দেখে দেখে তিনি বে-দিল! ক্ষোভ জানাতেন, 'মন্দির-উন্দির বিলকুল নাই কুথাও?'

তাতে বুঝতাম, দেব-দ্বিজে তাঁর অচলা ভক্তি। স্বভাবে—গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ : 'যা নিশা সর্ব্ব ভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতে মুনেঃ।।" সারাটা দিনমান চলন্তবাসের নরম গদিমোড়া সিটে তিনি পদ্মনাভ—ভ্রূক্ষেপ করতেন না, বাসের জানালায় অপসৃয়মাণ দৃশ্যাবলী : ফ্রান্সের গমের খেত, রাইন নদীর অববাহিকার অপূর্ব দৃশ্য, ব্রেনারপাস্ এর সেই ইতিহাসবিখ্যাত প্রান্তর—যেখানে হিটলার-মুসোলিনির মুলাকাৎ হত অথবা সুইৎজারল্যান্ডের তুষারশুভ্র পশ্চাৎপটে উপল-বন্ধুর সানুদেশ। আর আমরা যখন মগ্ন গভীর ঘুমে তখন তিনি কাঁহা-কাঁহা 'ঘুমছেন'! রহস্যটা ভেদ করল অসীম মানে অমৃত ব্যানার্জি স্ট্রিটের অসীম চাটুজ্জে। তাকেই প্রশ্ন করি শেঠ্‌জি রোজ এত রাত করে ফেরে কেন বলত?

বললে, ও, আপনি বুঝি টের পাননি? রাতে শেঠজি নীললোহিত।

—নীললোহিত! মানে শিব? কণ্ঠে নীল, কেশে পিঙ্গল জটা?

—না দাদা, সে অর্থে নয়।

—তবে কি সুনীল গাঙ্গুলী?

—হেত্তরি! আপনি সোজা কথা বোঝেন না? 'নীল' হচ্ছে ফিল্ম-এর রঙ আর 'লাল' হচ্ছে বিশিষ্ট এলাকার বাতির রঙ!

রাধামাধব! থুড়ি! ও! লর্ড যীসাস্! তাই শেঠজি দিনভর টানা নাক ডাকায়?

এহেন শেঠ্‌জির কাছে একদিন ধমক খেতে হয়েছিল। আমার অপরাধ—জোর করে তাঁকে ল্যুভ (বাংলা বানানে ওটা কীভাবে লিখতে হবে তা আজও আমার মালুম হয়নি) মিউজিয়ামে টেনে নিয়ে যাওয়ায়। রাতের ঝোঁকে তাঁর খরচ বাড়ে; তাই দিনেরবেলা তিনি মিতব্যয়ী। তিন ফ্রাঁ খরচ করে কিছুতেই ঢুকবেন না ল্যুভে। লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি' শ্লোক ওঁর কাছে আওড়ানো বৃথা। কিন্তু তাই বলে দশ বিশ হাজার টাকা খরচ করে পারিতে এসে লোকটা তিনফ্রাঁর মায়ায় ল্যুভে ঢুকবে না? বাসে বসে বসে ঘুমাবে? আমি ওকে লোভ দেখালুম—'মোনালিসা' ছবির। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রমণী-প্রোট্রেট। লোকটা কৌতূহলী হল। নিজেই দুখানা টিকিট কাটল—আমারটাও; বোধকরি 'মোনালিসা'র শুলুক সন্ধান সরবরাহ করার দালালি হিসাবে! কিন্তু ছবিখানা

দেখে শেঠজি এক্কেরে ভিসুভিয়াস। বললে, 'সানিয়াল-সাব, না-জানে আপ অন্ধ্যা হ্যয়, ইয়ে গন্ধ্যা হ্যয়! এই তোমার রুচি! এর চেয়ে আমাদের হেমা মালিনির বুড়ি আয়াও খাপসুরৎ!'

তাই সিস্‌তিন চ্যাপেলে আর পীড়াপীড়ি করিনি। শেঠজি জানতে চেয়েছিল, ক্যা হ্যয় উসকা ভিতর?

বললুম, মিকেলাঞ্জেলোর শ্রেষ্ঠ শিল্প, মায়—লাস্ট জাজমেন্ট!

—বিকেল-আঞ্জিলো কৌন হ্যয়?

—'হ্যয়' নয়, 'থে'। চারশ বছর আগেই সে ফৌত হয়েছে। খুব নামকরা তসবির-ওয়ালা।

পুনরায় প্রশ্ন—তসবির কী জাতীয়? 'মুনালিসার' তরিকা, না 'লাসুস' তরিকা।

'লাসুস্' শব্দটা শেঠজি আমার কাছেই শিখেছে; অর্থাৎ ফরাসি চিত্রকর আঁগরের : 'লা-সুর্স্'! ভৃঙ্গারস্কন্ধে নিরাবরণা অষ্টাদশীর যৌবনদৃপ্ত মহিমা! সেটা শেঠজির পছন্দ হয়েছিল। জনান্তিকে আমাকে প্রশ্নও করেছিল, ছবিটার দাম কত হতে পারে। দাম শুনে রামনাম উচ্চারণ করেছিল।

আমি বললুম, না! লাসুর্স্ তারিকা তস্‌বির এখানে নেই।

শেঠজি বললে, তব ঘুসিয়ে জাহান্নমমে!

আমরা সিসতিন চ্যাপেল দেখতে গেলুম; আর শেঠজী নগদ পাঁচ লিরা মুনাফা করে বাসে বসে ঘুমালে!

ভাবছেন এখানেই আমার গল্পের ক্লাইম্যাক্স? আজ্ঞে না। ক্লাইম্যাক্সটা দমদম এয়ারপোর্টে, যখন তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেলুম। মিতব্যয়ী শেঠজিকে আবগারি পুলিস তথা কাস্টম্‌স্ আটকেছে! তাঁর বাক্সভর্তি শুধু সীমা ছাড়া ইলেকট্রনিক গ্যাজেটই নয়; ছিল নিষিদ্ধ ব্লু ফিল্ম এর একাধিক রিল!

* * *

আরও একটা ভ্রমণ স্মৃতির অভিজ্ঞতা পেশ করে ছেদ টানব। এটা বিদেশে নয়, দেশে;—সান্ডাকপু ভ্রমণ। তার কথা কোথাও লিখিনি। এবার হেতুটা অন্য জাতের। কেদারবদ্রী গিয়েছিলুম স্বেচ্ছায়, আর সান্ডাকপু সরকারি নির্দেশে। বাধা সেখানে নয়, সে-কথা তো দণ্ডকারণ্য বিষয়েও প্রযোজ্য। বাধা ছিল অন্যত্র। কেদারবদ্রীতে দেখেছিলুম এটা পায়ে-চলা পথের মহামৃত্যু। পরিণতবয়সী সহস্রাব্দীর সে পথের মৃত্যু নিয়ে ট্র্যাজেডি লেখা যায়; কিন্তু অজাত ভ্রূণকে নায়ক করে কেউ কখনও সাহিত্য রচনা করেছে? তা কি সম্ভব? ভ্রূণহত্যা যখন আজ আইনসঙ্গত, তখন ভ্রূণের মৃত্যুকে মূলধন করে ট্র্যাজেডি লিখব কেমন করে? তবে নাকি আপনারা জানতে চেয়েছেন : "ভ্রমণকালে আপনার স্মৃতিতে কি কিছু দাগ কেটে আছে?" তাই অকপটে বলে যাই, আছে! একটি ভ্রূণহত্যার স্মৃতি!

ঘোষাল-সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল নিতান্ত ঘটনাচক্রে। ছিয়াত্তর সালের মার্চ মাসের সেটা প্রথম সপ্তাহ। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন-সংস্থার কর্ণধার, আর আমি

পূর্তবিভাগে পরিকল্পনাভুক্তির নির্বাহী বাস্তুকার, ওই যাকে সাদা-বাংলায় আপনারা বলেন, পি. ডাবলু ডি-র সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার, প্ল্যানিং সার্কেল। ঘোষাল-সাহেব বললেন, 'মিস্টার সান্যাল, আপনার তো ভ্রমণে বাতিক আছে, পেশাতেও এঞ্জিনিয়ার। সান্ডাকপু যাবেন? একটা বিরাট পরিকল্পনার প্রযুক্তিবিদ্যার দিকটা যাচাই করতে?'

অফিশিয়াল ডিস্‌কাশন তো নয়, আমার মনে হল উনি বুঝি শৈশবে-শোনা পংক্তিটাই আবার আবৃত্তি করছেন—"আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায় মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর?"

এক্ষেত্রে আরও আকর্ষণ—আর্নড লিভ নিতে হবে না, টি. এ বিল সাবমিট করা যাবে। সে সব চিন্তা মনেই রেখে প্রশ্ন করি, পরিকল্পনাটা কিসের?

—সান্ডাকপু-ফালুটে ফরেন-টুরিস্টদের সহজে নিয়ে যাবার জন্য একটা রোপ-ওয়ে-প্রকল্প। সেখানে লাক্সারি-হোটেল হবে, ডায়নামো বসবে; সে এক এলাহী ব্যাপার, বিশ-পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রকল্প হবে হয়তো।

সবিনয়ে বলি, রোপ-ওয়ে সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আপনি আর কাউকে দেখুন।

উনি বাধা দিয়ে বলেন, না, না সেজন্য বিদেশি বিশেষজ্ঞ আসবেন। আপনি ওই হোটেল-মোটেলের ডিজাইন, ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলির যথার্থ আর এস্টিমেটটুকু দেখে দেবেন শুধু।

—তাহালে রিপোর্টটা দিন। পড়ে মতামত জানাব।

দিন সাতেক পরে প্রজেক্ট-রিপোর্টখানা ফেরত দেবার সময় বলি, ঘোষালসাহেব, আমি কিন্তু এ পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। বিদেশি পর্যটক রোপওয়ে চড়ার লোভে দার্জিলিঙে আসবে না। ইউরোপ, জাপান অথবা মার্কিন দেশে তা পথেঘাটে। ওরা যদি আসে, তবে আসবে যা আমাদের আছে ওদের নেই—তাই দেখতে : এভারেস্ট, হিমালয়। পাকদণ্ডী পথে গাড়িতে ওদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে ব্যয়ভার টাকায় চৌদ্দআনা কমে যাবে।

—আপনি কি আমার সঙ্গে সান্ডাকপু যাবেন? বিকল্প একটা পরিকল্পনা তৈরি করতে?

আমি বলি, বক্তব্যটা আমার শেষ হয়নি ঘোষাল-সাহেব। আমি গোটা পরিকল্পনাটাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে চাই। প্রথম ধাপে তৈরি হবে পায়েচলা পাকদণ্ডী পথ। দ্বিতীয় ধাপে জিপ চলার উপযুক্ত সড়ক।

—তাহলে আগামী সপ্তাহে চলুন। আমি টেলেক্স করে দিচ্ছি। দার্জিলিঙে জিপ রেডি থাকবে।

—আজ্ঞে না। পায়ে-চলা যাত্রীর সুবিধা-অসুবিধা সমঝে নিতে আমি পায়ে হেঁটেই যেতে চাই।

উনি রাজি হলেন না। বয়স ও স্বাস্থ্যের জন্য। বললেন, আপনি পায়ে হেঁটে যান, দিন সাতেক দেরিতে রওনা হয়ে জিপ নিয়ে আপনার সঙ্গে সান্ডাকপুতে মিট করব। কবে যাবেন বলুন?

বললুম, এক মাস পরে।

—এক মাস। বড্ড দেরি হয়ে যাবে না?

বলি, উপায় কী? আমিও পঞ্চাশোর্ধ্ব এবং হিমালয় দুহিতার প্রসাদধন্য নই। অর্থাৎ পঞ্চাশোর্ধ্ব "উমাপ্রসাদ" নই! শরীরটাকে সইয়ে নিতে অন্তত মাস-খানেক লাগবে।

সেই মতোই ব্যবস্থা হল। প্রথম অন্তরায় হলেন গৃহিণী স্বয়ং। এ বয়সে অত ধকল নাকি আমার সইবে না। সে বাধা অতিক্রম করা গেল রানা এগিয়ে এসে মহড়া নেওয়ায়। রানাকে চেনেন তো? সেই 'পথের মহাপ্রস্থান'-এ যে হাফ্‌প্যান্টধারীকে কুণ্ডু কোম্পানির ম্যানেজার বিনয়বাবু খেতাব দিয়েছিলেন : 'ক্ষুদে তেনজিং'। ছিয়াত্তরে সে প্রেসিডেন্সির ছাত্র—'জিওলজি' তার বিষয়। ফলে পাথর-টাথরের প্রতি প্রেম। সান্ডাকপু সে অর্থে তার কাছে স্বর্গ। বাপের দেখভাল করার দায়িত্ব বর্তালো তার ওপর। রানার সহপাঠী অরিন্দম বেশ কষ্টসহিষ্ণু, সঙ্গী হল আমাদের আর লেজুড়-হিসাবে জুটে গেল ভাগ্নে সুবাস; ইদানীং আমার ছাপা-বইয়ে বানান ভুল হলে যার ঘাড়ে দোষ চাপাই। ছোকরা প্রুফটা দেখে ভালো। খবর পেয়ে এসে হাজির হল অমৃত ব্যানার্জি স্ট্রিটের সেই অসীম, সঙ্গে তার বড়কুটুম। অর্থাৎ গুনতিতে আমরা আধডজন পাক্কা। ওদের বয়স বাইশ থেকে বত্রিশ; আমার বাহান্ন। ফলে, তালে তাল দিতে হবে বুঝে তালিম নেওয়া শুরু করি। আমার অফিস তখন তেরোতলা বাড়ির ছয় তলায়। ওই এক মাস লিফট্ ব্যবহার করিনি এবং টিফিনে নিচে নেমেছি খেতে। অর্থাৎ দৈনিক বারোতলা সিঁড়ি ভাঙা—আর অফিস-ফের্তা জোর কদমে হাঁটা ধরতুম। শরীর, যাঁর নামান্তর 'মহাশয়', তিনি নেট-প্র্যাকটিসে যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়েছেন বলে মনে হল। সে ভ্রান্তিটা অস্থিতে অস্থিতে মালুম হল মাঠে নেমে। বিকেভঞ্জন থেকে সান্ডাকপু-র শেষচড়াইয়ের ইনিংসে যখন ইমরান খাঁ-এর বডিলাইন বোলিং শুরু হল তখন আমি এক্কেরে ন্যাজে-গোবরে।

ত-বলে এই মওকায় আমি উত্তমপুরুষের কোনো ভ্রমণকাহিনি শোনাতে বসিনি। যাত্রাপথের দুখানি নকশা শুধু যোগ করে দিলুম ভবিষ্যৎ পথপাগলদের কথা ভেবে। অধিকাংশ সময়েই আমরা নিজেরা রেঁধে খেয়েছি—চাল-ডাল-নুন-তেল-স্টোভ

ইত্যাদি সব নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলকাতা থেকে। পথে যে সব দুর্লভ দৃশ্য দেখেছি—যোজনবিস্তৃত ফুলেভরা রোডোডেনড্রন-বন, পাশাপাশি ধ্যানেবসা মাকালু-কাঞ্চনজঙ্ঘা-এভারেস্ট সে সব কথা বরং থাক। পথে মাঝে মাঝে বসে যেতুম

স্কেচ আঁকতে—জঙলি আঙুরলতা অথবা দেওয়ার-পাইন। মানে, ভাবখানা তাই দেখাতুম, আসলে ঠ্যাঙ জোড়াকে কিছু বিশ্রাম দিতে। যাত্রা সঙ্গীরাও ভাব দেখাতো যেন টের পায়নি আমার চালাকিটা—হাজার হোক, বয়সের তো একটা মর্যাদা আছে! তাই তারাও বসে যেত বিশ্রাম করতে।

ফেরার দিন দার্জিলিঙে একটা মজার কাণ্ড ঘটল। পর্যটন বিভাগের অফিসারের সঙ্গে বসে এই পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করছি, হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন টুপি-মাথায় এক বলিষ্ঠ গঠন ভদ্রলোক। অফিসার তাঁকে সসম্মানে বসিয়ে কথা বলতে থাকেন। মুখটা খুবই চেনা-চেনা। উনি আমার সামনের চেয়ারটায় বসে অনর্গল কথা বলতে থাকেন। আর কথায় কথায় একগাল হাসি। কফির অর্ডার দেওয়া হচ্ছে শুনে বুঝতে পারি মিনিট দশেক ওই সহাস্য অতিথিটি অপেক্ষা করবেন। আমি ওঁর অজ্ঞাতে নিঃশব্দে স্কেচখাতাখানা বার করে ওই হাসিটাকে ধরবার চেষ্টা করতে থাকি। হঠাৎ নিজের নামটা কানে যাওয়ায় তন্ময়তা ভাঙল। পর্যটন অফিসার বলছেন, মিস্টার সান্যাল, ওঁকে আপনার পরিকল্পনার কথাটা বলুন!

অগত্যা ছবি আঁকা বন্ধ রেখে পদব্রজে সান্ডাকপু ভ্রমণের পথ-পরিক্রমার কথাটা ওঁকে শোনাই। উনি উৎসাহিত হলেন। বললেন, 'আপনার রিপোর্টের একটা কপি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।'

আমি পর্যটন অফিসারের দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্র তাকাই। তিনি বলেন, ও! আপনি বুঝি ওঁকে চিনতে পারেননি? উনি হচ্ছেন—!

কী আশ্চর্য! তাই এত চেনা-চেনা লাগছিল! করমর্দনের জন্য তিনি ততক্ষণে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর বলিষ্ঠ হাত। সেটা ধরে নিয়ে বললুম, একটা অটোগ্রাফ?

দিলেন। স্কেচখাতায় রয়ে গেল দুর্লভ হাসির মালিকের সইটা : তেনজিঙ নোরকে!

রিপোর্টের আকারে যে ভ্রূণটাকে আমি যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করি, তার চুম্বকসার—

প্রথম পর্যায় : পায়ে-চলা পথের উন্নয়ন। সমাপ্য-সময় এক বছর। ব্যয়—আন্দাজ আট লক্ষ টাকা (1976)।

দ্বিতীয় পর্যায় : জিপ-চলার উপযুক্ত পথ, মোটেল, পেট্রলপাম্প, ডাইনামো ইত্যাদি।—সমাপ্য-সময়—তিন বছর।—ব্যয়—দেড়কোটি টাকা (1976)।

রিপোর্টের অ্যাপেন্ডিক্সে আমি পশ্চিমবঙ্গে-অবস্থিত তেইশটি পর্বতারোহী ক্লাবের নাম যুক্ত করেছিলুম, যাঁরা বছরে বছরে 'ট্রেক' করতে যান উত্তরখণ্ডে। পরে উমাপ্রসাদবাবু আমাকে বলেছিলেন, তিনি এমন শতখানেক সর্বভারতীয় ক্লাবের নাম জানেন, যারা বছরে বছরে ট্রেক করতে যায় হিমাচল প্রদেশে, জম্মুতে, কাশ্মীরে।

পান্থাবাস বা রেস্ট-হাউস বানানোর কোনও প্রস্তাব ছিল না। ছিল কিছু 'কিয়স্ক'-এর আয়োজন, বাসস্ট্যান্ড-এ যেমন থাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে। প্রতিটি 'ঘাঁটিতে'—মানভঞ্জন, মেঘমা, গৈরীবাস, কালপোখ্‌রিতে আমরা রাত্রিবাস করেছি স্থানীয় পাহাড়িদের কুটিরে। পেয়িং গেস্ট হিসাবে। ওরা খাটিয়া-কম্বল সরবরাহ করেছে; ভাত, ডাল, তরকারি কখনও বা মুরগির ঝোল রেঁধে খাইয়েছে। নামমাত্র মূল্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওরা ঘর বা খাটিয়ার ভাড়া নেয়নি—আমাদের অতিথি হিসাবে গণ্য করায়। একমাত্র মোলেতে আমরা রাত্রিবাসের উপযুক্ত ঘর পাইনি। আশ্রয় নিতে হয়েছিল অনুপস্থিত চম্‌রি-গরুর গোয়ালে। কাঠের দেওয়াল, টিনের ছাদ, খড়ের বিছানা আর জাবরের ডাবর! আমরা যেহেতু দার্জিলিঙ হিমালয়ান ইনস্টিটুট থেকে স্লিপিং-ব্যাগ ভাড়া নিয়েছিলুম, তাই শীত লাগেনি। শোনা গেল, গোয়ালের গৃহস্বামীর দল তখন নাকি আরও উত্তরে চরতে গেছেন—তাই গোয়াল ফাঁকা। এত গরম তাঁরা সইতে পারেন না। যদিও রাত্রি প্রভাত হলে ঘাসের উপর বরফের আস্তরণ দেখেছি, রোদ ওঠার আগে পর্যন্ত। মোটকথা, থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে কোথাও কোনও কষ্ট হয়নি। প্রতি গাঁয়েই গাঁওবুড়োর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা জানিয়েছে—মাসের শেষ সপ্তাহে যদি দার্জিলিঙ টুরিস্ট অফিস থেকে সংবাদবহ এসে জানিয়ে যায় যে, আগামী মাসের কোন তারিখে কতজন যাত্রী আসবেন, তাহলে ওঁরা তাঁদের দেখ্‌ভালের দায়িত্ব নিতে সক্ষম। এখানে খানদানি টুরিস্টদের কথা বলা হচ্ছে না, ভ্রমণ-পাগল স্বল্পবিত্ত ভারতীয়র কথাই বলা হচ্ছে—তাঁরা নিশ্চয়ই এ পরিবেশে সন্তুষ্ট হবেন, যেমন আমরা নিজেরাও হয়েছি। কেদারবদ্রী, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রীর অযুত-নিযুত পায়ে-চলা যাত্রী চটিতে যেটুকু সুবিধা পান, এই নেপালি বা পাহাড়িয়া ভাইয়েরা সেটুকুর ব্যবস্থা করতে সক্ষম। সময় থাকতে আমরা যদি কলকাতা-আসানসোল-দুর্গাপুর থেকে ভ্রমণসূচি ও ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠাই দার্জিলিঙের টুরিজম-অফিসারকে তাহলে আহার-আবাসের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব নয়। এই ভাবেই পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সমতলের মানুষের কিছুটা জান-পহচান হবে যা রেস্ট-হাউস বানালে কিছুতেই হবে না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল—প্রতিটি ঘাঁটিতে দু-চারটি করে পানীয় শোধনাধার সরবরাহ করা। বিকল্পে তা বালি এবং কাঠকয়লায় ভর্তি মাটির হাঁড়িও হতে পারে। এগুলির দাম কিছুই নয় এবং তা গাঁওবুড়োর জিম্মাদারিতে রাখা চলে। ওরা ঝরনার জল অনায়াসে হজম করে; সমতলের অনভ্যস্ত মানুষ এটুকু পরিশোধন ছাড়া ঝরনার জলে হিল-ডায়েরিয়ায় ভুগবে।

তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল কিছু সাইন-বোর্ড সরবরাহ করা। কাঠ যেখানে প্রায় বিনামূল্যে লভ্য সেখানে এটি কেন করা হয়নি তা বোধের অগম্য। অথচ ব্যাপারটা যে কী নিদারুণ গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাবার জন্য আমার রিপোর্টের একটি অনুচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ দিতে হচ্ছে :

"৬) আমি প্রথমেই বলতে চাই—পর্যটন তথা পূর্ত বিভাগ শুধু চক্রযানের কথাই এতদিন ভেবেছেন, পদযাত্রীদের কথা নয়। তাই যতটা পথ জিপ যায় ততটা পথেই শুধু সাইন-বোর্ড আছে। তারপর নেই। সান্ডাকপু অতিক্রম করার পর—যে পথে জিপ যায় না, সে-পথে দীর্ঘ ছয়দিন আমরা পথনির্দেশসূচক কোনও সাইন-বোর্ড দেখিনি। দু-একটি উদাহরণ দিই : ৬ক) সান্ডাকপু থেকে ফালুটের দিকে এক ঘণ্টা চব্বিশ মিনিট হাঁটার পর (দূরত্ব নির্দেশক কিলোমিটার পোস্ট না থাকায় এ ভাবে বলতে বাধ্য হচ্ছি) পায়ে চলা পথটা ইংরেজি Y-অক্ষরের মতো দ্বিধাবিভক্ত। মালবাহী নেপালি সহযাত্রীর নির্দেশে ডানদিকের সঙ্কীর্ণতর পথে আমরা এগিয়ে গেছিলাম, যদিও বাঁ-দিকের পথটাকেই মূল সড়ক বলে মনে হয়। পথ-প্রদর্শকটি আমাদের জানিয়েছিল, বাঁ-দিকের ওই পথটি নেপাল রাজ্যে গেছে এবং সে-পথে নিকটতম গ্রাম পাঁচ দিনের পথ। সে আরও বলেছিল, বছর কয়েক আগে একজন ব্রিটিশ টুরিস্ট তাঁর দল থেকে পিছিয়ে পড়ে একা একা হাঁটছিলেন। তিনি ভুল করে ওই বাঁ দিকের পথে চলে যান। সপ্তাহখানেক পরে ওই পথের প্রান্তে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। ঘটনাটিকে অতিরঞ্জন মনে হওয়ায় প্রত্যাবর্তনের পথে আমি 'সামিট-টুরিস্ট'-এর শ্রীযুক্ত অরুণ দেওয়ানকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে জানতে পারি ঘটনাটি সত্য। ব্রিটিশ ভদ্রলোকটি এসেছিলেন সীতা-ট্রাভেলস-এর মাধ্যমে। ফলে সত্যাসত্য এখনও যাচাই করা যায়। কিন্তু সে বিতর্কে প্রবেশের আগে আর একটি কাজ করা উচিত—ওই পথের বাঁকে একটি পথনির্দেশক সাইন-বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া।"

এ ধরনের দু-মুখো পথ, যার একদিকে গন্তব্যস্থল অপরদিকে মৃত্যুর হাতছানি, সে-রকম সাতটি উদাহরণ আমার রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছিল। এ-পথে যাঁরা চরণযুগলকে ভরসা করে গেছেন তাঁরা ফিরে এসে এই অসুবিধার কথা আমারই মতো তারস্বরে জানাতে চেয়েছেন। একটি প্রমাণ দাখিল করি। রিমবিক ফরেস্ট ডাক-বাঙলোর চৌকিদার অর্ধ শতাব্দীকাল একটি ভিজিটার্সবুক উইপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে আসছে। সেটা নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাবেন, এই আবেদন প্রথম করেছিলেন একজন পরদেশী পর্যটক—মিস্টার পি. এন. ন্যাস; 'ইন দ্য ইয়ার অব গ্রেস' উনিশ শ' ষোলো খ্রিস্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তখন দু বছর বয়স। ভদ্রলোক ভিজিটার্স বুকে লিখেছিলেন—"এই ডাক-বাঙলোর নিচে লোডোমা খোলা নদীর সাঁকো অতিক্রম করার পর দুদিকে দুটি পাকদণ্ডী পথ আছে। একটি অরণ্যমুখী, একটি

এই বাঙলোয় আসার পথ। কোনও সাইনবোর্ড না থাকায় ভুল পথে গিয়ে ভুগেছি। দয়া করে ওখানে একটা সাইনবোর্ড দিয়ে ডাক-বাঙলোর পথটা নির্দেশ করুন।" একই অনুরোধ আরও অনেকে করেছেন। সর্বশেষ অনুরোধ, একজন অস্ট্রেলিয়ান পর্যটকের, আমরা ওখানে উপস্থিত হওয়ার মাসখানেক পূর্বে। অর্থাৎ গত ষাট বছর ধরে পর্যটকেরা ক্রমাগত অরণ্যরোদন করে গেছেন। বলাবাহুল্য আমরাও সেই প্রত্যাশিত পথ-নির্দেশক সাইনবোর্ডটি দেখতে পাইনি, কারণ আজও তা খাটানো হয়নি।

'ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।'

হাঁটাপথে প্রতিবছর কতজন যাত্রী সান্ডাকপু-ফালুট যান সেটা আন্দাজ করতে আমরা গোটা-পাঁচেক ডাকবাঙলো থেকে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছিলুম। নমুনা-জরিপের মোদ্দা ফল : গত পাঁচ বছরের গড় হিসাবে বার্ষিক ষোলোজন ভারতীয় এবং তিনজন বিদেশি ভিজিটার্স-বুকে সই দিয়েছেন। কোন দলে কতজন যাত্রী ছিলেন সবক্ষেত্রে তার উল্লেখ নেই। যে কটির আছে, তার গড় হচ্ছে : চার। ফলে আনুমানিক হিসাবে বার্ষিক যাত্রীসংখ্যা থিওরেটিক্যালি : ছিয়াত্তর। বাস্তবে তা সওয়া শ বা দেড়শ হতে পারে।

এতকথা লিখছি এজন্য যে, 'দেশ' একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা। ছয় বছর পূর্বে আমি যে রিপোর্টখানা দাখিল করেছিলুম সে-আমলে সেটা কেউ পড়ে দেখুন-না-দেখুন তা আজও লালফিতে বন্দী হয়ে সযত্নে সাজানো আছে মহাফেজখানার ফাইল র‍্যাকে। না থাকলেও ক্ষতি নেই, আমার কাছে তার কপি আছে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন নিয়ে আজ যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন তাঁরা ঘটনাচক্রে এ রচনাটি পড়ে উৎসাহিত হতে পারেন। যাচাই করে দেখতে পারেন—অজ্ঞান ভ্রূণের হৃদস্পন্দন আজও শোনা যায় কি না। আমাদের এগারো দিনের যাত্রাপথে আমরা দ্বিতীয় কোনও পদযাত্রীর সন্ধান পাইনি। পায়ে হেঁটে সান্ডাকপু-ফালুট গেছেন এমন মানুষের সঙ্গে আজও আমার পরিচয় হয়নি। আমি অবশ্য উমাপ্রসাদবাবু অথবা শঙ্কু-মহারাজের মতো পথ-পাগলদের কথা বাদ দিয়ে বলছি। তুলনায় কেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী, অমরনাথের পথে প্রতি বছর কোন-না বিশ-পঞ্চাশ হাজার মধ্যবিত্ত বাঙালি দৌড়ায়। হিমাচল আর কাশ্মীর রাজ্যে ঢেলে দিয়ে আসে এ রাজ্যের টাকা। সবাই যে নিছক পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য যায় এ-কথা মানতে রাজি নই। আর পুণ্যের কথাই যদি বলেন, তবে সে বাধা অতিক্রমের দায়িত্ব না হয় আমিই নিচ্ছি। অবসরপ্রাপ্ত বেকার মানুষ—দিন না স্যার, হাঁটা পথের বাধাটা সরিয়ে—প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায় সান্ডাকপুর চূড়ায় একটা মন্দির-উন্দির বানিয়ে, ধুনী জ্বেলে, ছাই মেখে একটা 'নয়া-বেওসায়' ঝুলে পড়ি।

সাহিত্যিক মাত্রেই কল্পনাবিলাসী। মনের চোখে দেখছি—ভ্রূণটি ভূমিষ্ঠ হল, হামা দিতে শিখল, ক্রমে হাঁটি-হাঁটি পা-পা—তারপর নব্বইয়ের দশকে দেখতে পাচ্ছি দার্জিলিঙ শহরে আয়োজন করা হয়েছে এক বর্ণাঢ্য 'ট্রেকিং-র‍্যালি'র। ম্যারাথন-দৌড়ের মতো পড়ি-তো-মরি ছোটা নয়, অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত মোটর-র‍্যালির মতো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট চড়াই-উৎরাই। প্রতিযোগীরা নির্দিষ্ট ওজনের পিঠু নিয়ে চড়াই ভাঙছে। স্টপ-ওয়াচ হাতে ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে বসে আছেন কর্মকর্তারা। পাহাড়ে-চড়ার কষ্টসহিষ্ণুতার যাচাই হচ্ছে। বয়স-অনুপাতে গ্রুপ।

ইউরোপ-আমেরিকা-জাপান থেকে এসেছেন অ্যামেচার পর্বত-বিলাসীরা। প্রফেশনাল মাউন্টেনিয়াররা নন। কাতারে কাতারে দর্শক—সমতলের মানুষ আর পাহাড়িয়ার দল। আমরা কলকাতার ট্রামে-বাসে চলছি মিনি-ট্র্যানজিস্টার কানে চেপে। শঙ্কু মহারাজ আজ আমাদের গাভাসকার! রাজ্যপাল স্বয়ং এসেছেন শৈলাবাসে ট্রফি দিতে।

তা যদি হয়, তবে জ্যোতিষ-সম্রাটের মতো একটা ভবিষ্যদ্বাণী আজই করতে পারি : সত্তর-ঊর্ধ্ব গ্রুপের ট্রফিটা ভারতের বাইরে যাবে না। সেটা এসে পৌঁছাবে এই আমাদের ভবানীপুরেই। গুঁপো-সরস্বতীর নামাঙ্কিত এবং মেট্রোরেলের বদান্যতায় চড়াই-উৎরাইসুশোভিত একটি সড়কের অধিবাসী এক গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন সত্তরোর্ধ্ব যুবকের বৈঠকখানার টেবিলে।

পূর্ব এশিয়া আর ইউরোপ মোটামুটি হয়েছে। আফ্রিকার কপালে আলতো একটি চুমু খেয়ে এসেছি। অস্ট্রেলিয়া দূর-অস্ত্। আর গোটা ভারতবর্ষটাকে তো এক নজরে দেখেছি মালবাজীর আশীর্বাদে—কাশীতে 'ভারতমাতা' মন্দিরে। বাকি রইল মার্কিন মুলুক। ম্যারিকা। সেটা হবে। নির্ঘাৎ এবং অচিরেই। তবে খবরটা স্ট্রিক্টলি 'কনফিডেন্সিয়াল'! টপ সিক্রেটটা কানে-কানে আপনাদের জানাতে পারি, যদি কথা দেন সেটা আমার ঘর-ওয়ালীর কানে তুলবেন না। খুলেই বলি। আমেরিকাবাসিনী একটি অতি সুন্দরীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। সম্প্রতি। মানে বছর তিনেক। চিঠি চালাচালির পর্যায় চলছে। আমি প্রথম থেকেই তাকে তুমি সম্বোধন করি, সে প্রথম 'তুমি' বলে কথা বলেনি, বছরখানেক ধরে বলছে। সেই মেয়েটিই আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ওই নতুন পাতানো বান্ধবীর বাড়িতেই অতিথি হব। মুশকিল এই যে, ফিরে এসে ভ্রমণ-কাহিনি লিখতে পারব না। সরমে বাধবে। উত্তমপুরুষে লেখা ভ্রমণ-কাহিনিতে নায়কের চুটিয়ে-করা-প্রেমকাহিনি লেখা যে এটিকেটে মানা! উপায় কী!

আমার এ বান্ধবীটিকে আপনারা চেনেন না। কিন্তু তার মা-কে চেনেন হয়তো। 'পথের মহাপ্রস্থান'-এর সেই ছোট্ট মেয়েটিকে মনে আছে? ঘুমের ঘোরে যে মেয়েটা অতল খাদে গড়িয়ে পড়ছিল, আর তার বাপ, এক লাফে শেষ মুহূর্তে তার ফ্রক চেপে ধরেছিল। আমার সে-দিনের সেই ছোট্ট মেয়ে বুলবুলের কোল আলো করে বছর তিনেক আগে এসেছে আমার শেষ জীবনের এই প্রথম প্রেম! স্থায়ী, সঞ্চারীর ঘাট পার হয়ে সবশেষে আমার জীবনে ধরা দিল এই অন্তরতমা : 'অন্তরা'!

বদ্দিপাড়ার স্বনামধন্য নিমাই রায় মশায়ের সেই মর্মান্তিক প্রশ্নটি, "বাবাজী, একটি প্রশ্ন করি তোমাকে; বলি হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ফসকে গেলে কি আর ফেরানো যায়!"—শুনে হতচকিত জামাতা বাবাজীবন বলেছিল, 'আজ্ঞে না'। বেচারি গোকুল সে-আমলের মানুষ; সে না শুনেছে রিমোট-কন্ট্রোল রেডিও মিস্‌ল্‌স্‌'-এর কথা, না জেনেছে স্বাধীনতা-উত্তর মহারথীদের প্রাকনির্বাচনী ভাষণে প্রতিশ্রুতির মাহাত্ম্য। বাঙলা সনের এই নব্বই দশকের আগমনী মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি কিন্তু নির্দ্বিধায় প্রত্যাহার করে নিচ্ছি মহাফেজখানার ফাইলর‍্যাক সংক্রান্ত আমার মন্তব্যটি। মাস-চারেক আগে লিখিত প্রবন্ধের ওই পংক্তির বিষয় সাম্প্রতিকতম সংবাদ, "হিল-এরিয়া ডেভলপমেন্ট কাউন্সিল তথা প্ল্যানিং কমিশন সান্ডকপু-ফালুটে পদযাত্রীদের সুবিধার্থে 8.50 লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ

মঞ্জুর করেছেন। 5.3.83 তারিখে প্রকাশিত একটি সরকারি প্রেস নোটে বলা হয়েছে যে, পদযাত্রীদের জন্য ভোত্রে, গৈরীবাস, মোলে-তে যাত্রীকুটির নির্মাণের জন্য বনবিভাগকে 7.55 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এ-ছাড়া মানেভঞ্জন, সান্ডাকপু, রামাম ও রিমবিকে যুবনিবাস নির্মিত হবে। পথ সংস্কার ও পানীয় জলের ব্যবস্থাও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত (তথ্যসূত্র : স্টেটসম্যান পত্রিকা, 8.3.83 পৃষ্ঠা 7)।

আমরা আনন্দিত। এর পর একটা কথাই শুধু বলা শোভন :

যুগ, যুগ জিও!

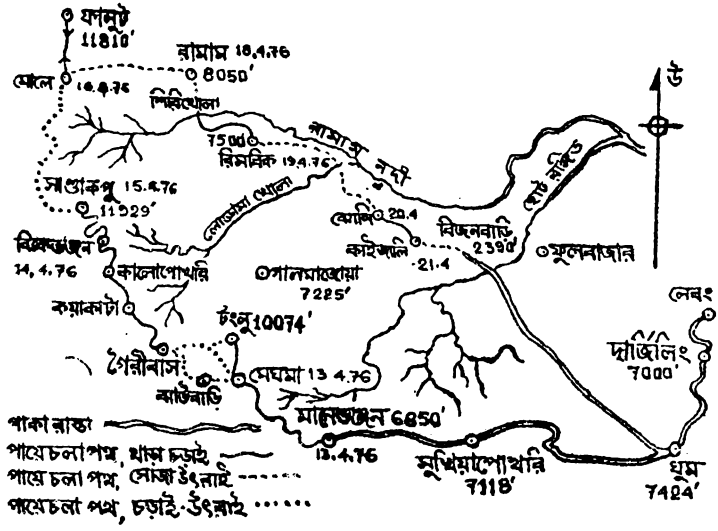

দণ্ডক-শর্বরী

ভ্রমণ-সাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে গত বছর মহা-বখেড়ায় পড়া গেছিল। তবু সেটা ছিল মোটামুটি ধরা-ছোঁওয়ার ভিতর। এবার অ্যানুয়াল পরীক্ষায় এসেছে কঠিনতর একটা প্রশ্ন : রম্য-রচনা! বাধ্য হয়ে অনুজপ্রতিম বাংলার এক অধ্যাপকের শরণাপন্ন হতে হল। সে বললে, 'রম্য-রচনা' মানে ইয়ে আর কি..... যা না-উপন্যাস, না-গল্প, না-প্রবন্ধ—অথচ যা রম্য, পাঠককে আনন্দ দেবে।

আমি ধমকে উঠি, তুমি কি মওকা মাফিক আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা শেখাচ্ছো? না-সাকার, না-নিরাকার, অথচ আনন্দময়!

অধ্যাপক হাত কচলে বলে, বেকায়দায় পড়লে নঞর্থক সংজ্ঞাই বিধেয়। খোদ জনসন-সাহেবকে একবার বস্‌ওয়েল প্রশ্ন করেছিলেন, 'কবিতা কাকে বলি?' তা জবাবে জনসন বলেছিলেন, 'তার চেয়ে বরং জেনে রাখ কাকে কবিতা বলি না।'

আমি বলি, চুলোয় যাক সংজ্ঞা। মোদ্দা ব্যাপারটা কী?

—ওই যা এতক্ষণ বোঝাচ্ছি। রম্যরচনায় থাকবে না পাতিলেবু-পূর্বক মিঠাপানান্তক ঔপন্যাসিক ভূরিভোজ, থাকবে না ছোটগল্পের পরিপাটি পরমান্নের বাটি, অথবা প্রবন্ধের দাঁতভাঙা আখ্‌রোটি খোসা। স্বাদটা হবে টক্-ঝাল-মিষ্টি-মিষ্টি! রচনাটা হবে সুখপাঠ্য, সহজপাঠ্য, স্বাদু এবং রম্য!

—দেখ হে প্রফেসর! রম্যরচনা যে 'রম্য' এবং 'রচনা' এই স্বতঃসিদ্ধ দুটি তোমাকে বারে বারে শোনাতে হবে না। বরং দু-চারটে উদাহরণ দাও দিকিন! হুতমপেঁচা, ভানুসিংহের পত্রাবলী, লিপিকা অথবা সুনন্দের জার্নাল কি রম্যরচনা?

অধ্যাপক বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিবুকটা চুল্‌কালো। তারপর বলে, সে কথা বলা কি শাস্ত্রসম্মত হবে? ধরুন গিয়ে প্রথমটাকে বলা হয় নক্‌শা, দ্বিতীয়টাকে 'বেলে-লেটার্স', তৃতীয়টা গদ্যকবিতা, আর শেষেরটা তো জার্নাল!

আমি চিৎকার করে উঠি, বাংলাভাষায় তাহলে কেউ কখনো রম্যরচনা লেখেনি?

ও বলে, চট্‌ছেন কেন দাদা? আপনার মূল সমস্যাটা কী? অ্যাদ্দিন তো দিব্যি ছিলেন খোশ্-মেজাজে, আজই বা হঠাৎ এমন হেড-অফিসের বড়বাবুর মতো 'আমায় ধরে তোল' শুরু করলেন কেন?

—কারণ আমি সম্প্রতি এক গভীর গাড্ডায় পড়েছি! একটা রম্যরচনা লেখার বায়না নিয়ে ফেলেছি। কিন্তু 'রম্যরচনা' ব্যাপারটা কী না জানলে...

—এই কথা? তাহলে 'সংজ্ঞা' নিয়ে আমাকে পাগল করছেন কেন? কায়দাটুকু শুধু শিখে নিন। 'বেলে-লেটার্স'-এর আগে 'এলে'-প্রত্যয় যোগ করলেই আপনার কেল্লা ফতে। শুধু খেয়াল রাখবেন, ফুটনোট না-মঞ্জুর, ডায়াক্রিটিকাল মার্কস্ দিয়ে

'উরুশ্চারণ' বোঝানোর চেষ্টা করবেন না, তথ্যসূত্র দেওয়া বারণ আর বিদ্যে জাহির করা চলবে না। বুঝেছেন?

—না: বিষয়বস্তুটা কী হবে?

—যা খুশি! নিজের কোনো অভিজ্ঞতার কথা। রোমান-ক্যাথলিক যেমন 'কনফেশান' শোনায়।

—কনফেশান! কিন্তু আমি তো কোনও পাপ করিনি?

—করেছেন। রম্যরচনা লেখার বায়না নিয়েছেন।

—সে তো 'দেশ'-এর ডাক।

—আপনার মতো 'নন্দলাল' ছাড়াও 'দেশ' এতদিন টিকে আছে, থাকবেও। বেশ, না হয় ধরে নিন আপনি কোনো সাইকো-অ্যানালিস্ট-এর কাছে সিটিং দিচ্ছেন!

ঘাবড়ে গিয়ে বলি, আমি কি তবে পাগল হতে বসেছি?

—তাতে কি আপনার এখনও সন্দেহ আছে? না হলে এত লোক থাকতে আপনাকে কেউ 'রম্যরচনা' লিখতে ডাকে!

বেশ; তাই সই। প্রথমেই একটা 'কনফেশন' করি। একটা স্বীকারোক্তি।

প্রায় বিশবছর আগে একটা রচনা লিখেছিলুম। সেটা না-উপন্যাস, না-প্রবন্ধ, না-ভ্রমণ কাহিনি। সেটি ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কিন্তু প্রতি সংখ্যাতেই হয়েছিল একটি করে মারাত্মক বর্ণাশুদ্ধি। শিরোনামায়! দোষ প্রুফ-রিডারের নয়, লেখকেরই। আমিই 'রেফ্'-চিহ্নটা দিতে ভুলেছিলুম। ত্রুটিটা নজরে পড়ল সম্প্রতি। বিশ বছর পরে দ্বিতীয়বার দণ্ডকারণ্য ঘুরে এসে।

সেই অবাক-অরণ্যের সঙ্গে যেদিন প্রথম শুভদৃষ্টি হয় তখনো আমার দেহে-মনে প্রৌঢ়ত্বের ছোঁওয়া লাগেনি। শাল-পিয়াল-কেঁদ-মহুয়ার জড়াজড়ি-জঙ্গলে সেদিন বনপথের বাঁকে দেখেছিলুম একটি বন্য-মঞ্জরী। যুবক দর্শকের মুগ্ধদৃষ্টির সামনে অনাবৃত-উরসা আফ্রোদিতে লজ্জা পায়নি আদৌ। যেন আপেল গাছের সন্ধান না পাওয়া অনাঘ্রাতা ঈভ। সেই দণ্ডক-শবরীকে দেখে মনে হয়েছিল—ও আমার অতি পরিচিতা, আমার আপনজন, শুধু 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার!'

দুদশক পরে এবার গিয়ে দেখলুম—সেই অরণ্য প্রায় নিশ্চিহ্ন, সেই শবরী অন্তর্হিতা। না! তার চেয়েও বড় ট্রাজেডি : সে রূপান্তরিতা! তার চরণে চল-চঞ্চল নূপুর নয়, চপ্পল; তার নিরাবরণ পীবরবক্ষে কড়ির মালা নয়, ব্রেশারী-জ্যাকেট; কপালে, উল্কিচিহ্নের আলিম্পন নয়, বিন্দি টিপ; আর তৈলতৃষিত কবরীতে পলাশমঞ্জরী অনুবিদ্ধ নয়, শাম্পু করা চুলে প্লাস্টিকের ক্লিপ!

আদিম অরণ্যে অবলুপ্ত হয়েছে সেদিনের অপরাহ্ণের কনে-দেখা-আলো।

তার স্থলে এসেছে তমিস্রা! আধুনিকতার আঁধার!

শবরী সরে গেছে নেপথ্যে; নেমেছে নীরন্ধ্র শর্বরী!

এবার রায়পুরে প্রৌঢ় আমাকে কেউ রিসিভ্ করতে আসিনি। কিন্তু সেই প্রথম যৌবনে? সেই সতেরোই এপ্রিল উনিশশো ষাট সালে? সেদিন রায়পুর স্টেশানে

আমাকে সম্বর্ধনা জানাতে সারি-সারি খাড়া ছিল—বল্লে-না-পেত্যয়-যাবেন—পাঁচ নয় দশ নয়, পাক্কা পনেরো জন তক্‌মাধারী!

স্বীকার্য : সামান্য 'পোয়েটিক্ লাইসেন্স' নিয়েছি। আমাকে ঠিক নয়, আমার যাত্রা-সহচরীকে রিসিভ করতেই অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়েছিল ওরা। আমার সঙ্গিনীটি ছিলেন—কী যে বলি?—কিছুটা গতরে-সতরে! কিলো-কুইন্টাল পয়দা হলেও তখনও চালু হয়নি। তার বরাঙ্গের ওজন : না-হোক দশ মন!

তাহলে খুলেই বলি ব্যাপারটা : পি ডাবলু-ডি-র এক্সিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার হিসাবে ডেপুটেশন চেয়েছিলুম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এ-পক্ষ রাজি হলেন ছাড়তে, ও-পক্ষ নিতে। 14.4.1960 তারিখে পেলুম নিয়োগপত্র এবং তৎসহ একটি রামপট টেলিগ্রাফ। প্রেরক ব্যান্ডো-সাহেব, অর্থাৎ দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চিফ এঞ্জিনিয়ার। দীর্ঘ তারবার্তার বক্তব্য—"19.4.60 তারিখে দণ্ডকারণ্যে 'ভাস্কল ড্যাম'-এর শিলান্যাস করতে আসছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। প্রধান অতিথি—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী। কলকাতার অমুক দোকানে মার্বেল ফলকটা ডেলিভারি নেওয়ার অপেক্ষায় আছে। জয়েনিং টাইম নিও না। 19.4.60 তারিখে পাথরটা স্বয়ং নিয়ে বম্বে মেলে রওনা দাও। রায়পুরে স্টেশনে সতেরো তারিখে একটা ট্রাক তোমার প্রতীক্ষায় থাকবে। মার্বেলফলকটা সরাসরি ট্রাকযোগে ওই ভাস্কল ড্যাম সাইটে পাঠিয়ে দেবে। কোনোক্রমেই যেন অন্যথা না হয়। বিপিট—অন্যথা না হয়।"

প্রাঞ্জল ভাষা। প্রাণ-জল করা। 'রাম জন্মের পূর্বে যদি আদিকবির স্কন্ধে কাব্যের ভূত অধিষ্ঠিত হতে পারে, তবে জয়েনিং রিপোর্ট দাখিল করার আগে ও ছোকরার কাঁধে জগদ্দল পাথরটা চাপানো চলবে না কেন?'—ব্যান্ডো-সাহেবের যুক্তিটা বোধকরি ছিল এই জাতের। মোটকথা—জয়েনিং-টাইম কর্পূর! এত অল্প নোটিশে ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এক্‌লা চলরে। অনেকদিন আগেকার কথা—ঠিক স্মরণ হয় না—মনে হচ্ছে অরণ্যকাণ্ডের বৌ-চুরি যাবার প্রসঙ্গ তুলে বলতে গিয়েছিলুম—এ একপক্ষে ভালোই হল! ধমক খেতে হয়েছিল ফলে। আবছা মনে আছে, তিনি জানতে চেয়েছিলেন, 'হ্যাঁগো! সেখানে নাকি মেয়েরা বুকে কাপড় দেয় না?' বলেছিলুম, 'তাই তো শুনছি, কী জানি? গেলেই দেখব। তোমাকে চিঠি লিখে জানাব বরং।'

আবার ধমক, 'থাক!'

সে 'থাক্'টা যে কিসের নেতিবাচক, তা এ বিশবছরেও বুঝতে পারিনি। 'চিঠি লেখা' না 'চোখ তুলে দেখা'! মোট কথা, রামের মতো স্ত্রীযুক্ত হয়ে নয়, লক্ষ্মণের মতো শ্রীযুক্ত হয়ে একাকীই যেতে হবে আপাতত। কাব্যে উপেক্ষিতার প্রসঙ্গ নেপথ্যেই থাক।

কী বললেন? তাহলে 'যাত্রা-সহচরী'র কথা আসে কোন্ সুবাদে?

কী বখেড়া! আমি কি মশাই পূজ্যপাদ শ্বশুর-মশায়ের কাছ থেকে দশমনি মেদের মৈনাক, বি-পূর্বক বহন করার 'ঘঞ্' নিয়েছিলুম?

রামপট টেলিগ্রাফে সব কথাই বলা হয়েছিল, শুধু বলা হয়নি—আমার উনি কতটা তন্বী!

সারাটা দিন গেল বাঁধা-ছাঁদায়। যাঁর কথা অনুক্ত রইল তিনি 'সতীর পুণ্যে-পতির পুণ্য' থিয়োরিতে বাক্স গুছিয়ে দেবার অছিলায় কোন ফাঁকে যে হাতসাফাই করে 'ন্যূড ইন ওয়ার্ল্ড আর্ট'—নামক সচিত্র ঢাউস বইটি সরিয়ে একখণ্ড রামায়ণ দিয়ে পাদপূরণ করেছিলেন তা টের পাইনি। নেমকহারামি করব না, সান্ত্বনা দিতে ওরই সঙ্গে ভরে দিয়েছেন আমসত্ত্ব, স্কেচখাতা, জ্যামের শিশি। গৃহিণীর কাঁকনপরা হাতে বানানো জ্যাম নয়, হাওড়া-ব্রিজের কাঁপনধরানো জ্যামের কথাটাই শুধু আমার স্মরণে ছিল। তাই রওনা দিলুম ঘণ্টা দুই-এর পুঁজি নিয়ে। ওদিকে দুয়ারে গাড়ি প্রস্তুত হবার আগেই বেলাদ্বিপ্রহরে আমার দু'জন করিৎকর্মা করণিককে পাঠিয়েছি দোকান থেকে মার্বেল-ফলকটা ডেলিভারি নিয়ে স্টেশনে যেতে। বম্বে মেলের ব্রেকভ্যানে ক্রেটবন্দি পাথরটা 'বুক' করে দেবার নির্দেশ দেওয়া আছে তাদের। ব্যান্ডো-সাহেবের কাছে সদ্য শেখা কায়দায় : 'কোনোক্রমেই যেন অন্যথা না হয়; রিপিট—অন্যথা না হয়!'

স্টেশনে পৌঁছেই পাওয়া গেল চরম দুঃসংবাদটা। দু-ঘণ্টার তদ্‌বির-তদারকিতেও আমার বুক-জুড়ানো ধনকে ওরা 'বুক' করাতে পারেনি। বুকিংক্লার্ক ওদের পাত্তাই দেয়নি। শোনা গেল—মেল ট্রেনের ব্রেকভ্যানে কী-মাপের ও কত ওজনের মাল নেওয়া যাবে তার ঊর্ধ্বতম সীমায় একটি অনতিক্রম্য লক্ষ্মণের গণ্ডি আছে। আমার 'উনি' কী-আয়তনে, কী-ওজনে দুটি আইনই লঙ্ঘন করেছেন! মালগাড়ি ছাড়া এঁর গতি নেই—এটাই ওঁদের বক্তব্য।

আমি তো স্রেফ রোডে সিট ডাউন! ট্রেন ছাড়তে তখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি। মালবাবু নির্বিকার। ক্রমাগত স-জর্দা মিঠে-খিলি রোমন্থন করে চলেছেন। ধরলাম তাঁর উপরালাকে। চিড়ে ভিজল না। তস্য বস? তিনিও স্থিতপ্রজ্ঞ! দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন, সুখে বিগতস্পৃহ। মায় যে অ্যাকোয়া-রিজিয়ায় পাথর গলে সেই রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক গভর্নরের অঙ্গীকৃত ওষুধেও কাজ হল না! ওঁদের দোষ নেই—কাঞ্চনমূল্যে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে চুপিসাড়ে পাচার করা যায় না!—ঘড়ির কাঁটাও যেন নিরাসক্ত বড়বাবু : টিক্-টিক্-টিক্-টিক্! শেষমেশ দৌড়ালুম হাওড়া-স্টেশনের সর্বময় বড়কর্তার চেম্বারে। মাসশেষের মানিব্যাগটির মতো ব্যালেন্স ততক্ষণে চুপসে এসে ঠেকেছে আধঘণ্টায়!

বড়সাহেবের খাশ্ কামরাটি দ্বিতলে। খাশ না অ্যাংলো খোদায় মালুম। তবে গাত্রবর্ণটা টক্‌টকে লাল। দ্বারে ছিল উর্দিধারী দ্বারী। টুল থেকে ত্রিং করে লাফিয়ে ভেজানো দ্বারের চালচিত্রের সামনে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ভঙ্গিটা এককদম দেখিয়ে দিল। তাকে যে ধাক্কাটা মেরেছিলুম তাকে লোকটা শির-পা হয়েছিল কি না ফিরে দেখিনি। ভাববেন না, এ আমার বীরত্ব বা বাহাদুরী। অনেকানেক দুঃসাহসিকতার উইংস্-এর আড়ালে লুকিয়ে থাকেন যে প্রম্পটার, আমার ক্ষেত্রেও ছিলেন তিনিই : দুরন্ত ভয়! বাঙালির পোলা! চাকরি বলে কতা! বিবেচনা করে দেখুন—সেই খণ্ডমুহূর্তে আমি মহারাজ ত্রিশঙ্কু! সদাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'রিলিজ' করেছেন। এবং করুণাময় কেন্দ্রীয় সরকার আমার জয়েনিং রিপোর্ট 'অ্যাক্‌সেপ্ট' করেননি। আমি তখন না ঘরকা, না ঘাটকা! ওই 'আদরিণী' হস্তিনী যদি বম্বে মেলে 'বুকড' না হন তো আমারই বুকে

চেপে বসবেন! একটি কলমের ঘ্যাঁচঘ্যাঁচে আমার চাকরি নট্! ওই পাথরটাই রূপান্তরিত হবে আমার বেদাগ চাকরিজীবনের টুম্ব-স্টোন-এ!

হুড়মুড়িয়ে আমি ঘরে ঢুকতেই লালমুখো রয়্যাল বেঙ্গল গর্জে উঠলেন, 'ডোন্ট ইউ নো ম্যানার্স ইয়ং ম্যান?'

আমি এক নিশ্বাসে বলে ফেলি, সাহেব! এবারের মতো ক্ষমাঘেন্না করে পাথরখানা আমাকে নিয়ে যেতে দাও!

—পাথর! হোয়াট পাথর? হোয়াই পাথর?

যদ্দূর সংক্ষেপে সম্ভব সমস্যাটা আমি নিবেদন করি। বম্বে মেল ছাড়তে তখন মাত্র বাইশ মিনিট বাকি। আমার পিছন-পিছন এসেছেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ বড়বাবু। এঁচোর-কোটার উদ্যোগপর্বের তৈলাক্ত মুদ্রায় হাত দুটি কচলে তিনি শুনিয়ে দিলেন ক্রেটের মাপ ও ওজন। সব শুনে বড়সাহেব অন্তিম নিদান হাঁকলেন, ইম্পসিব্‌ল্! ওই মাপের ক্রেট বম্বে-মেলের ব্রেকভ্যানে কোনোদিন যায়নি, যাবে না! তুমি ওটাকে গুড্‌স্ ট্রেনে বুক করতে পার।

এবার আমিই এঁচোর-কোটার কায়দায় হাতদুটি কচলে বলি, স্টেট এমার্জেন্সি স্যার! স্বয়ং চিফ মিনিস্টার ইনভল্‌ভড্!

সাহেব শ্রাগ্ করলেন : আয়্যাম নট কন্‌সার্নড! স্টেট গভর্নমেন্টের কোনও লিখিত অনুরোধপত্র এনেছ?

—আজ্ঞে না। এটা যে এতবড় তা আমারও জানা ছিল না।

—সেটা তোমার ইনেফিশিয়েন্সি। টাইম-টাইড্ অ্যান্ড ট্রেন ওয়েটস্ ফর নান! সতেরো মিনিট আর বাকি আছে। ট্রেনটা যদি ধরতে চাও...

সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়!

দাঁতে দাঁত চেপে যাবনিক পণ্ডিতকে বলি, স্যার, আমার একটা অনুরোধ অন্তত রাখুন?

—কী অনুরোধ?

—আপনার ঘর থেকে আমাকে একটা টেলিফোন করতে দিন।

—টেলিফোন! কাকে? কেন?

—রাইটার্সে। মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিবকে। ওঁর ট্যুরটাও তো বাতিল করাতে হবে। দিল্লিতে ট্রাঙ্ককলে, এইচ. এম. খান্না-সাহেবকে না হয় তিনিই জানাবেন। এটা তো মানেন, আপনার ডিসিশনে এই মুহূর্তে এঘরে একটা অল ইন্ডিয়া নিউজ পয়দা হচ্ছে!

সাহেবের ভ্রুকুঞ্চন হল। পাঁচ-সেকেন্ড দেরি হল জবাবটা দিতে। তবু ষাঁড়ের ডালনা খাওয়া বাঘ! গম্ভীরভাবে বললেন, টেলিফোন? টেলিফোন করতে চাও, বাইরে পাবলিক বুথ আছে।

বাঘের চোখে পলক পড়তে দেখেছি। সাহস বেড়েছে। বলি, না! তোমার এই ঘর থেকেই টেলিফোনটা আমাকে করতে হবে। আমি চাই ডক্টর রায় যখন পণ্ডিত নেহেরুকে ব্যাপারটা জানাবেন তখন যেন তিনি বলতে পারেন তার ইনেফিসিয়েন্ট অফিসার হাওড়া স্টেশনের হায়েস্ট-অথরিটি পর্যন্ত অ্যাপ্রোচ করেছিল।

বিনা অনুমতিতেই প্রকাণ্ড টেবিলের ও-প্রান্তে টেলিফোনটার দিকে আমি হাতটা বাড়িয়ে দিই। সাহেব গর্জ ওঠেন, স্টপ্ ইট! তোমাকে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি, তা জানো?

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু হতে পারে না! অমি 'লক-আপে' থাকলে সম্পূর্ণ দায়িত্বটা যে একা তোমার তার একটা পাক্কা এভিডেন্স্ থাকবে! এনকোয়ারির সময় রেলওয়ে পুলিস সাক্ষী দেবে!

সিনেমা-থিয়েটারে মাঝে-মাঝে সবাই স্ট্যাচু মেরে যায়, দেখেছেন? ওই যাকে বলে : ফ্রিজ হয়ে যাওয়া? পাঁচ-সেকেন্ড তাই হল। নীরবতা আমিই ভাঙলুম। সুবোধ বালকটির মতো প্রশ্ন করলুম, বাই দ্য ওয়ে, তুমি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় মানুষটিকে চেন তো?

ভ্রুর মাঝখানে বুলেট বিঁধ্‌লে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কী দৃষ্টিতে তাকায় তা আমি জানি না। আমি কখনও বাঘ শিকার করিনি। সাহেব পাক্কা দশ সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজেই তুলে নিল টেলিফোন রিসিভারটা। কাকে যেন বললে, লুক হিয়ার! আমার ব্যক্তিগত অনুমতি ছাড়া বম্বে মেল-ভায়া-নাগপুর যেন স্টেশন না ছাড়ে! বুঝেছ?

এ-যাত্রা চাকরিটা তাহলে খোয়াইনি। বললুম, থ্যাঙ্কু!

প্রস্থানোদ্যত হতেই দৈববাণী শোনা গেল, শোন! টেলিফোন করে দিচ্ছি, রায়পুর স্টেশনে জনা-পনেরো রেলওয়ে পোর্টার ক্রেটটা নামিয়ে নেবে। তারা রেডি থাকবে; তাদের মজুরিটা মিটিয়ে দিও, আর মেল-ট্রেনকে ডিটেন কোরো না। বুঝলে?

আবার বলি, থাউজেন্ড থ্যাঙ্কস্!

'টাইড' শুনেছি ক্যানিউটের আদেশ লঙ্ঘন করেছিল। কিন্তু 'টাইম অ্যান্ড ট্রেন' সে-আমলে থম্‌কে যেত ওই নামটা শুনলে : বিধানচন্দ্র!

বছর-তিনেক ছিলুম দণ্ডকবনে। ঘুরেছি সব এলাকাতেই। তবে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি মুরিয়াদের—ওই যারা থাকে কোন্ডাগাঁও-নারানপুর অঞ্চলে। ওদের ভিতর থেকেই চয়ন করেছিলুম 'চয়ন, বেলেসা, মালকো, কিরিংগো'দের—আমার 'দণ্ডকশবরী'র উপাদান। আবার উদ্‌বাস্তু কলোনী থেকে বেছে নিয়েছিলুম ছিনাথ মালাকার, রতন ঘোষ, দেবু পণ্ডিতদের—'অরণ্যদণ্ডক'-এর মাল-মশলা। তারপর ফিরে এসেছিলুম কলকাতায়।

চাকরিজীবনের একেবারে শেষাশেষি আবার ডেপুটেশন পেয়েছিলুম একটি কেন্দ্রীয় সংস্থায় : এন. বি. ও অর্থাৎ—'ন্যাশনাল বিল্ডিংস্ অর্গানিজেশন'-এ। তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে গৃহনির্মাণ শিল্পে স্বল্পব্যয়ী পদ্ধতি ও নির্মাণ-কৌশলের প্রচার। স্বাধীনতার পর একাধিক রিসার্চ-সেন্টার তাঁদের ল্যাবরেটারিতে নানান আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন, যাতে বাড়ি-বানানোর খরচ বিশ-ত্রিশ শতাংশ কমিয়ে ফেলা সম্ভব। অথচ সেই পদ্ধতিগুলি বিভিন্নরাজ্যের বাস্তুবিদেরা গ্রহণ করছেন না। নানান কারণে। তাই পয়দা হল এন. বি. ও-র। প্রচার ও প্রত্যক্ষ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে। গোটা ভারতকে ওঁরা

ভাগ করলেন চারটি 'জোন'-এ। পূর্বাঞ্চলের লিয়াজ অফিসারের এক্তিয়ার হল : পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, মেঘালয় ইত্যাদি মায় অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশের খানিকটা। প্রথমে স্থির হয়েছিল তার অফিসটা হবে পাটনায়। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পাটনার পরিবর্তে লিয়াজঁ অফিসারের অফিসটা হল কলকাতায়। আমাকে ওই পদে নিযুক্ত করা হল। ফলে অবসর-গ্রহণের আগে পূর্বভারতের অনেকটা ঘুরে দেখার সুযোগ এসে গেল। সেই সুত্রেই সম্প্রতি গিয়েছিলুম দণ্ডকারণ্যে—আমার যৌবনের কর্মস্থলে। যার ফলশ্রুতি—আগেই বলেছি—কুড়িয়ে আনলুম একটি 'রেফ্'-চিহ্ন।

উনিশশ' ষাট সালে যেখানে দাঁড়িয়ে বিধানচন্দ্র ভাস্কল ড্যাম-এর শিলান্যাস করেছিলেন এবার সেটাকে চিনতেই পারলুম না। সেই দিগন্ত অনুসারী ঊষর প্রান্তর, অগণিত শাল-পিয়াল-মহুয়ার অরণ্য, শীর্ণ স্বচ্ছতোয়া বালি-চিক্-চিক্ স্রোতস্বিনী সব—সব নিশ্চিহ্ন। এখন দেখছি, প্রকাণ্ড জলাধার, বাঁধের উপর উপচে-পড়া ফেনিল জলধারা, সর্পিল সেচের খাল। মনে পড়ল, বিশ-বছর আগে শোনা বিধানচন্দ্রের ভাষণ—"দু-পাঁচ বছরেই, এ-অঞ্চল শস্য-শ্যামল হয়ে উঠবে। লক্ষাধিক উদ্‌বাস্তু এ অঞ্চলে পুনর্জীবন লাভ করবে।"

ভবিষ্যদ্বাণীর আধাআধি সফল। উমরকোট অঞ্চলে 'ভাস্কল ড্যাম' প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছিল পঁয়ষট্টি সালে। খরচ হয়েছিল সে-আমলের এককোটি টাকা। সমস্ত এলাকাটাই আজ শস্য-শ্যামল। কিন্তু ওই অঞ্চলে কৃষিজীবী উদ্‌বাস্তু পরিবারের সংখ্যা তিন হাজারেরও কম। সার্থকতার আনন্দে ওই টুকুই খাদ! বুক কিপিং-এ! উন্নতি হল প্রাদেশিক সরকারের, আর খরচটা লেখা হল উদ্‌বাস্তু পুনর্বসন খাতে!

বিধানচন্দ্র অবশ্য সেজন্য দায়ী নন। স্টেট-ট্র্যান্সপোর্ট, হরিণঘাটার দুধ ইত্যাদি প্রভৃতির মতো এটাও—'এ তোমার এ আমার পাপ?'

গত বিশ-ত্রিশ বছরে যে নতুন আবিষ্কারগুলি সাফল্যলাভ করেছে তা বিভিন্ন রাজ্যের এঞ্জিনিয়ারেরা গ্রহণ করছেন না। প্রশ্ন হবে, কেন এই অনীহা? আমার বিশ্বাস হেতুটা চারজাতের। এক : কনজারভেটিজম্! উপরতলার এঞ্জিনিয়ারেরা—যাঁরা নীতি নির্ধারণ করে থাকেন—তাঁরা স্বতই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ। রিটায়ারমেন্টের দিন গুনছেন। কলেজ জীবনে তিন-দশক আগে যা শিখেছিলেন তাই যেন বিজ্ঞানের শেষ কথা। 'গ্যালিলিও' নাটকে পোপের উক্তি—'যে পথে চলেছি চিরকাল সে-পথেই চলব' হচ্ছে তাঁদের মূলমন্ত্র। দ্বিতীয় দলের বক্তব্য,—"ব্যয়সঙ্কোচ করলে কি আমার দুটো হাত গজাবে? মাইনে বাড়বে?" তা বটে! ফিনান্স বিভাগে কাজের মাপকাঠি হচ্ছে বাজেট-এক্সপেন্ডিচার। যে যত খরচ করছে সে তত বড় কর্মবীর। খরচ কম হলে ফিনান্স হয়তো একটি ডিভিশন অথবা একটি সার্কেল কমিয়ে দেবেন! তৃতীয়দল কী এক গুহ্য প্রেরণায় (!) চান না ঠিকাদারের নেট-পেমেন্টটা কমে যাক। চতুর্থ হেতু—সরকার সচরাচর বড় বড় পরিকল্পনা রূপায়িত করেন 'আর্কিটেক্টস্ ফার্ম' মারফত। তাঁরা প্রতিযোগিতা-মূলক টেন্ডার দেন না। তাঁদের দক্ষিণা নির্মাণ-ব্যয়ের শতকরা হিসাবে। অর্থাৎ স্বল্পব্যয় পদ্ধতি গৃহীত হলে তাঁদের লভ্যাংশ কমে যাবে।

শ্লোকার্ধ্বে বোঝাতে হলে বলতে হয় : 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ!'

এই অরম্য-অনুচ্ছেদের শেষ কথা : অধম লেখক অবসর নেবার পর থেকে 'লিয়াজঁ অফিসার ইস্টার্ন জোন'-এর চেয়ারখানা বছর দুই খালি পড়ে আছে। ইতিমধ্যে উইপোকায় সদ্গতি না-করে থাকলে অবসর নেবার আগে যে রিসার্চ-রিপোর্টগুলি আলমারিতে বন্ধ করে রেখে এসেছি তা শবরীর প্রতীক্ষায় আজও দিন গুনছে। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের পূর্তবিভাগ ওই শূন্যপদটি পূরণে আগ্রহী নন। সরকারি এঞ্জিনিয়াররাও নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন : চাকরি করব, খাব ভাত, ব্যয়সঙ্কোচ কী উৎপাত!

একটা অভিজ্ঞতার বর্ণনা করি। একটি ব্যর্থতার কনফেশান।

আশি সালের বন্যায় ওড়িশার বিভিন্ন জেলায়—কটক, পুরী, কালাহান্ডি, কোরাপুট, ঢেনকানাল, ফুলবনী সম্বলপুরে না-হোক ত্রিশ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করার পূর্বে এন. বি. ও. কে বললেন, পরিকল্পনাটা একবার দেখে দিতে। ওড়িশা সরকারের চিফ-সেক্রেটারির তারবার্তা পেয়ে উড়লুম ভুবনেশ্বর-মুখো। এয়ারপোর্ট-এ হাজির ছিল একটা লঝ্ঝরে জিপ। ঝকর-ঝকর করতে করতে পৌঁছে দিল ডাক-বাঙলোয়। এখানে আলাপ হল স্থপতিবিদ আশিস গঞ্জু এবং জার্মান যুবক হের রুডি গ্রোভস্-এর সঙ্গে। প্রথমজন এসেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে, দ্বিতীয়জন একজন অর্থনীতিবিদ, এসেছেন একটি জার্মান সমাজসেবী সংস্থার তরফে, অর্থসাহায্য-মানসে। মুখহাত ধুয়েই ছুটতে হল। ভুবনেশ্বর সচিবালায়ের কনফারেন্সকক্ষে সমবেত হয়েছেন বিভিন্ন বিভাগের না-হোক জনা-বিশেক অফিসার। চিফ সেক্রেটারি স্বয়ং অধিবেশনের সভাপতি। প্রাদেশিক পূর্তবিভাগ ইতিপূর্বেই খান-পাঁচেক স্ট্যান্ডার্ড গাঁয়ের বাড়ির নক্শা ছকে রেখেছেন—ছোট থেকে বড়, যাদের মূল্য দুই থেকে চার হাজার টাকা। ইটের বাড়ি, টিনের ছাদ। আমার সেগুলি আদৌ পছন্দ হল না—মাপে বড়ই ছোট, আর কেমন যেন শহর-শহর বদ্‌বু! মতামত দিতে সঙ্কোচ হল। গঞ্জু কিন্তু আমার কানে কানে বলল গন্ধটা তার নাকেও লেগেছে। মধ্যাহ্নে ওয়ার্ক-লাঞ্চ্। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাগুলি তখনও স্বচক্ষে দেখিনি, তাই ওড়িয়া পাচকের তন্দুরি-চিকেন অমৃতের স্বাদ এনে দিল মুখে। দুঃখ এটুকুই—মিঠে খিলি পানটি মুখে দেবার পর (নিষ্পান ওড়িয়া লাঞ্চ্ যে নিষ্প্রাণ এটা সুধীজন মাত্রেই জানেন) একটি মার্জার-নিদ্রা দেবার সুযোগ হল না। পানের পিক্ ফেলতে না ফেলতেই ডাক এল আফটার-নুন সেশনের। এই ফাঁকে এটা ছোট্ট কথা বলে নিই। স্যুটেড-বুটেড আমরা সবাই বুফে-লাঞ্চ্ সেরেছি ফর্কের সাহায্যে। একমাত্র ব্যতিক্রম ওই গাঁইয়া গ্রোভস্। তাকে ওয়াশ-বেসিন খুঁজতে হল। গাড়োলটার ধারণা ভারতীয়রা নাকি হাত দিয়ে খায়! ভারতের গাঁয়ে-গঞ্জে সমাজসেবা করতে আসার আগে তাই সে হাতুড়ি খাওয়া অভ্যাস করেছে।

লাভটা কিন্তু তারই হল ষোল-আনা। টেংরি চোষার বিমল আনন্দ!

আমি, গঞ্জু আর গ্রোভস্ বললুম, নকশা অনুমোদনের আগে বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামগুলি দেখে এলে ভালো হয়। তৎক্ষণাৎ জিপের ব্যবস্থা হল। ঝকর-ঝকর জিপ নয় এবার।

ঝড়ের বেগে দেখে এলুম বন্যাপীড়িত গ্রামগুলি। পলিমাটির আস্তরণ বিছিয়ে বানের জল ইতিমধ্য সরে গেছে, কিন্তু গৃহহীনরা আজও গাছতলায় অথবা তাঁবুতে। হাজার হাজার নিত্যন্ত গাঁয়ের মানুষ—উদাম পা, নেংটি সার, প্রত্যাশা কাঁপছে ওদের চোখের পাতায়।

সাতদিন দিবারাত্র পরিশ্রম করে খাড়া করা গেল একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট। সাঁইত্রিশটি ব্লক থেকে রাতারাতি সংগ্রহ করা হল আঞ্চলিক মালমশলার বাজার দর। ওড়িশার এক-এক অঞ্চলে গাঁয়ের বাড়ির এক-এক রূপ। দেওয়াল নানা জাতের কাদার, কাঁচা ইটের, বাঁশ-পাতার, পাথরের। ছাদও হরেক রকম—নুড়িয়া-খাপরা-রানিগঞ্জ টালির, খেজুর ও গোল পাতা, অথবা খড়।

আমরা স্থির করলুম কোনও স্ট্যান্ডার্ড-ড্রইং আদৌ বানানো হবে না। বাড়ি কত বড় হবে, কী মালমশলার গাঁথা হবে তা স্থির করবে ওই গ্রামবাসীরাই। থাকবে একটিমাত্র ধ্রুবক : বাড়ির মূল্য। সেটা, তিন হাজার টাকা।

এটা সহজবোধ্য যে, মালমশলা যত উন্নতমানের হবে তিনহাজার টাকার বাড়ির মাপ ততই হবে ছোট। দেওয়াল ও ছাদের প্রকারভেদে আমি আর গঞ্জু রাত জেগে একটা জবর পার্মুটেশন-কম্বিনেশনের অঙ্ক কষে ফেললুম। করোগেটেড টিন বা অ্যাসবেস্টসের প্রশ্নই ওঠে না তিন হাজার টাকার ন্যূনতম বাড়িতে—কারণ তাহলে সেটা বাড়ি হবে না, হবে গুমটিঘর। আমাদের হিসাবে সবচেয়ে উচ্চমানের বাড়িটাতে ছিল ল্যাটারাইট পাথরের দেওয়াল ও রানিগঞ্জ টালির ছাদ। সে বাড়ির মেঝের (প্লিন্থের নয়) ক্ষেত্রফল 200 বর্গফুট। সবচেয়ে নিচুমানের বাড়িটি ছিল কাদার গাঁথনি আর অগ্নিনিরোধক (এটি এন. বি. ও-র একটি নয়া আবিষ্কার) খড়ের। তার মেঝের ক্ষেত্রফল 270 বর্গফুট। প্রথমোক্ত মিছরি এবং দ্বিতীয়োক্ত মুড়ির এক দর : তিন হাজার টাকা!

মোটকথা, আমরা তিনটি মৌল নির্দেশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এক : স্ট্যান্ডার্ড প্ল্যান বলে কিছু থাকবে না। গৃহস্বামী নিজেই স্থির করবে বাড়ির আকার, আয়তন ও মালমশলা। দুই : কোনো ঠিকাদার নিযুক্ত করা চলবে না। গাঁয়ের মানুষ যৌথভাবে নিজেদের বাড়ি নিজেরাই বানাবে ও মজুরি পাবে। তিন : মালমশলা সরবরাহের জন্য কোনও সাপ্লায়ার নিযুক্ত করা চলবে না। বাড়ির হবু-মালিক-মাল্‌কাইন নিজেরাই স্থানীয় বাজার যাচাই করে মালপত্র কিনবে। সরকার মালের দাম দেবেন, যদি মাল ও মজুরি সমেত ওই তিন হাজার টাকার ঊর্ধ্ব-সীমা অতিক্রান্ত না হয়।

সপ্তাহান্তে আবার হল একটা কনফারেন্স। পূর্বরাত্রে সাইক্লোস্টাইল করা রিপোর্ট সবাইকে বিতরণ করা হয়েছে। আবহাওয়া অফিস যদিও পূর্ব-ঘোষণা করেননি তবু ভুবনেশ্বরের সেই কনফারেন্স কক্ষে সেদিন বয়ে গেল একটা সাইক্লোন! একাধিক বিক্ষুব্ধ বক্তার বক্তব্য সংক্ষেপে করলে দাঁড়ায় : লিয়াজঁ অফিসার ইস্টার্ন জোন-এর দপ্তরটা কলকাতা থেকে রাঁচিতে স্থানান্তরিত করা হোক!

এ কী পাগলের প্রলাপ মশাই! দু-কোটি টাকার প্রজেক্ট, অথচ কোনও নক্‌শা নেই! পারচেজ-অফিসার নেই? সাপ্লায়ার নেই! মায়, ঠিকাদার নেই!! এ কি মাম্‌দোবাজি!

গঞ্জু ব্যাট করতে নামেনি! জরুরি কাজ থাকায় পূর্বরাত্রে প্লেন ধরে ফিরে গেছে দিল্লির প্যাভেলিয়ানে। সমবেত 'বডি লাইন বোলিং'-এ হের গ্রোভস ছিল আমার টেন্‌থ্‌-উইকেট পার্টনার! সে ডিফেন্সে ব্যাট করতে শুরু করল। বোঝাবার চেষ্টা করল, এ পরিকল্পনা আদৌ অভূতপূর্ব নয়। পৃথিবীর অন্যত্র গাঁয়ের মানুষ এভাবে নিজেদের বাড়ি নিজেরাই বানিয়েছে। বিনা ঠিকাদারে বিনা সাপ্লায়ারে। পর পর দুটি বাউন্ডারি হাঁকড়ালো সে। এক নম্বর : দক্ষিণ আমেরিকার বোগোতাতে আলবার্তো জিমেনেজ ঠিক এভাবেই একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন। দু-নম্বর মেক্সিকো-সিটিতে স্থপতিবিদ সিনেরো আর্তিজ একইভাবে গ্রাম্যবাস্তু বানিয়েছেন। দুটোই নাকি কয়েক মিলিয়ান ডলারের স্কিম। দুটোই বিনা-ঠিকাদারে সুসম্পন্ন।

পূর্তবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার বললেন, বিদেশের কথা জানি না; উড়িষ্যার দেড়শ বছরের পি. ডাবলু, ডি-র ইতিহাসে এমন কাণ্ড কখনো হয়নি। এরা নিরক্ষর, নিতান্ত গাঁওয়ার! বাড়ি বানানো তো ছার, বাড়ির প্ল্যানই বানাতে পারবে না।

চিফ সেক্রেটারি আমার দিকে ফিরে বলেন, এ-বিষয়ে আপনি কী বলেন?

লাস্ট-ম্যান্ডেটারি ওভার! চোখ-কান বুজে ওভার-দ্য-বৌলার হাঁকড়ালুম আমি : স্যার! জবাব দেবার আগে আমি একটি প্রতিপ্রশ্ন করতে চাই। আপনারাই বলেছেন--ত্রিশহাজার গেঁয়ো-মানুষ গৃহহীন হয়েছে; তার মানে না হোক ছয় হাজার কুঁড়ে ঘর বন্যায় ভেসে গেছে। আমাকে দয়া করে প্রথমে জানানো হক— ওই ছয় হাজার গাঁয়ের বাড়ি কোন্‌ আর্কিটেক্ট ডিজাইন করেছিলেন; কোন্‌ ড্রাফটস্‌ম্যান সেগুলির প্ল্যান এঁকেছিলেন এবং কোন্‌ ক্লাস-ওয়ান ঠিকাদার সেই ছয় হাজার কুঁড়ে ঘর বানিয়েছিলেন।

ঘরে আল্‌পিন-পতন নিস্তব্ধতা।

সুযোগ বুঝে আবার বলি, স্যার! বিনা সরকারি অর্থসাহায্যে ওরা একবার যা পেরেছিল, সরকারি অর্থসাহায্য পেলে তা দ্বিতীয়বার পারবে না?

এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল। কে একজন ঘোষণা করলেন, লাঞ্চ্‌ ব্রেকের সময় হয়েছে!

মাসখানেক পরের কথা। দ্বিতীয়বার যেতে হল ভুবনেশ্বরে। কাজ তদারকি নয়, বিল পাশ করা নয়, অ্যাসেম্‌ব্লি-কোশ্চেনের জবাবদিহির দায় নেই—আমার কাজ শুধু মাতব্বরী করা আর ছড়ি ঘোরানো! আহা! কী আরামের চাকরিটাই না ছিল! আমার কাজ--এক নজর দেখে এসে দিল্লিতে এক রামপট রিপোর্ট পাঠানো।

গতবার মনটা চঞ্চল ছিল, তাই লক্ষ্য করিনি। এবার প্লেনের জানলা দিয়ে দেখলুম ভাগীরথী বরাবর উড়ে চলেছি, 'ওড়িয়া'দের দেশে। পার হল ডায়মন্ডহারবার, রূপনারায়ণের মোহনা, হলদি নদী, তারপর সাগরদ্বীপ। যেন অবন ঠাকুর গেরুয়া রঙে ৺মা গঙ্গাকে আঁকছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ তুলিটা ধুয়ে কোবাল্ট-ব্লুর বাড়িতে ডুবিয়ে নিলেন।

বঙ্গোপসাগর।

ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্টে সেই লঝ্ঝরে জিপটা না পাত্তা। ইতিউতি চাইছি, হঠাৎ এক স্যুটেড-বুটেড পাঞ্জাবি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, গুড-মর্নিং স্যার! কাইন্ডলি এদিকে আসুন।

দেখি একটা ঝক্ঝকে টয়োটার দরজা খুলে উর্দিধারী ড্রাইভার অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে। নিজেই উনি আত্মপরিচয় দিলেন! খুবই নামকরা ঠিকাদার। দু-কোটি টাকার কাজটা উনিই পেয়েছেন। কাজ নাকি পুরোদমে চলছে। বাইশটা লরি খাটছে। অ্যাস্বেস্টস, টিন, সিমন্টে সবই স্টক করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য পারচেজ অফিসারের তীক্ষ্ণদৃষ্টির তত্ত্বাবধানে। বললেন, সবই আপনাকে দেখাবো। তার আগে, অমুক হোটেলে এট্টু....

ভুবনেশ্বরে সেটাই খানদানিতম হোটেল।

বললুম, আমাকে দয়া করে বাস-স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিন। আমি কোনার্ক যাব।

—কোনারক! কেঁও? খয়ের, ইয়ে গাড়ি তো খাড়ি হ্যায়! 'বস্'-মে কেঁও।

কেমন করে ওঁকে বোঝাই—ওই আরামদায়ক গাড়িতে গেলে আমি প্রণিধান করতে পারব না। এই গাঁওয়ার 'ওড়িশাবাসী'—যারা আজ নিজেদের বাড়ি নিজেরা বানাতে পারে না—এককালে কী গড়েছিল!

আর একটি ব্যর্থতার বেদনা ব্যক্ত করা যাক :

সেবার গেছিলাম গঞ্জাম-বহরমপুর থেকে কুড়ি কিলোমিটার অভ্যন্তরে এক বিজন বনে। দীর্ঘ পাহাড়ের সানুদেশে একটি ছোট্ট জনপদ—'গ্রাম-বিকাশ'। খানদশেক পাকাবাড়ি। কয়েকজন কেরলবাসী সমাজসেবী সমবেত হয়েছেন। ওই পাহাড়ের মাথায় আছে খোন্দ্ আদিবাসীদের গাঁ। তাদের সেবা করার জন্য।

গ্রাম-বিকাশে আউট-ডোর ডিস্পেন্সরি আছে। আছে একটা ব্যাঙ্ক। তার আশিভাগ অ্যাকাউন্ট-হোল্ডার হচ্ছে নিরক্ষর খোন্দ্। প্রত্যেকের পাশবইতে সাঁটা আছে পাস্পোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ। সেটাই তাদের সনাক্তকরণ স্বাক্ষর। ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার বললেন, কৃষিঋণের কিস্তি শোধ করার ব্যাপারে ওঁর ব্যাঙ্ক নাকি আঞ্চলিক রেকর্ড করেছে।

গ্রাম-বিকাশে ঘরে ঘরে বিজলিবাতি জ্বলে, উনুন জ্বলে না! রান্না হয় গ্যাসে। না, ইলেকট্রিক কেব্ল্ তাহলে ওই গ্রাম-বিকাশকে স্পর্শ করেনি। এ সবও গ্রাম্য ঢঙে। ওমা ভগবতীর কৃপায় চীনা মডেলের প্রকাণ্ড একটা গোবরগ্যাস প্ল্যান্ট বসিয়েছেন ওঁরা। যতই দেখছি মোহিত হচ্ছি!

মূল-গায়েন-এর নাম জো ম্যাডিয়াথ্। বছর ত্রিশেক বয়স। একগাল কুচকুটে দাড়িটাই আগে নজরে পড়ে, দরাজ দিলটার সন্ধান পাওয়া যায় ঘনিষ্ঠ হলে। কেরালার ক্রিশ্চিয়ান। তার লাবণ্যময়ী সহধর্মিণীর নামটা স্মরণে আসছে না। নিতান্ত নেমকহারামি। কারণ, নানান স্বাদু ব্যঞ্জনে মিশ্রিত তাঁর লবণ তিনদিন ধরে খেয়েছিলুম। আমাকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল একটা গ্রামের নকশা ছকে দিতে।

জো বললে, খোন্দ্ আদিবাসীদের গ্রামটা সে পত্তন করতে চায় গ্রামবিকাশের সংলগ্ন ভূখণ্ডে। সমতলে। চল্লিশ ঘর আদিবাসীর একটা নয়া বসতি।

আমি বলি, কী দরকার ওদের সমতলে নামিয়ে আনার? প্রাগার্য সংস্কৃতির যেটুকু ছিটে-ফোঁটা ওরা আজও আঁকড়ে ধরে আছে সেটুকুতে নাই বা হাত দিলেন?

জো বলে, হেতুটা ওদের মুখ থেকেই শুনবেন। কাল সকালে গাঁওবুড়ো আসবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমি দোভাষীর কাজ করব।

আমি বলি, না। মহম্মদই যাবে পর্বতের কাছে। ওদের গাঁ-টা দেখে আসতে চাই।

সেই মতো ব্যবস্থা হল। পরদিন ভোর-ভোর রওনা দেওয়া গেল।

প্রথম ঘণ্টা-দুই আঁকা-বাঁকা পাথুরে পথ জিপে পাড়ি দেওয়া গেল। তারপর পদব্রজে খাড়া চড়াই। আন্দাজ হাজার ফুট। পায়েচলা বনপথ। দু-পাশে নানান জাতের ঝোপেঝাড়ে ফুল ফুটেছে। এত বেলাতেও গাছের পাতায় শিশিরবিন্দু; ঘন বনের ছায়ায় রোদের ছোঁওয়া পায়নি বলে। হরেক রকম প্রজাপতি উড়ছে। মাঝে কতকগুলি পরিত্যক্ত ঝোপড়ি নজরে পড়ল—কী জানি কেন বাসিন্দারা কোথায় চলে গেছে।

খোন্দ্-গাঁয়ে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন মাথার উপর সূর্য। গ্রামটা—যদি গ্রামই বলা যায় তাকে—ভারি অদ্ভুত। দু'খানি মাত্র বাড়ি। মুখোমুখি। মাঝখানে হাত-বিশেক চওড়া নিকানো উঠান। সেখানে বাচ্চারা খেলা করে, পুরুষেরা কাজ বেরুলে সেটা মেয়ে-মহল। এক-একটা বাড়ি প্রায় তিনশ ফুট লম্বা! তাতে পাশাপাশি খুপরি, এক-এক পরিবারের। যৌথ শস্যাগার, যৌথ গো-শালা, যৌথ জীবনযাত্রা। পুরুষেরা নেংটিসার, মেয়েদের হাঁটুতক আচ্ছাদন। বুকে কাপড়—জানি না, সেটা আমাদের আগমনজনিত কারণে কি না।

যেন সুগ্রীব-মিলনের স্টেজ সেটিং। বেনাঘাসে-বোনা দুটি ছোট চারপাই পেতে সসম্মানে বসতে দিল আমাদের। নিজেরা রইল চক্রাকারে ঘিরে। গাঁও-বুড়ো আর কিছু মাতব্বর উবু হয়ে বসেছে যুক্তকর-মুদ্রায়। জোয়ানেরা তীর-ধনুক অথবা টাঙি কাঁধে পিছনে দাঁড়িয়ে। মেয়েরা রইল ইতি-উতি, কৌতূহলী ডাগর চোখ মেলে।

নানান গল্পগাছা হল দোভাষীর মাধ্যমে। অপরিচয়ের জড়তাটা কেটে যাবার পর আসল প্রশ্নটা পেশ করি : কী কারণে ওরা লোকসঙ্গীতটাকে উচ্চগ্রাম থেকে খাদে নামাতে চায়। বহু ধস্তাধস্তির পর, যে তথ্যটা উদ্ধার করা গেল তার সংক্ষিপ্তসার এই রকম :

পাহাড়ের মাথায় অনেক খোন্দ্ গাঁয়েই চাষবাস হয়। কন্টুর বাঁধ দিয়ে বর্ষার জলধারাকে ওরা রুখতে শিখেছে। কিন্তু অনেক গাঁ আছে যেখানে মাটি নেই : শুধুই পাথর। তারা কাঠুরিয়া বৃত্তিতে দিন গুজরান করে। যেমন এই গ্রামটি। ওরা জঙ্গলের বড় বড় গাছ কেটে নামায়, ছোট-ছোট টুকরো করে। সাজায়। তারপরে বয়ে নিয়ে যায় সমতল ভূখণ্ডে—ওই যেখানে টিপ্‌বাতি জ্বলে, হুস্ হুস্ হাওয়া গাড়ি ছোটে; জ্বালানি কাঠের আড়তদার মালটা খরিদ করে। ওরা কিনে আনে লবণ, দেশলাই, কোরোসিন, কাপড়—নওজোয়ান হলে প্রিয়জনের জন্য লুকিয়ে পুঁতির মালা,, কাঁকুই কিংবা হাত-আয়না।

'এক-মরদের বোঝা'- পিছু জ্বালানি কাঠের দর তিন টাকা। 'এক মরদের-বোঝা' যে কতটা সেটা বোঝা ভা—রি শক্ত। আড়ৎদারের মালবাবু সেটা দাঁড়িপাল্লায় সমজিয়ে নেয়। ওজনে কম হলে পয়সা কাটে। বোঝার ভুলটা তখন হয় ভুলের বোঝা। ওজনে বেশি কখনও হয় না।

আমি আবার অঙ্কে কিছু কাঁচা। বাধা দিয়ে দোভাষীকে বলি তা কেন? এরা আন্দাজে মালটা বহে নিয়ে পাহাড় থেকে নামছে। সেটা ঐ তিনটাকা দরের যে ওজনের 'ইউনিট তার কম যদি হতে পারে তবে বেশিও হতে পারে।

গাঁওবুড়ো আমার কথা শুনে হেসেই বাঁচে না। শুধু গাঁওবুড়ো নয়, সবাই। একজন মরদ যে মালটা বহে নিয়ে যেতে পেরেছে, তা কখনও 'এক-মরদের বোঝার' বেশি হতে পারে?

তা বটে। ঈশ্বর যেমন সর্বশক্তিধর হওয়া তাঁর সৃষ্ট জগতের বাইরে যেতে পারেন না, একটি মানুষের বোঝাও তেমনি সর্বশক্তি হওয়া সত্ত্বেও তিন টাকার সীমা অতিক্রম করতে পারে না।

অঙ্কটা কিন্তু শেষ হয়নি এখনও। এরপর জটিল ভগ্নাংশের সিঁড়ি ভাঙা আঁক।

যে লোকটা ওজন করে দেয় তাকে দিতে হয় দু'আনা দস্তুরি। রইল বাকি দু টাকা চৌদ্দআনা। তার থেকে নগদ একটি টাকা দক্ষিণা দিতে হয় ফরেস্ট গার্ডকে। সেটা ন্যায়ত ধর্মত তার প্রাপ্য। বাপ-পিতেমোর আমল থেকে এ ব্যবস্থা চালু আছে। তাহলে বাকি রইল কত? এক টাকা চৌদ্দ আনা। সেটা কিন্তু দুদিনের মজুরি। একদিন গাছ কাটা, একদিন বয়ে নিয়ে যাওয়া। তার অর্থ সংসার পিছু একজন উপার্জনক্ষম হলে গড়ে পাঁচজনেরর পরিবারের দৈনিক আয়— মাসে ত্রিশদিন খাটলে—পনোরো আনা। মাথা পিছু দৈনিক তিন আনা। এটা আশি সালের হিসাব।

দিব্যি চলে যাচ্ছিল তাতেই। স্বচ্ছন্দে না হলেও সানন্দে।

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত। সদাশয় সরকার ঘোষণা করলেন—এ অরণ্যে গাছকাটা এখন থেকে বারণ। এটা অতঃপর রিজার্ভ ফরেস্ট।

আমি অবাক হয়ে বলি সে কি। এটা এতদিন রিজার্ভ ফরেস্ট ছিল না? তাহলে চৌকিদার এতদিন ঘুষ খেত কোন সুবাদে? অসংরক্ষিত অরণ্যে তো যে ইচ্ছা গাছ কাটাতে পারে।

দোভাষী অনুবাদ করে জবাবটা শোনালো: ঘুষ নয়, ওটা দস্তুরি! নিয়ম।

'ঘুণ ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয়ঃ'-র মতো।

জানতে চাইলুম এ নিয়ে গ্রাম বিকাশ কোনও আন্দোলন করেনি?

জবাবে জো যা জানালো তা লা-জবাব।

গাঁওবুড়োর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও 'গ্রাম বিকাশ' প্রতিবাদ করেছিল। তদবির তদারকিতে কিছু হয়নি। চৌকিদার ধমক খায়, ওয়ার্নিং খায়—ফলে গ্রামে ফিরে এসে ধমক দেয়, ওয়ার্নিং দেয় আদিবাসীদের। শেষমেশ জো দরবার করল একেবারে উচ্চতম মহলে। এবার কাজ হল। চৌকিদারের চৌর্যবৃত্তি হাতে নাতে ধরতে এবার এল একজন পুলিস।

যার ফলে 'দস্তুরি'-র রেট হল দ্বিগুণ—দুটাকা।

হবেই। এখন তো দুজন চৌকিদার!

দুর্ভাগ্য আমার। ওদের গ্রামটা আমি পত্তন করে আসতে পারিনি। তার আগেই আমাকে অবসর নিতে হল। আর গত দু-বছর তো লিয়াজঁ' অফিসার ঘরটা তালাবন্ধ।

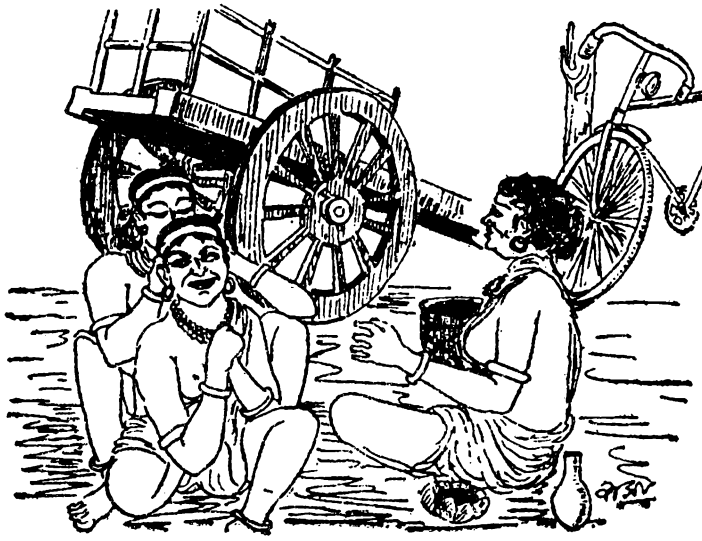

বিশ বছর পর সাম্প্রতিক দণ্ডকারণ্য সফরে আদিবাসীদের খুব ঘনিষ্ঠদের দেখবার সুযোগ আমি পাইনি। আমার সরকারি কাজ ছিল উদবাস্তু কলোনীতে। তবু আদিবাসীদের পরিবর্তনটা নজরে পড়ল। পথে-ঘাটে। চলতি গাড়ির জানলা থেকে। পুরুষেরা আজকাল সাইকেল চাপে, টর্চ হাতে পথ চলে এমন কি কেউ বা ট্রানজিস্টার বগলে। মেয়েদের পরিবর্তনের কথা তো আগেই বলেছি।

পুরনো দিনের সহকর্মীদের কেউ কেউ আজও চাকরি করছেন। তাঁরা বললেন, গভীরতর অরণ্যে আরণ্যক জীবন নাকি আজও অব্যাহত। বাইসন-হেডেড মাড়িয়া কিংবা বোন্ডোরা অপরিবর্তিত। 'মুরিয়া-ঘটুল'-এর প্রচলন আছে কি না জানা মুশকিল। সে সরমের কথা ওরা আজকাল আর স্বীকার করতে চায় না। ওটা যে 'সরমের'এটা সভ্য জগতের আমরা ওদের এতদিনে সমঝাতে পেরেছি।

উদবাস্তু কলোনীতে অবশ্য অনেক চেনা লোককে দেখতে পেলুম। ছিনাথ মালাকার চশমা নিয়েছেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন গৃহ-সংলগ্ন কিচেন গার্ডেন। চমৎকার মর্তমান কলা ফলেছে। কাঁদিটা যখন দেখালেন তখন আমার নজরে পড়ছিল এক সার ভুট্টার দানা—ওঁর হাসির ফাঁকে। উনি দন্তকবনে পানের বরজ পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছেন। বললেন পুলাও-কালিয়া নাই জুটুক, প্যাটে অন্ন পড়লিই টুক পান খাওনের বাসনা জাগে, না কি কন?

আমি কইলাম, হক কতা কইছেন!

রত্নাকর ঘোষকে শেষবার যখন দেখি তখন উনি ষাটের কোঠায়। রীতিমতো হাড়-পাঁজরা সর্বস্ব। আশ্চর্য। এখন আশির কোঠায় তিনি যেন যৌবন ফিরে পেয়েছেন। যতদূর মনে পড়ে সে আমলে তিনি হাটবারে ক্ষৌরি করতেন। এবার দেখে **এলুম একবুক** সাদা দাড়ি। তাঁর খুশিটা কিন্তু সাদা নয়, পাকা ধানের মতো সোনালি।

যেসব এলাকার উদবাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠেছে তার ধারে কাছে আদিবাসী গ্রামগুলি অব্যতিক্রম বন্ধু ভাবাপন্ন। গত বিশবছরে কোথাও কোন সংঘর্ষ হয়েছে বলে শুনলাম না। আদিবাসীদের উৎসবগুলি—আমি বিশেষ করে নারানপুর-কোঙাগাঁও অঞ্চলের মুরিয়াদের কথা বলছি—মনে হয় কমে গেছে; চৈত দাণ্ডার, পৌষ-কুলাঙ, কুরুংতুল্লা। অথচ উদ্‌বাস্তু উপনিবেশে—নাঃ। 'বকুলতলা-বল্মীক' আমলের ঐ শব্দটা আজ আর ব্যবহার করব না—'নয়াবসত গাঁয়ে যেসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়—বারোয়ারি পূজা অষ্টপ্রহর দোলমঞ্চ, দেওয়ালী তাতে ওরা দলে দলে যোগ দেয়। ওরা নাকি আজকাল রঙ-দোলের হৈ-হুল্লোড়েও আবির মাখে।

তাহলে একটা আদিম সংস্কৃতি হারিয়ে গেল, হারিয়ে যাচ্ছে বলে হ-হুতাশ করি কেন? আমাদের কলকাতাতেও তো পাল্কির বদলে আসছে পাতাল রেল, ৺মায়ের পূজার পরিবর্তে ৺ মাইক পূজা, আজাদীর লড়াইয়ের স্থলে ভোটযুদ্ধ আর 'সহজপাঠ'-এর ধোপা-নাপিত বন্ধ করে রবীনবুত্তোর 'সহজতর-পাঠ'। পরিবর্তনই তো 'জগত'-এর নিয়ম। 'গম' ধাতুকে Keep করতে পারলেই টিকে থাকবে। ফসকালেই ফসিল। জীব থেকে জীবাশ্ম।

নয়াবসতের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের উপকারও হয়েছে প্রচুর। বিশ বছর আগেও ওদের দেখেছিলাম বিনিময়ের যুগে। হাটে এসে এক বস্তা ধানের বদলে নিয়ে যেত এক সের লবণ; একটা হরিণের চামড়ার বদলে এক বান্ডিল মোমবাতি। আজ ওরা টাকা-নয়াপয়সা চিনেছে। হাটে এসে দরাদরি করে মাল বেচে, মাল কেনে।

সে আমলে বাঘ-সাপের চেয়েও বেশি ভয় পেত পুলিসকে। নয়াবসত মানুষেরাই সেই জুজুর ভয় ভাঙিয়েছে। 'পড়ু' চাষ ছাড়া ওরা কৃষিকার্য জানত না। অর্থাৎ লাঙল দেওয়া, মই দেওয়া, ধান রোয়া, নিড়ানো কিছুই জানত না। প্রাক-মহেন-জো দাড়ীয় কায়দায় অকর্ষিত কুমারী ভূমিতে ছড়িয়ে দিত বীজ, তারপর সবুজ স্বপ্নে সোনালি রঙ ধরলে পাকা ধান ঘরে তুলত। এখন নয়াবসত ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে স্যাঙাতি পাতিয়ে ওরা অনেক কিছু শিখেছে—মায় সুফলা, নাইট্রেট সার, তাইচুং শব্দগুলিও ঠাঁই পেয়েছে মাড়িয়া-মুরিয়া শবরদের মৌখিক অভিযানে।

তাহলে কেন বলছি, এবার ঐ দণ্ডকবন থেকে কুড়িয়ে আনলুম একটা 'রেফ' চিহ্ন।

হয়তো 'রেফ'-এর ঐ কাঁটাটা বনে ছিল না; ছিল মনে। আমারই মনের গভীরে। হেতুটা হয়তো নিতান্ত নস্ট্যালজিক; ধাতুটা আত্মনেপদী—যে কারণে ললেওলিন তাঁর উপন্যাসের নামকরণ করেছিলেন : হাউ গ্রীণ ওয়াজ মাই ভ্যালী!

কে. এন শিকদারের কথাটাই বা ভুলি কী করে?

একেবারে ফেরার দিনের কথা। কোণ্ডাগাঁও ডাকবাঙলোয় প্রাতরাশ সেরে আমি তৈরি। স্টেশান ওয়াগানে মালপত্র তোলা হচ্ছে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে রায়পুরে ডাউন বম্বে-মেল ধরব। সে পথে পড়বে বোরগাঁও, কাঁকের আর সেই বনরানি ডাক বাঙলোটি—কেশকলঘাটে। অনেক পুরনো আমলের সহকর্মী বিদায় জানাতে এসেছেন। এমন কি সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনিয়ার দেবরাজন। যে ছিল বিশবছর আমার আগে অধীনে সদ্যপাশ অ্যাসিস্টেন্ট এঞ্জিনিয়ার। বারান্দায় বসে সবার সঙ্গে গল্পগাছা করছি, হঠাৎ একটা জিপ এসে দাঁড়ালো। নেমে এলেন বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক। টেরিলিনের প্যান্ট আর বুশসার্ট, হাতে ডিজিটাল মার্কিনী হাতঘড়ি। এবং একটি সন্দেশের প্যাকেট। যুক্তকরে আমাকে নমস্কার করে ইংরেজিতে বললেন, দশমিনিট দেরি হলে হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হত না, স্যার।

বিশ বছরের নীরন্ধ্র যবনিকাটা সরাতে পারলুম না। না! একে আমি কখনও দেখিনি। নামটা শুনেও যখন চিনতে পারছি না, তখন অতি সলজ্জ উনি বললেন, তখন স্যার, আমার নাম ছিল 'কিচিংগো'।

আমি বজ্রাহত।

বিস্মৃতির পর্দাটা পাতলা হয়ে আসছে। একটু একটু করে সব কথা মনে পড়ছে।

নেংটিসার, উদাম-গা কাঁধে মাকসু (টাঙি) গলায় পুতির মালা। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান বিশ বছরের এক নওজোয়ান। মুরিয়র গোণ্ড। ওর বাপ আয়েতু শিরদার ছিল কুলি গ্যাঙ-এর সর্দার। ছেলেও বাপের সঙ্গে মাটি কোপাতো। ছোকরা ভারি বুদ্ধিমান। আমার আর্দালি পিয়ন নন্দু থাপাকে ধরে এক দুই তিন এবং এ-বি-সি-ডি শিখল। দারুণ উৎসাহ তার। বড় কন্যা বুলবুলের বাতিল বইয়ের সাহয্যে একে ধরে, ওকে ধরে সাক্ষর হয়ে উঠল। বাপ আয়েতু অসুস্থ হলে তাকেই করে দিয়েছিলুম কুলি-সর্দার। যখন শুনলাম দিনভর মেহনতি করে ও নৈশ-স্কুলে পড়ে মোটামুটি লিখতে পড়তে শিখেছে তখন ওকে ওয়ার্ক-সরকার করে দিয়েছিলুম। ছেলে ওয়ার্ক সরকার হয়েছে—তাকে আর কোদাল ধরতে হবে না, কলম ধরতে হবে শুনে ওর নেংটিসার বাপ আয়েতু আর কি যেন নাম উদাম গা মা এসেছিল কৃতজ্ঞতা জানাতে। দস্তুরী বলেন দস্তুরী, ঘুষ বলেন, তাই সই—ওদের কৃতজ্ঞতা জলে-চিক-চিক পিচুটি পড়া চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুরগিটা প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। ছেলের চাকরি হয়েছে। ওরা হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

এ বিশ বছরে কিচিংগো ম্যাট্রিক পাশ করেছে। আদিবাদীদের অগ্রাধিকার আছে। আমার প্রস্থানের পর সে হয়েছিল লোয়ার-ডিভিশন ক্লার্ক। সম্প্রতি প্রমোশন পেয়েছে আপার ডিভিশনে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলি তুমি কে. এন শিকদার হলে কেমন করে হে?

সলজ্জে বলে এফিডেবিট করে নামটা পাল্টেছি স্যার।

—বিয়ে-থা করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুটি সন্তান। বড়টি রায়পুর হস্টেলে থেকে পড়ে।

—তা মিষ্টির প্যাকেট আনতে গেলে কেন আবার?

—সময় থাকলে আপনাকে আমার কোয়ার্টাসে নিমন্ত্রণ করতাম। এ প্যাকেটটা নিয়ে যান স্যার, ট্রেনে খাবেন রাত্রে।

ওর শ্রদ্ধার্ঘ্যটাও হাত বাড়িয়ে নিতে হল।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রওনা দিলুম। দেবরাজন আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যাবে। তার গাড়ি অপেক্ষা করছে বোরগাঁয়ে। সেখানে সে নেমে যাবে।

গাড়ি ছাড়ার পর দেবরাজনকে বলি, একটা ছোট্ট চারাগাছ পুঁতে গেছিলাম। বিশবছরের তাতে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে।

দেবরাজন ম্লান হাসল।

—কী ব্যাপার? তুমি আমার খুশিতে খুশি হওনি মনে হচ্ছে?

বললে, অপ্রিয় সত্যভাষণ নাকি শাস্ত্রে বারণ, তবু আপনার কাছে কথাটা গোপন করব না। শিকদার একটি উদবাস্তু মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করেছে।

—সো হোয়াট? সে তো আনন্দে কথা।

—না। সেটা আপত্তিকর নয়। কিন্তু ও পুরোপুরি ভদ্দরলোক হয়ে গেছে। নিজের সমাজের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখে না। নামটা পর্যন্ত পাল্টেছে। ওর বাপ আয়েতু বস্তুত অনাহারেই মারা যায়। বাপ-মাকে ও কোনোদিন একটা পয়সাও পাঠায়নি। ওর বুড়ি মা আজও বেঁচে আছে সেই গোণ্ড গাঁয়ে। আপনি ওকে লেখাপড়া না শেখালে, চাকরি না দিলে ও হয়তো আজও মাটি কোপাতো কিন্তু ওর বাপ-মা....

কথাটা শেষ হয় না। আমাদের গাড়িটা এসে দাঁড়ালো দেবরাজনের গাড়ির পিছনে। এবার সে নেমে যাবে। তার গাড়ির ড্রাইভার পুরনো আমলের লোক। ছুটে এসে প্রণাম করল আমাকে। বললে, নমস্তে সাব। মাইজী কেসিন হ্যাঁয়? খোঁকি দিদি...

খোঁকিদিদির খোঁকি অন্তরা যে বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্রী সেকথা ওকে বোঝানো মুশকিল। সন্দেশের একটা প্যাকেট ছিল হাতের কাছেই। ওর হাতে দিয়ে বলি ছেলেমেয়েদের খেতে দিও।

আয়েতুর দেওয়া উপহারটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমারই নির্দেশে নন্দু থাপা মুরগিটাকে বিশ বছর আগে জবাই করেছিল। পাপটা আমারই। আজ কনফেশন করছি!

মাত্র মাস ছয়েক আগেকার কথা। কলকাতায় আমার বাড়িতে একদিন টেলিফোন বাজল। আত্মপরিচয় দিতে ও প্রান্তবাসী বললেন, আমি পান্নালাল দাশগুপ্ত বলছি--

আমি শশব্যস্ত বলি বলুন দাদা?

—সে অনেক কথা। টেলিফোনে হবে না। সময় নিয়ে কোথাও বসতে হবে।

পরদিনই ওঁর 'কম্পাস' কাগজের অফিসে গিয়ে দেখা করলুম। শুনলুম, উনি দণ্ডকারণ্যের মালকানগিরি অঞ্চলে 'কয়া' আদিবাসীদের নিয়ে গ্রামোন্নয়নের কাজ করছেন। সেখানে নয়াবসত পল্লীও গড়ে উঠছে। বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হল। তারপর উনি বললেন, আমার ইচ্ছা তুমি আমার অতিথি হিসাবে আর একবার দণ্ডকারণ্য চল। 'কয়া'দের নিয়ে কিছু লেখো।

আমি তো একপায়ে খাড়া। যেন পরদিনই এক বান্ডিল কাগজ আর স্কেচখাতা বগলে দন্ডকবনের উদ্দেশে তৃতীয়বার পাড়ি জমাবো। সেই 'পরদিন'টা এই ছয় মাসেও আসেনি। উপায় কী? অনেকগুলি রাবণিক সোপানের প্ল্যান-ডিজাইন নিয়ে আমি যে নাজেহাল। রোদ্যাঁ ঘাড় থেকে নেমেছেন, লেঅনার্দো স্কন্ধাসীন। ওদিকে অন্তরার মার্কিন মুলুক ভ্রমণের আমন্ত্রণটাও প্রায় তামাদি হবার যোগাড়। এদিকে বয়সও বাড়ছে গুড়গুড় করে। জানি না, পান্নালালদার নেমন্তন্নটা কোনোদিন রাখতে পারব কি না।

তাই বা কেন? উনি যদি এই বয়সে পারেন—হালে হেতেড়ে তাহলে তাঁর অনুজ হিসাবে আমি পারব না শুধুমাত্র—কাগজে কলমে?

আপনারা আশীর্বাদ করুন ষাটের দশকের ত্রুটি আজ যেন আশির দশকে সংশোধন করছি, তেমনি যেন নব্বই-এর দশকে দেশ'-এর পাতায় ফিরে এসে স্বীকার করতে পারি—আশির দশকে 'রেফ্'গ্রহণটাই ভুল হয়েছিল আমার। 'শর্বরী' নয় কথাটা 'শবরী'ই।

হে করুণাময়! আমার সংশোধনের সুযোগ আমাকে দিও। বলতে দিও : আশির দশকে আমার স্মরণে ছিল না 'নিষ্প্রভাত শর্বরী হয় না'!

আজও তিনি এসে উপনীত হননি, ডিফরেস্টশনের বুলডোজার-দৈত্যকুল তাই আজও দণ্ডকবনের আশ্রমে সব কিছু তছনছ করছে। কিন্তু ঋষিবাক্য তো মিথ্যা হতে পারে না। 'গোডো' আসবেন নিশ্চয় আসবেন।

দন্ডকশবরীর আশ্রমে পদধূলি দেবেন নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র।

ভ্রমণে 'ভিসার'-র ভূমিকা

ঃ ভয়ঙ্করী

অবশ্য লক্ষ্মণের খড়ির-গণ্ডির ঐ নিরাপত্তার বাইরে পা বাড়াবার দুর্মতি যদি আদৌ আপনার জেগে থাকে। নচেৎ নয়। গণ্ডির চৌহদ্দিটাও কিছু দম্-আটকানো নয়; কাশ্মীর-টু-কন্যাকুমারিকা কাথিওয়াবাড়-টু-কামাক্ষা। এই চেনা চৌহদ্দির নিশ্চিন্দিপুর গ্রামখানার চিহ্নিত সীমানার মধ্যেই যদি ঘুরে বেড়ান তাহলে 'ভিসা'-এর বিভীষিকাকে 'টু-হুটস দেবার অধিকার আপনার অনস্বীকার্য; কিন্তু 'নাল্পে সুখমস্তির' ভূত যদি একবার আপনার ঘাড়ে চেপে বসে? খড়ির গণ্ডি-দেওয়া এই নিশ্চিন্দিপুরের বাইরে ঠ্যাঙখানা একবার বাড়িয়ে দেন? তখন আর আপনি ঘরের নন, পথের। পথের পাঁচালীর একটি চঞ্চল চরণ। নিয়তি তখন আপনার নিয়ামক। আপনি আর তখন স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করছেন না; ভিসাই তখন আপনার ভাগ্যনিয়ন্তা। সীতার জীবনে যেমন লঙ্কাধিপতি, সর্বজয়ার জীবনে যেমন নিয়তি।

বিদেশভ্রমণে ভিসা-র ভূমিকাটা কেমন জানেন? গোবেচারির জীবনে জীবনসঙ্গিনী মতো। মাথা মুড়ানোর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আপনি খড়ির গন্ডি সেফ্-ওয়াটারে। মাথাটা যদি কোনোদিনই না মুড়োন তাহলে ডুবজলে নাকাল হতে হবে না খর্পরধারিণীর খপ্পর কোনোদিনই পড়তে হবে না। স্বপাক আহার এবং স্বেচ্ছাবিহার (উভয়ার্থে)করে স্বহস্তে জামার বোতাম এবং সগর্জন আহারান্তের ঘুম লাগিয়ে কনফার্মড ব্যাচিলার রূপে ইহলোক যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারেন। এমন কি দু-কুড়ি সাতের খেলা সাঙ্গ করে চার জোয়ানের কাঁধে চেপে ড্যাংডেঙিয়ে ইহলোকান্তের দেশভ্রমণ যাত্রা করতে পারেন। কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু গলায় গোড়ে-মালা কপালে চন্দনের টিপ, মাথায় সোলার 'ফুল্স্ ক্যাপ' আর হাতে-মাকু সাজে যদি ছাঁদনাতলায় এসে দাঁড়াবার বেয়াড়া সখটা একবার চাগাড় দেয়? ব্যস। আর দেখতে হবে না। টোপরের টোপটা গেলার সঙ্গে সঙ্গে গলায় একটা হ্যাঁচকা টান। স্বেচ্ছা-বিহারের অধিকার কর্পূর। সেই কালরাত্রিতে যাঁর খাতিরে 'ভ্যা' করেছিলেন সেই ভ্যাকরণীই বৈতরণী-তক আপনার কর্ণধারিণী।

ভিসাও ঠিক অমনটি। নিশ্চিন্দিপুরের বাইরে ঠ্যাঙটি বাড়িয়েছেন কি বাড়াননি—ব্যস! আর স্বেচ্ছাভ্রমণের অধিকারী নন আপনি। পাসপোর্ট-ভিসাই তখন ত্বয়া হৃষিকেশঃ! যেপথে আপনাকে চালাবেন সেপথেই আপনাকে চলতে হবে। পেত্যায় হল না? বেশ শুনুন আমার কিস্সাঃ

অ্যাদ্দিন আমিও ঘোরাঘুরি করেছি এই চেনা চৌহদ্দির এ প্রান্তে থেকে ও প্রান্ত। দুটি কারণে। এক পকেটের প্রতিবন্ধকতা দুই সরকারি চাকরিতে ছুটির অপ্রতুলতা। লেকিন খোদা যব দেতা তব ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা। দুটি বাধাই অপসৃত হল একসাথে।

সহকর্মী বন্ধুরা জানালো চাকরি থেকে অবসর নেবার প্রাকমুহূর্তে একলপ্তে অনেক টাকা হাতে আসে, ছ'মাসের মাইনে, রিটায়ারিং গ্র্যাচুইটি, কম্যুটেড পেনশন এবং প্রভিডেন্ড ফান্ড। অবসর নেবার পর নাকি ছুটির বাধাটাও আর থাকে না। হবেও বা! কী আনন্দ!

বড় মেয়ে বুলবুল আছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে। সানফ্রান্সিস্কোয়। 1975 সাল থেকে। অর্থাৎ তার বিয়ে-ইস্তক। বছর-পাঁচেক আগে নাতনি শ্রীমতী অন্তরার আগমনী গান মনের কানে শুনে বুলবুলের মা কেমন যেন আনমনা হয়ে উঠেছিলেন। তখনও কমলী অর্থাৎ সরকারি চাকরি আমাকে ছাড়েনি। চাকরিরূপ গঞ্জিকার নেশায় আমি তখনো বুঁদ হয়ে সরকারি কাজের জন্য সিমেন্ট স্টিলের আঁক কষছি। উনি পাসপোর্ট ভিসা করালেন, টিকিট মিকিট কাটলেন আমারই নন্দীভৃঙ্গির সাহায্যে স্যুটকেস গুছোলেন—আমি টের পেলুম না। বলছি না আমার অজ্ঞাতসারে সব কিছু হয়েছে কিন্তু এদিকে সরকারি কাজের চাপ, ওদিকে রোদ্যাঁ অথবা অ্যাটম বোমা কী নিয়ে মেতেছিলুম ঠিক মনে নেই, মোটকথা—আমার মাথার ঠিক ছিল না। গাঁজার নেশায় হুঁ-হাঁ করে কখন সে সম্মতি দিয়েছি তা টেরও পাইনি। মায় কৈলাশ ত্যাগের পূর্বে বুলবুলের মা যখন ধ্বনিবাক্য শুনিয়ে ফেলেন 'সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য' তখনও আমার হুঁস হয়নি যে, মিসেসের কোটেশানটা মিসকোট।

তারই শোধ তুলেছি গতবছর 1984-তে। চুটিয়ে।

গুণিজন মাত্রেই জানেন, ঘোড়া যেমন শেষ লেংথে নিজের জান সম্বন্ধে সচেতন হয় সরকারি চাকুরে সেভাবে চাকরির শেষাশেষি আখেরের কথা ভাবতে বসেন। তারই ফলশ্রুতিতে সবাই এক-একটা নতুন পার্সোনাল ফাইল খোলেন। কেউ বলেন, 'রিটায়ারমেন্ট-ফাইল'কেউ বলেন, 'পেনশেন-ফাইল'। মহাজনপন্থার সেই ট্রাডিশন মেনে আমিও একটা ফাইল খুলে তার নামকরণ করলুম : G.J.K.F.অর্থাৎ কি না—গো জন্ম খালাসের ফাইল। 'লাইফলেস ফাইল' এর কারাগার থেকে 'ফাইললেস লাইফ'-এর মুক্ত আবহাওয়ায় উত্তরণের ছাড়পত্র। ঐ সঙ্গে আমি দ্বিতীয় আর একটি পার্সোনাল ফাইলও খুলেছিলুম রিটায়ারমেন্টের বছর-দুই বাকি থাকতে : Q. F. A.; অর্থাৎ Quest For the Antipodes.

ক্যালিফোর্নিয়া কলকাতার প্রায় একশ আশি ডিগ্রি ফারাকে। পুবমুখোই যাও অথবা পশ্চিমমুখো। এখানে আমি যেদিকটাকে বলি 'জেনিথ', অন্তরার কাছে সেদিকটা 'নাদির'। ফলে ক্যালিফোর্নিয়াবাসীরা আমাদের কাছে antipodes— শিরপাদেশের বাসিন্দা। স্থির করেছিলুম অবসর পাওয়া মাত্র সে দেশে রওনা দেব। যাব ইউরোপ হয়ে। সেসব দেশের নানান তথ্য সংগ্রহ করে ফাইলে সাজিয়ে রাখি। বিভিন্ন শহরের ম্যাপ, হরেক সংগ্রহশালার প্ল্যান, ক্যাটালগ আর টুকরো খবর। অবসরগ্রহণের ব্রাহ্মমুহূর্তটি সুচিহ্নিত : এপ্রিল, উনিশ শ বিরাশি। স্থির করেছি—মে জুন নাগাদ রওনা দেব, যাতে জাঁকিয়ে শীত পড়ার আগেই ফিরে আসতে পারি। চুরাশিতে লস্ এঞ্জেলেসে অলিম্পিক। ভিড়-ভাড়াক্কার আগেই ঘুরে আসতে হবে।

ভারতের বাইরে এর আগে বার দুয়েক গেছি। একবার সত্তর সালে, জাপানে।

টোকিওর রেঙ্কোজি-মন্দির ছাইদানের ভস্মটাকে যাচাই করতে। ঐ সঙ্গে সেবার ওসাকাতে এক্সপো, ব্যাঙ্কক হংকং, তাইপে ইত্যাদিও সারা গেছে। দ্বিতীয়বার—বছর দুই পরে, ইউরোপ। কিন্তু দুবারই পকেট তথা ছুটির অপ্রতুলতায় সংক্ষেপে সারতে হয়েছে। এবার তা নয়। পৃথ্বী যদি বিপুলা, এবার তাহলে কালও নিরবধি। নিদেন—যাবৎ পটলোত্তলন।

ভুলটা ভাঙলো হো-চি-মিঙ সরণীতে, চৌদ্দই জুন 1984 তারিখে। অবসর নিয়েছি যথারীতি সেই বিরাশি সালেই। কিন্তু সদাশয় সরকার বাহাদুরের লালফিতার বাঁধন খুলে আমার পাওনা-গণ্ডা হাতে পেতে কেটে গেল দু-দুটি বছর। আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু ওর আগে লালফিতার বাঁধন নাকি খোলা যায় না। যাত্রার দিন জুলাইয়ের নয় তারিখ। টিকিট কেটেছি, পাসপোর্ট হয়ে গেছে বহুকাল, ইউরোপের যে কটি দেশে যাব তার ভিসাও একে একে পেয়েছি। বাকি শুধু ইতালি আর আমেরিকা। সেদিন এসেছি আমেরিকান কন্‌সুলেটে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে জনা পঞ্চাশ ভিসার্থী। হিসাব করে দেখি গড়ে ঘন্টায় দশজন করে মুক্তি পাচ্ছে। বেলা বারোটা নাগাদ আমার ডাক পড়ল। পর্দা সরিয়ে ভিতরে যেতেই দেখি, বুলেট প্রুফ মোটা কাচের ওপ্রান্তে বসে আছেন মার্কিন কনসাল বা তাঁর প্রতিভু। আমার অর্ধেক বয়স। নিগ্রো। আমি তাঁকে সুপ্রভাত জানাই। উনি আমার কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখছিলেন; তাই হয়তো খেয়াল করলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বললেন, সরি মিস্টার সানিয়াল, আপনাকে ভিসা দেওয়া যাবে না।

আমি নিতান্ত ঘাবড়ে যাই। বলি কেন? আমার অপরাধ?

—আন্ডার সেকশান 214 (b) অব দ্য ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশানালিটি অ্যাক্ট।

বললুম মার্কিন আইনের ধারাগুলি তো আমার মুখস্ত নেই, একটু যদি বুঝিয়ে বলেন...

ভদ্রলোক কন্‌সুলেটের সীলসমন্বিত একটি ছাপানো চিঠির নিচে সই দিয়ে কাচের জানালার নিচেকার স্লিটে গলিয়ে দেন।

তৎক্ষণাৎ মাইক্রোফোনে হাঁকলেন : নেক্সট।

নেপথ্যে আমার পরবর্তী ভিসা-প্রার্থীর নাম ঘোষিত হল এবং সে ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ আমার পিছনে এসে দাঁড়ালেন পর্দা সরিয়ে। ইতিমধ্যে আমি পত্রটির পাঠোদ্ধার করেছি। ঐ ধারায় বলা হয়েছে : 'ভিসার প্রার্থী' ইউনাইটেড স্টেটস-এর বাহিরে অবস্থিত এমন কোনো বাসস্থান দেখাতে পারছে না যেখানে সে ফিরে আসতে পারবে।'

তাই পরবর্তীর পথরোধ করে বলি, এর মানে কী? ভবানীপুর চক্রবেড়েতে আমার নিজস্ব বাড়ি আছে, সেখানে আমার স্ত্রী-পুত্র কন্যা আছে। আমি তো সেই বাড়িতেই ফিরে আসব। সব ফেলে আমি আপনাদের দেশে থেকে যাব একথা ভাবছেন কেন?

—আপনি আপনার পেশা হিসাবে লিখেছেন 'অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসর'। অর্থাৎ বর্তমানে আপনি বেকার। আপনি ফিরে সে আসবেনই তার গ্যারান্টি কোথায়? স্ত্রী পুত্র কন্যাদের আপনি একে একে আমেরিকায় পাচার করতে পারেন।

আমি বলি আমি আদৌ বেকার নই। আমি একটি টেকনিক্যাল কমিটিতে সরকার নির্বাচিত সভ্য, পশ্চিমবঙ্গে সর্ববৃহৎ হাউসিং কোয়াপারেটিভ সোসাইটির সরকার নিয়োজিত অন্যতম বোর্ড মেম্বার। একটি ক্লেম-কেস-এ হাইকোর্ট নিয়োজিত আর্বিট্রেটর.....

—কই কাগজপত্র দেখান।

দেখালাম। ভবি ভুলল না। কাগজপত্র দেখে নিদান হাঁকলেন এর কয়েকটি থেকে আপনি রিজাইন দিতে পারেন, কয়েকটির কাজ আমেরিকায় বসেই চালাতে পারেন। ঠেকাচ্ছে কে?

—কিন্তু আমি যে লেখক; বাংলাভাষায় বই-টই লিখি...

—বই তো আপনি বিদেশে বসেও লিখতে পারেন, ঠেকাচ্ছে কে? তাছাড়া দেখছি—শেষ দুখানি বই আপনি লিখেছেন ইংরাজি ভাষায়। ফলে আপনি ওদেশে গিয়ে সহজেই ইংরেজিতে সুইচ-ওভার করতে পারেন।

এই প্রথম আমার সন্দেহ হল ভদ্রলোক কোনো একটি বিশেষ কারণে আমাকে বাধা দিচ্ছেন। যে যুক্তিটা উনি দেখালেন তা যে নিতান্তই অযৌক্তিক তা আমার চেয়ে উনি বেশি জানেন। ইংরেজি সাহিত্যের বাজারে 'সহজেই' ঠাঁই করে নেওয়া। প্রায় আধঘন্টা ক্রমাগত তর্ক করে গেলাম। উনি প্রতি যুক্তিরই বিরুদ্ধ যুক্তি দাখিল করলেন। ব্যাপারটা যেন দু পক্ষের জেদা-জেদিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি বিরুদ্ধযুক্তি দাখিল করেই উনি যোগ করছেন 'প্লিজ অ্যালাও দ্য নেক্সট ম্যান টু কাম ফরোয়ার্ড।'

আর সেই অচেনা নেক্সট-ম্যানটিকেও বলিহারি। সে বোধহয় যৌবনে ফরোয়ার্ড লাইনে ফুটবল খেলত। ডাইনে বাঁয়ে ঝুল দিয়ে আমার পাশ কাটিয়ে গোলপোস্টের কাছে হাজির হবার প্রচেষ্টায় ক্রমাগত আমার দু-বগলে কাতুকুতু দেবার ভঙ্গিতে হাত চালাচ্ছে। এক ধমকে তাকে থামিয়ে ঘুরে নিগ্রো অফিসারটাকে বলি, লুক হিয়ার মিস্টার! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অজন্তা বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এবং আমি তা গ্রহণ করেছি। হয়তো এতদিনে নিমন্ত্রণ পত্রও বিলি হয়ে গেছে। নিশ্চয় স্বীকার করবেন তাঁদের বেইজ্জত করার 'ওনাস্-অব-রেসপন্সিবিলিটি' আপনার; আমার নয়। ফলে আপনি কি অনুগ্রহ করে সেইসব মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলিকে জানিয়ে দেবেন যে তাঁদের আমন্ত্রিত বক্তা-অতিথিকে মার্কিন কন্‌সুলেট অবাঞ্ছিত অতিথি বলে চিহ্নিত করায় বক্তৃতাগুলো বাতিল হচ্ছে।

এই প্রথম ওঁকে একটু বিচলিত হতে দেখলাম। ইতস্তত করে বললেন, কোথায় আপনার বক্তৃতা দেবার কথা?

আমি ফাইল থেকে খুলে চিঠিগুলো একে একে কাচের ফোকর দিয়ে গলিয়ে দিতে থাকি। লস এঞ্জেলেস্ কাউন্টি মিউজিয়াম অব আর্ট-এর কিউরেটর ডক্টর প্রতাপাদিত্য পালের চিঠি, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান সংস্কৃতির ডিরেক্টর ডঃ শার্পিওর আমন্ত্রণপত্র, সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার বেঙ্গলি অ্যাসোশিয়েশন অথবা নিউ-ইয়র্কের টেগোর সোসাইটির লেটার হেডে লেখা চিঠিগুলি।

এবার কাজ হল। দৈববাণী শুনতে পাই : অলরাইট। আমি ওয়ান এন্ট্রি ভিসা দিচ্ছি।

আমি তাতেই খুশি। একবারই যেতে চাস মার্কিন মুলুকে। কীভাবে লেঙ্গি মারা হল তখন বুঝিনি। যখন বুঝতে পারলুম তখন আর কিছু করার নেই। বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হল নায়াগ্রা এবং মেক্সিকো। এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার সম্ভাবনাও। নায়াগ্রা ভালো করে দেখতে হলে ওপারে যেতে হয়— সেটা কানাডায়। একবার সেখানে পদার্পণ করলে আমার তুণের একাঘ্নি বাণটি অকেজো হয়ে যায়। মেক্সিকোও তাই। এজন্যই বলছিলুম ভ্রমণে ভিসার ভূমিকা ভয়াবহ। আমেরিকান কনসুলেটের অসৌজন্যতার শিকার হয়ে নায়াগ্রা দেখতে পেলুম না, এ আপসোস আমার যাবে না কোনোদিন।

নায়াগ্রার চেয়েও করুণ ইতিহাস কোপেনহেগেন-এর সেই মেয়েটির। সেই গল্পই এবার বলি শুনুন :

আমার এই একষট্টি বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ জীবনে কবে-কাকে-কখন-কী বলেছি তার সব কথা কি মনে আছে? মনে থাকাটা সম্ভবপরও নয়। তবে এটুকু বলতে পারি—যদি কোন বঙ্গললনার লাজে-রাঙা কর্ণমূলে কখনও বলে থাকি 'তুমিই আমার জীবনে প্রথম প্রেম', তবে হে ঈশ্বর তুমি, এবং তিনি, দুজনেই যেন আমাকে মার্জনা করেন। অকুণ্ঠভাবে আজ স্বীকার করি : আমার জীবনে প্রথম প্রেম একটি বিদেশিনী—জনৈকা ড্যানিশসুন্দরী।

মনের কথা তাকে খুলে বলা হয়নি। ড্যানিশ ভাষা জানি না বলেই শুধু নয়, এতাবৎকাল তার দেখা পাইনি বলে। তার কথা শুধু কানে শুনেছি—রাধার মতো। অথবা তার তস্‌বির দেখেছি, সেই চঞ্চলকুমারীর মতো। মনের কষ্টিপাথরে বিশেষ কোনো মুহূর্তের বিশেষ অঙ্কপাত অম্লান থাকে সারাজীবন। দশকের পর দশকে সময়ের প্রবাহে বিস্মৃতির প্লাবন সেই ক্ষণিক আঁচড়ের দাগটাকে মুছে ফেলতে পারে না। কেমন জানেন? কলোরেডোর কালস্রোতে গ্র্যানাইট পিলারের মতো।

তার কথা প্রথমে শুনেছিলুম এ শতাব্দীর বিশ-এর দশকে। তখন আমার বয়স চার কি পাঁচ। ওই যে আপনারা বলেন, 'প্রথম দর্শনেই প্রেম', আমারও সেই দশা। দর্শন নয়, শ্রবণ। রাধার মতো, অথবা রাজসিংহের নায়িকার মতো।

সেদিনের কথাটা স্পষ্ট মনে আছে। এ জীবনের বিশ-বাইশ হাজার দিনের মধ্যে একটি বর্ষণক্লান্ত দিন। কৃষ্ণনগরে আমাদের সাবেক লালবাড়িতে। ওই যেখানে ডি. এল. রায় রোডটা এসে মিশেছে আর. এন. টেগোর রোডে ওইখানেই ছিল আমাদের সাবেক 'লালবাড়ি'! ছিল নয়, আছে; তবে তার লালিমাটুকু লুপ্ত হয়েছে একসার দোকানঘর গজিয়ে ওঠায়। সে আমলে ওই দোকানঘরগুলোর সামনে ছিল তিনতলা উঁচু একটা শিশুগাছ। এত কথা বলছি বোঝাতে যে, সে প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা। আপনারা তখন আমারই মতো হাফপ্যান্ট পরে লাট্টু ঘোরাতেন অথবা বেড়া বিনুনী বেঁধে ফ্রক পরে এক্কা-দোক্কা খেলতেন; আর তোমাদের বাপু তখন জন্মই হয়নি।

ঝুপঝুপ বৃষ্টি লেগে আছে সারাদিন। বামুনদি খবর পাঠিয়েছে রান্নাঘর থেকে—খিচুড়িটা নামতে এট্টু দেরি আছে। মা মেজদিকে ডেকে বললেন, দেখিস্ খোকন যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। মেজদি সেজবাতির আলোটা উস্‌কে দিয়ে আমাকে কোলে টেনে নিল; বললে, 'শোন, একটা গপ্পো বলি।'

আশ্চর্য গল্পটা। খোকনের ঘুম ছুটে গেল। একহাতে সে চেপে ধরেছে তার মেজদির আঁচল, আর হাতে হান অ্যান্ডারসনের একখানা হাত—খোকন ভেসে চলেছে কল্পলোকে! পাল-তোলা নৌকায়। গল্পটা শেষ হলে সে জানতে চায়, 'হ্যাঁরে মেজদি, এটা গপ্পো না সত্যি!'

—জলজ্যান্ত সত্যি রে! এই দ্যাখ তার ফটো।

বাবার আলমারি থেকে একটা মোটা বই পেড়ে দেখিয়ে দিল।

তাই তো! প্রকাণ্ড একখানা পাথরের উপর বসে আছে মেয়েটি! কিশোরী, ওই মেজদির বয়সী। একমাথা ভিজে চুল, ডানহাতে দেহভার রেখেছে। বাঁ-হাতটা কোলের উপর। আর—আহা রে! বেচারির পা নেই। লেজ!

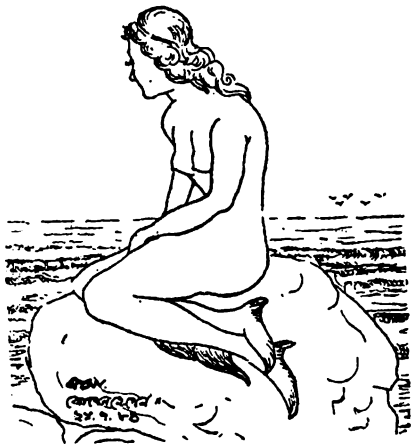

বিশ্বাস হল। না হয়ে যাবে কোথায়? ছবি নয়, ফটো। মনগড়া—কুমড়োপটাশ, ট্যাশগরু, হাতিমির ছবি তুমি আঁকতে পার, কিন্তু ফটো? হুঁ হুঁ, বাবা! ক্যামেরার কাছে চালাকিটি চলবে না। অন্তত অন্তরার বয়সে আমার ধারণাটা ছিল ওই রকম।

কোনোমতে কান্না চেপে জানতে চাই, কোথায় থাকে রে ও?

—কোপেনহেগেন। ডেনমার্ক। সে অনেক-অনেক দূরে।

—রানাঘাটের চেয়েও? শ্যালদার মতো?

—না রে! তার থিকেও দূরে!

তাতে কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল আবার। 'শ্যালদা' পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে এমন একটা বিশ্বাস ছিল। তাই সেজদা রোজ অফিস-ফের্তা বাড়ি আসে না। আসে সপ্তাহান্তে, শনিবার। সেজদা কলকাতার বউবাজারে থাকে কিনা। কলকাতা যেতে হলে রেল-লাইনের এক্কেরে শেষ ইস্টিশানে নামতে হয়। তার নাম শ্যালদা। সেই শ্যালদার 'থিকে'ও দূরে আর কিছু থাকতে পারে নাকি?

এরপর অনেক ঘুম-না-আসা রাতে ওই মৎস্যকন্যা—লিট্‌ল মারমেড—আমাকে হাতিছানি দিয়ে ডাকত। আমি কখনও দাঁড়িয়ে থাকতুম ভিজে বালির উপর, কখনও পালতোলা নৌকায়, কখনও বা জাহাজের ডেক-এ। আবার মাঝে মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়ে পড়তুম ফেনিল সমুদ্রতরঙ্গে। তর্‌তর্ করে দুজনে সাঁতার কাটতুম সাগরের

তলায়—প্রবালরাজ্যে। সেখানে আমাকে একটা ঝিনুক-পালঙ্কে শুইয়ে লিট্‌ল মারমেড আমাকে গান শোনাতো। গান তো নয়, যেন কান্না। টপ্ টপ্ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ত আর তৎক্ষণাৎ কান্না হয়ে যেত পান্না। সেই পান্নার মালা অমি ওর গলায় দিতুম।

বয়স বাড়ল। বুঝতে শিখলুম—শুধু পা নয়, ওর পরনে কাপড়ও নেই! আহা রে, ওকে কেউ পুজোয় একখানা শাড়িও দেয় না কেন? কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে পারি না! তখন যে অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি। বুঝেছি—বন্ধুদের কাছে স্বীকার করা নিতান্ত মূর্খামি যে, ওই নীলনয়না কিশোরীটিকে আমি ভালোবাসি। সে বড় লজ্জার কথা। জানতে পারলে সঙ্গীসাথীরা ধমকে উঠবে : 'নারাণটা কী ক্যাবলা রে! মৎস্যকন্যার সঙ্গে প্রেম কচ্ছে।'

সুতরাং ওই 'প্রথম প্রেম'-এর কথাটা বরাবর গোপন ছিল।

স্কুল-লাইব্রেরিতে গ্লোবটা দেখে প্রথম মালুম হল—লিটল মারমেড কী প্রকাণ্ড দূরত্বে থাকে। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতার দূরত্ব পেনসিলের ডগাটুকুর চেয়েও কম, আর ডেনমার্ক কত দূরে।

কৈশোরে থাকতুম বৌবাজার অঞ্চলে। ঘুম-না-আসা রাতে গঙ্গার দিক থেকে ভেসে আসত জাহাজের ভোঁ। বিদেশ যাওয়া মানে জাহাজে—এটাই ধারণা ছিল তখন। তাই মনে হত— কে জানে, ঐ জাহাজটা হয়তো ডেনমার্কে যাবে; সেই যেখানে সমুদ্রের ধারে নিঃসঙ্গ পাথরের উপর দিগন্তে দৃষ্টি মেলে বসে আছে সেই আশ্চর্য কিশোরী : আমার প্রথম প্রেম।

ডেনমার্ক যাবার সুযোগ প্রথম এল 1972-এ। আমি তখন পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। কিন্তু নিতান্ত ঘটনাচক্রে চারচক্ষুর মিলন হল না। সেবার ইউরোপ পরিক্রমা করেছিলুম একটি ট্যুরিস্ট-সংস্থার লাক্সারি বাস-এ। কলকাতা থেকে রোম; সেখান থেকে বাসে চেপে অস্ট্রিয়া-জার্মানি-বেলজিয়াম-ডেনমার্ক-ফ্রান্স-ইংলন্ড। তাই নিশ্চিন্ত ছিলুম অ্যাদ্দিনে শুভদৃষ্টিটা হবে। বিধি বাম। ইটালি থেকে লাক্সারি বাসটা রওনা হবার পর কর্তৃপক্ষ জানালেন, অনিবার্য কারণবশত ডেনমার্কটা বাদ দিতে হচ্ছে। আমি বোমার মতো ফেটে পড়বার উপক্রম করি; কিন্তু তাও হল না। সহযাত্রীরা আমাকে ফেটে পড়তে দিলেন না। কারণ ট্রাভল্-এজেন্ট ঐ সঙ্গে এক নিশ্বাসে ঘোষণা করেছে—ডেনমার্কের পরিপূরক হিসাবে সুইজারল্যান্ডর কয়েকটি শহরে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন লজ্জায় বলি, আমি আল্‌পস্ দেখতে চাই না, আমি মৎস্যকন্যার কাছে যাব!

তাহলে বাসভর্তি যাত্রী ভাববে—আমার মাথার গণ্ডগোল।

তারপর আরো বারো বছর কেটে গেছে। এবার এই 1984-তে ডেনমার্ক যাবই—এমন একটা প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি। ঘটনাচক্রে জবর সঙ্গী জুটে গেল। ফকির কুণ্ডু। কুণ্ডু স্পেশালের ফকির কুণ্ডুই এককালে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের গাড়িতে ভারত-ভ্রমণে। তাঁরই কল্যাণে অজন্তা-গুহা প্রথম দেখি এবং একখানা বই লিখে ফেলি। ইতিমধ্যে বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে। আমি ইউরোপ হয়ে আমেরিকা যাচ্ছি শুনে ফকির বলে, আম্মো যাব!

ও অনেকবার গেছে যাত্রীদের নিয়ে। ইউরোপ এবং আমেরিকা। তালেবর ব্যক্তি। টুরিজম্ গুলে খেয়েছে। ঘাঁৎ-ঘোঁৎ ওর কণ্ঠস্থ। পাশপোর্ট ভিসা, ফরেন-এক্সচেঞ্জ, টিকিট রিজার্ভেশন, হোটেল-মোটেল মায় ককটেল। ওর স্বার্থ একটাই। বললে, নারায়ণবাবু, বেশ কয়েকবার গেছি ইউরোপ আমেরিকা—কিন্তু ডানে-বাঁয়ে তাকাবার ফুরসৎ পাইনি। সেসব ছিল বিজনেস্-ট্রিপ। এবার চুটিয়ে দেশটা দেখব। ভালো গাইড পাওয়া ভাগ্যের কথা। শুনুন—ব্যবস্থাপনার দায়ঝক্কি সব আমার। শুধু গাইডগিরির ভূমিকাটুকু আপনার।

আহা! কী আনন্দ! হোটেল খোঁজা, টিকিটের জন্য লাইন দেওয়া, রিজার্ভেশান কাউন্টারের কিউ-এ শামিল হওয়া—সব—সব করবে ঐ ফকির; আর ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে তোফাসে মজা লুটবে এই আমীর! এর চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত আর কী হতে পারে? ঐ গাইডগিরি? সে তো আরামের চাকরি। ফকির যদি কাজে ফাঁকি দেয় আমি ক্যাঁক্ করে ওর টুঁটি টিপে ধরব! আমিরি চালে কৈফিয়ৎ তলব করব : হোটেল মে গরম পানি ক্যেঁউ নেহি মিলা? ট্রেন মে লোয়ার-বার্থ ক্যেঁউ নহী মিলা? পান্‌সে চুনা ক্যেঁউ নহী গিরা? আই মিন, ক্যেঁউ গিরা? ক্যেঁউ-ক্যেঁউ-ক্যেঁউ?

ফকির কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হবে। অপর-পক্ষে গাইডগিরি করার সময় আমার যদি বিদ্যেয় না কুলায়—মোনালিজাকে প্র্যাক্সিটেলিস্-এর পেন্টিং আর ভেনাস-ডি- মিলোকে লেঅনার্দোর ভাস্কর্য বলে চালাতে চাই—তাহলে ফকির সে ভেল্কি ধরতে পারবে? ক্যাঁক করে চেপে ধরতে পারবে আমার টুঁটি?

স্থির হল আমরা প্রথম যাব লন্ডন। সেখান থেকে পারী। এর পর পনেরো দিনের EURAIL টিকিটে যথেচ্ছ ভ্রমণ। ইউরেল বোঝেন তো? আগেকার দিনে যেমন ট্রামের অল-ডে-টিকিট ছিল। অর্থাৎ পনেরো দিনের জন্য যে কোনো ট্রেনে সারা ইউরোপ অবারিতদ্বার : এরপরে যাও যেথায় খুশি, জ্বালিও না ক' মোরে।

আমি বলি, যেথায় খুশি যেতে পার, কিন্তু কোপেনহেগেন যেতেই হবে।

ফকির একটু অবাক হয়। আমার যে ছবি-মূর্তির বাতিক আছে সে খবর ওর জানা। ও তাই ভাবছে—লুভ্য নয়, রিৎজ্‌মুখ নয়, সিস্‌তিন চ্যাপেল নয়, হঠাৎ কোপেনহেগেন কেন?

বলে, বেশ তো। যাব। কোপেনহেগেন যাব।

কলকাতা থেকে দুজন রওনা হয়েছিলুম জুলাই মাসের নয় তারিখে। লন্ডন থেকে পারী। সেখানে ল্যুভ এবং রোদ্যাঁর সংগ্রহশালা তো বটেই, আরও অনেক কিছু। সেসব গল্প পরে সুযোগ মতো শোনাব। আজ শোনাতে বসেছি : ভ্রমণে ভিসার ভূমিকা।

এরপর আমস্টার্ডাম। রিৎজ্‌মুখ ম্যুজিয়ামে রেম্‌ব্রান্ট-সংগ্রহ। সেখানে দিন দুই থেকে কোপেনহেগেন-মুখো ট্রেনটা ছাড়ল উনিশে জুলাই রাত আটটায়। কোপেনহেগেন একটি দ্বীপময় শহর। তার চারিদিকেই বাল্টিক সী। ফলে ওখানে যেতে হলে কিছুটা সাগর পাড়ি দিতে হবেই। সেজন্য অবশ্য আমাদের ট্রেন থেকে নামতে হল না—যেমন নামতে হয়েছিল ডোভার থেকে ক্যালে যেতে। পরিবর্তে গোটা

ট্রেনটাই জাহাজের গেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেল। কখন যে তিমি মাছে হাতি গিল্‌ল সেটা টেরই পায়নি। সেটা মাঝ রাতে, আমাদের অগোচরে। শেষ রাতে ঘুমের ঘোরে কারা যেন 'পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি'। তারা টিকিট চাইল; আধা ঘুমে হিপ্‌ পকেট থেকে পাশপোর্ট-ভিসা টিকিট-মিকিট বার করে দিলুম। ওঁরা কী সব ছাপ-টাপ মারলেন। থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু!

ঘুম যখন ভাঙল তখন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ট্রেনটা ডেনমার্ক রাজ্যে হু-হু করে ছুটছে। কোপেনহেগেন পৌঁছলুম বিশ তারিখ সকালে। মালপত্র নিয়ে আমি যথাচুক্তি ওয়েটিং-রুমে ঢুকে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে আমীরি চালে সিগ্রেট ফুঁকতে শুরু করি; আর শ্রীমান ফকির ট্যাঙস্‌-ট্যাঙস্‌ করে হোটেল খুঁজতে বার হল।

ছবির মতো শহর। দেখবার জিনিসের কি আর শেষ আছে? স্টেশানের গায়ে হেলান দিয়ে টিভলি পার্ক। একবার ঢুকলে মাঝরাতের আগে আর বার হতে পারবে না। এতরকম আকর্ষণ। এছাড়া মিউজিয়াম, আর্টগ্যালারি, হামলেটের দুর্গ। শোনা গেল, লিট্‌ল্‌ মারমেড আছে শহরের একেবারে ও প্রান্তে। ফকির তো ভিতরের ব্যাপার কিছু জানে না। সরল মনে বলে, একটি বেলা যাবে মারমেড দেখ্‌তে হলে। কী আর দেখবেন বলুন? বাদ্দিন, কেমন?

নেহাৎ কলিযুগ। ব্রাহ্মণের আজ আর সে তেজ নেই। না হলে ফকির যেখানে দাঁড়িয়ে ভ্যাবাচাকা হয়ে আমাকে দেখছে সেখানে পড়ে থাকার কথা একমুঠো ছাই। সামলে নিয়ে আবার বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, অমন করে তাকাচ্ছেন কেন? বেশ তো, কাল বিকেলে গিয়ে দেখব। ট্রেন তো রাত্রে। লিট্‌ল্‌ মারমেড তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

তাই স্থির হল। শুক্রবার অন্যান্য সব কিছু দেখা হল। শনিবারের সকালটাও! বিকেলটা রিজার্ভ করা আছে আমার কাফ্‌-ল্যভের জন্য। ফকির তা জানে না। মনটা খুশি খুশি।

মেঘের আড়ালে এক ভন্ডুলেশ্বর আছে। চেনেন? তিনি রসিকতা শুরু করলেন! দুপুর থেকেই ঘনিয়ে এল মেঘ। কোপেনহেগেনের আবহাওয়ার কোনো মাথা মুণ্ডু নেই। শুরু হল দারুণ ঠান্ডা ঝোড়ো-হাওয়া আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। কোনো মানে হয়! ফকির বলে, জল ঝড়ে অতটা পথ যাওয়া অসম্ভব। বর্ষাতিও নেই সঙ্গে।

আমি বলি, তুমি যেতে না চাও যেও না। আমি যাবই।

—যান! কিন্তু দেখতে পাবেন না। সব তো ঝাপ্‌সা!

তা ঠিক। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি—সব ঝাপ্‌সা।

সারাটা বিকাল আটক পড়ে থাকতে হল হোটেলে। সন্ধ্যা-নাগাদ ট্রেনটা ধরা গেল। গাড়িটা যখন প্ল্যাটফর্মের বাইরে বার হয়ে আসছে তখন আমি মনে মনে বিদায় চাইলুম লিট্‌ল্‌ মারমেডের কাছে। এই একষট্টি বছরের জীবনে দু-দুবার সুযোগ পেয়েও হারালুম। অর্ধশতাব্দীর ভিতর আমারই বিবর্তন হয়েছে—শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ; অথচ ঐ অনন্তযৌবনা আছে অচঞ্চল—ডোরিয়ান গ্রে-র মতো। যে ছিল

আমার দিদির মতো সে আজ আমার কন্যা-প্রতিম। গাড়িটা যখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বার হয়ে আসছে তখন মনে মনে বলি : রাগ করিস্ না, মা আমার! কী করব বল? চেষ্টার তো ত্রুটি করিনি। সেবার কয়েক শ' মাইল দূর থেকে ফিরে যেতে হয়েছিল, এবার মাত্র পাঁচ মাইল দূর থেকে। আর কোনোদিন দেখা হওয়া অসম্ভব।

রাত্রে ট্রেনের বাঙ্কে শুয়ে ওর মূর্তিটা ভাবতে চেষ্টা করি। আশ্চর্য। কিছুতেই মনে পড়ছে না। অভিমান! মৎস্যকন্যা অভিমান করেছে নির্ঘাৎ!

কাহিনিটা ওখানেই শেষ হবার কথা। কিন্তু হচ্ছে না। ভিসার ভেল্কির কথাটা বলাই হয়নি এখনও। শুনুন আরেটু—

কোপেনহেগেন থেকে দক্ষিণ-মুখো চলেছি। আবার ট্রেনটা সেঁদিয়ে গেল জাহাজের গর্ভে। আবার সেই রাতের অতিথিরা এল জ্বালাতে। ওদের মাঝরাতের 'থ্যাঙ্কু থ্যাঙ্কু' খেলাটা বেশ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয় না। তাই ঘুমের মধ্যে যেই কানে গেছে—'সরি টু ডিস্টার্ব ইউ, স্যর' অমনি অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হিপ-পকেট থেকে মোটা খামটা বার করে ওর হাতে ধরিয়ে দিলুম। সে ঐ খামটা দিয়ে কী করে আমি জানি না। কোনোদিন চোখ মেলে দেখিনি। তবে এ নাটকের নাইট-শোতে ওর ডায়ালগের শেষ কিউটুকু মনে আছে—'থ্যাঙ্কু'! তখনই খামটা পকেটে নিয়ে আমার পাশ ফিরে শোবার অ্যাক্শন।

আজ তার ব্যতিক্রম হল। পাশ ফিরে শোবার উপক্রম করতেই লোকটা আমাকে টেনে তুলল। ঝাঁকানি দিয়ে বললে, আমার কথাটা তোমার কানে যায়নি। আমি বল্‌ছি, তোমাকে জার্মানিতে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

ঘুমটা ততক্ষণে ছুটে গেছে আমার। বলি, মানে? আমার অপরাধ? আমি তো দিল্লির কন্‌সুলেট অফিস থেকে ভিসা করিয়ে এনেছি।

—তা এনেছ; কিন্তু তুমি নিজেই দেখ, তাতে লেখা আছে : Zur einveise.

—তার মানে?

—For one entry only—'একবার প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবেক।'

আমি বলি, আমিও তো সেটাই চাই। আমি তো জার্মান-সীমান্তে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে চাইছি না। মাত্র একবারই উত্তর-সীমান্ত দিয়ে ঢুকব, দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে বার হয়ে যাব।

—সরি! তা সম্ভব নয়। তোমার একাঘ্নী বাণ খর্চা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই তুমি একবার দক্ষিণ-সীমান্ত দিয়ে ঢুকে উত্তর-সীমান্ত দিয়ে বার হয়ে গেছ। যখন দিন তিনেক আগে রাতের ট্রেনে আমস্টার্ডাম থেকে কোপেনহেগেন গেছিলে। এই দেখ, তোমার পাসপোর্টে ছাপ মারা আছে।

আমি তো আকাশ থেকে পড়ি। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি : সেবার আমি জার্মান ভূমিতে পদার্পণ মাত্র করিনি! মাইরি বল্‌ছি!

—সো হোয়াট! তোমার ঘুমন্ত দেহটা? সেটা যে জার্মান ভূখণ্ডের উপর দিয়ে বাহিত হয়েছে!

লে হালুয়া! এ কী শিব ঠাকুরের আপন দেশে এসে পড়লুম রে বাবা!

আমার নজর গেল উপরের বার্থে। কম্বলের ফাঁক দিয়ে কার যেন মুণ্ডু এতক্ষণ আমাদের কথোপকথন শুনছিল। আমি উপরের দিকে তাকাতেই কুণ্ডুর মুণ্ডুটা সেঁদিয়ে গেল কম্বলের তলায়। কিন্তু কম্‌লি কি তাতে ছাড়ে? পলাতককে পাকড়াও করার প্রেরণা ওর রক্তে। হয়তো ওর বাপ-দাদাই বছর চল্লিশ আগে ঠিক ঐভাবে চোরা-কুটুরি থেকে ক্যাঁক করে পাকড়াও করে এনেছিল সপরিবার অ্যানি ফ্রাঙ্ককে।

টঙের উপর থেকে ফকির কুণ্ডুকে নেমে আসতে হল। জার্মান সিকিউরিটি অফিসারটি আমাদের কোনো যুক্তিই শুনল না। জাহাজ এসে ভিড়ল জার্মান বন্দরে। সেই হিমেল শেষরাত্রে মালপত্র গুছিয়ে, দু'হাতে দুই স্যুটকেস্ নিয়ে আমরা দুই গ্রেপ্তারী আসামী— 'প্রিন্স অ্যান্ড দ্য পপার'—এসে হাজির হলুম জার্মান সিকিউরিটি সদর দপ্তরে। আমাদের মতো আরও কিছু হতভাগ্য যাত্রীকে ওরা পাকড়াও করে এনেছে। সারি সারি ওরা বসে আছে বেঞ্চিতে।

ফকির বলে, আশ্চর্য সাদৃশ্য! দেখুন, ঠিক মনে হচ্ছে ওয়ার পিক্‌চার দেখছি! সারি সারি বসে আছে ইহুদির বাচ্চা। কখন ডাক আসে গ্যাস চেম্বারে যাবার!

—গ্যাস চেম্বার!—আমার হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদুতে চায়।

—না তো কী? ওরা যদি জার্মানিতে ঢুকতে না দেয় কী করবেন?

কী করব? তাই তো? ডেনমার্ক থেকে জার্মানি এড়িয়ে কীভাবে পালানো যায়?

হঠাৎ ডাক এল। হাজির হলুম জার্মান সিকিউরিটি অফিসারের সামনে। সে আমাদের কাগজপত্র সব খুঁটিয়ে দেখল। ফরিয়াদির সওয়াল শুনল। ডিফেন্স কাউন্সেল, অর্থাৎ আমার যুক্তিটাও শুনল। আমি বারে বারে জোর দিলুম ঐ কথাটায়—আমাদের ঘুমন্ত দেহটাই শুধু জার্মান ভূখণ্ড দিয়ে বাহিত হয়েছে। জ্ঞাতসারে আমরা জার্মানিতে এখনও পদার্পণ করিনি। খোদা কসম্! ওরা ছিল পাঁচ সাত জন। আমি একা। মানে, জুনিয়ার কাউন্সেল ফকির কুণ্ডুকে বাদ দিলে। আমার ইংরেজিটাও ওরা ভালো মতো বোঝে না। তা হোক, তবু আমি বাঘের বাচ্চার মতো লড়ে গেলুম। অনেকটা সেই পাগ্‌লা জগাই-এর মতো—"সাত-জার্মান জগাই একা, তবু জগাই লড়ে!"

ভবি ভুলল না! বিচারক নিদান হাঁকলেন ফরিয়াদির স্বপক্ষে।

বহিষ্কারদণ্ড!

আমি বলি, ঠিক আছে স্যার, বহিষ্কারদণ্ডই মেনে নিচ্ছি, তবে ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে উত্তর সীমান্তের বদলে দক্ষিণ সীমান্ত-তক্ আমাদের বন্দী অবস্থায় নিয়ে গিয়ে 'দুয্যাঃ' করবার আদেশ দিন ধর্মাবতার!

জার্মান ধর্মাবতার তাতে রাজি নন।

আমি কাতর কণ্ঠে বলি, জার্মানিতে যদি আদৌ ঢুকতে না দেন, তবে আমরা যাব কোন্ চুলোয়? তিন দিকেই তো বাল্টিক সী?

ওরা যা বলল তার নির্গলিতার্থ : ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি ছাড়া আমরা যে কোনো চুলোয় যেতে পারি। এমন কি বাল্টিক সমুদ্রে ডুবে মরলেও ওদের আপত্তি নেই।

রাজশেখর বসু-মশাই বলেছেন, 'কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল হতেই হবে।' সব কুণ্ডুর কথা জানি না। কিন্তু ফকির কুণ্ডুর মুণ্ডুটা সাফা। আমার মুণ্ডু ততক্ষণে ঘুরে গেছে। চোখ চাইলে বুকের বোতাম দেখতে পাচ্ছি না আর, দেখছি পিঠ! শিরদাঁড়া! ফকিরের কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। আগেই বলেছি, টুরিজম সে গুলে খেয়েছে। ও তাই ইতিমধ্যে সম্‌ঝে নিয়েছে এ সমস্যার একমাত্র সমাধান—জার্মানির বাইরে গিয়ে যে কোনো রাজ্যের জার্মান কন্‌সুলেট থেকে একখানা নতুন ভিসা করানো—নিদেন Zur einveise-মার্কা একাগ্নি ভিসা—যাতে জার্মানির উত্তর সীমান্ত দিয়ে সুচের আকারে ঢুকে দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে ফাল হয়ে সুইজারল্যান্ড পালিয়ে যাওয়া যায়। সবচেয়ে কাছে ডেনমার্ক, সমুদ্রের ওপার। যে রাজ্যে আমাদের মাল্‌টিপ্‌ল্‌-এন্ট্রি ভিসা আছে; অর্থাৎ যে-চুলো থেকে এইমাত্র এলুম।

আমার মুণ্ডুতে এসব কুণ্ডু-সুলভ কুট-কচালেফন্দি আদৌ আসেনি। এসব ব্যাপারে আমি ওর জুনিয়ার। ওর নজর হল—জাহাজ-ঘাটায় ঝিমাচ্ছে কোপেনহেগেন মুখো একখানা ট্রেন। খেয়া নৌকার মাঝি যেমন এপারের যাত্রীকে ওপারে নামিয়ে দিয়ে হাঁক পাড়ে—'কই বাবুমশাইরা, ওপারে কেনারা যাবেন, লায়ে ওঠেন'—তেমনি ভঙ্গিতে জাহাজখানা ভোঁ বাজালো। জাহাজটা আপ-ডাউন দু'খানা জাহাজকে বাল্টিক-সমুদ্র পারাপার করে।

ভোঁ শুনে ঝিমন্ত ট্রেনটা হাই তুলল। গা-ঝাড়া দিল। হুইসিল বাজিয়ে ধীরে সুস্থে সে রওনা হল জাহাজের পেট বরাবর।

ফকিরও ত্রিং করে লাফ দিয়ে ওঠে। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে! শিগ্‌গির! আপ ট্রেনখানা জাহাজের পেটে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। ছুটুন!

ছুটব! ছুটব কেন? আমি বলি, দূর! ও ট্রেন তো কোপেনহেগেন যাচ্ছে! যেদিক থেকে আমরা এলুম।

ফকিরের তখন জবাব দেবার সময় নেই। দুহাতে দুই স্যুটকেস নিয়ে সে ছুটছে, যেন সিনেমায় দেখা ইহুদী-বন্দী জার্মান শিবির থেকে পালাচ্ছে!

আমি তো তাজ্জব! কিন্তু বিদেশ-বিভুঁইয়ে অমন হীরের টুকরো ফকিরকে হারালে আম্মো ফকির! তাই আমিও ডানে-বাঁয়ে তাকাইনি। ছুটতে থাকি ওর পিছন পিছন। গাড়ি ততক্ষণে পুঃ ঘিস্‌-ঘিস্‌ ছন্দে ধীরে ধীরে চল্‌তে শুরু করেছে। কিন্তু আমরা দুই স্যাঙাৎ খাশ কলকাত্তাইয়া। কলকাতা পরিবহন সংস্থার ট্রেনিং পাওয়া বাসযত্রী। খাড়া-বাসকে আবার 'গাড়ি' বলে নাকি? চল্‌তি-কা-নাম গাড়ি! দু-হাতে দুই স্যুটকেস নিয়ে আমরা দুই কলকাত্তাইয়া টুপ্‌ টুপ্‌ করে উঠে পড়ি।

ভাগ্য ভালো। অনেক বার্থ খালি। অঢেল জায়গা। এতক্ষণে প্রশ্ন করি, কোপেনহেগেন ফিরে যাচ্ছি কেন আমরা?

—ওখানকার জার্মান কন্‌সুলেটে নতুন করে একখানা ভিসা করাতে।

জাহাজটা ছাড়ল। কোপেনহেগেন পৌঁছাব কাল সকালে। সেই যেখানে সমুদ্রের ধারে প্রতীক্ষায় বসে আছে লিট্‌ল মারমেড। অর্থাৎ কাল তার সঙ্গে নির্ঘাৎ দেখা হবে! ভোরের ঠান্ডা লোনা হাওয়ায় যখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

সে রাত্রে ভারি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম—

ঘন নীল সমুদ্রের ধারে বালি-চিক্‌-চিক্‌ বিস্তীর্ণ একটা বেলাভূমি। কয়েকটা সী-গাল পাক খাচ্ছে নির্মেঘ নীল আকাশে। আমি যেন হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আসছি। ক্লান্তিতে আমার শরীর ভেঙে পড়ছে। আমার দু হাতে দুই ভারী স্যুটকেস্‌। কোথায় চলেছি আমি? ক্যালিফোর্নিয়া? সানফ্রান্সিস্কো? আর কতদিন লাগবে পৌঁছতে?

...হঠাৎ নজর পড়ল সমুদ্রের ভিতর, পাড়ের কাছেই ঐ পাথরটার ওপর। ও নিশ্চুপ বসে আছে। সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে। বিষণ্ণ, আন্‌মনা, উদাসীন। জল ঝরছে ওর চুল বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে।

আমি চিৎকার করে উঠি : আর ভয় নেই রে! এই যে, আমি এসে গেছি!

ও চম্‌কে ওঠে। চট করে ঘুরে বসে। আমাকে দেখতে পায়। আনন্দে সেও চিৎকার করে ওঠে : বাবা!

লাফ দিয়ে উঠতে গিয়েই ও পড়ে গেল। আহা-রে! ওর যে পা নেই! লেজ! ও তো দাঁড়াতে পারে না।

কিন্তু ও কে? বুলবুল! আমার বড় মেয়ে? তবে কি আমি অ্যান্টিপডদের আজবদেশে পৌঁছে গেছি? আধখানা পৃথিবী পাড়ি দিয়ে? তার মানে এটা সানফ্রান্সিস্কোর এয়ারপোর্ট? বুলবুল আমাকে রিসিভ করতে এসেছে? না হলে 'বাবা' বলে ডাকবে কেন!

লিট্‌ল্‌ মারমেড লাফ দিয়ে জলে নামল। সাঁতরে এগিয়ে এসে আঁকড়ে ধরল আমার হাতখানা। জলের দিকে টানছে। ভাবখানা—যেন বলতে চায় : দেরি করছ কেন? চল সেই আগেকার মতো দুজনে তর্‌তরিয়ে সাঁতার কাটি!

কেমন করে ওকে বোঝাই যে, সাঁতার কাটার বয়স আর নেই আমার। ওর বয়স বাড়েনি, কিন্তু আমি যে ইতিমধ্যে...

কিন্তু না! ও তো বুলবুল নয়। তবে কি আমার ছোট মেয়ে—মৌ? দমদম এয়ারপোর্টে এসেছে আমাকে রিসিভ করতে? তার মানে ইউরোপ-আমেরিকা সেরে ঘরের ছেলে আমি ঘরে ফিরে এসেছি?

অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে লিট্‌ল্‌ মারমেড বললে, তবে কেন অমন অলুক্ষুণে কথাটা বললে কালকে?

আমি ওর লোনা-জলে ভেজা চুলের মধ্যে বিলি কেটে বলি, কালকে? কালকে কী বলেছিলুম রে পাগ্‌লি?

—বাঃ! গাড়িটা যখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন তুমি কাল বললে না—এ জীবনে আর কোনোদিন দেখাই হবে না?

অনেক-অনেক গল্প শোনাবার আছে। শোনাব সময়-সুযোগ মতো। নায়েগ্রা অথবা আজতেক-ইংকা অদেখা রয়ে গেল, কিন্তু দেখেছি আইসবার্গ—পেঙ্গুইন—জায়েন্ট পাণ্ডা; ল্যুভ-রিৎসমুখ-সিসতিন চ্যাপেল। বিশ্বাস করবেন, যদি বলি ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড জুতে আলাপ হয়েছিল Dr. O. S. Garchaia-এর সঙ্গে? আর্জেন্টিনিয়ান চিত্রশিল্পী। আমেরিকায় আর্ট-স্কুলের শিক্ষক। আমি ভারতীয় শুনে বলেছিলেন, আপনি ভারতীয়? অজন্তা গুহার নাম শুনেছেন?

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন বলুন তো?

—সেই গুহাতে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি আছে। ওরই উপর থিসিস্ লিখে আমি বুইনস্ এয়ার্স্ থেকে ফাইন-আর্টস-এ ডক্টরেট করি। দেশে ফিরে ঐ গুহাগুলি দেখবেন। বোম্বাইয়ের কাছে। অপূর্ব!

এসব গল্প পরে। আজ শুধু শোনাব : ভ্রমণে ভিসার ভূমিকা।

জুরিখ থেকে রওনা হয়ে ছাব্বিশে জুলাই সকালে রোম রেলওয়ে স্টেশানে এসে পৌঁছলুম। যথাচুক্তি ওয়েটিং-রুমের আরাম-কেদারায় লম্ববান হতে যাব ফকির বাধা দিল, ইতালিয়ান ভিসার ঝামেলাটা এবার মেটান আপনি।

হ্যাঁ, ঠিক কথা! হিটলার-এর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি; বাকি আছেন মুসোলিনি। আমার এসব ব্যাপার খেয়ালই হত না। কিন্তু, আগেই বলেছি, ফকির কুণ্ডু টুরিজম গুলে খেয়েছে। সুইজারল্যান্ড থাকতেই একদিন আমাকে বলেছিল, এই একটা ঝামেলা আছে, ইতালিয়ান ভিসার এই লাইনটা—'Forntiera Uscita GORIZIA.'

আমি জানতে চেয়েছিলুম ঐ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য। ও বুঝিয়ে দিয়েছিল—ওর মানে exit point GORIZIA; অর্থাৎ আমাদের ইতালি ত্যাগ করার কথা ছিল ঐ সীমান্ত দিয়ে গ্রীসমুখো। কিন্তু দ-দুবার কোপেনহেগেন যেতে হল বলে আমরা গ্রীসটা বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের EURAIL টিকিটের পনেরো দিন উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ফলে এই রোম-বিমানবন্দর থেকেই আমাদের আমেরিকামুখো উড়তে হবে। গরিজিয়া রেল-স্টেশন দিয়ে নয়।

আমি বলি, তা ওড় না। T. W.A.-কে একটা ফোন করে দাও বরং...

—কিন্তু এয়ারপোর্টে রোমান সিকিউরিটি অফিসার যদি আটকায়? কলকাতায় ইতালিয়ান কন্সাল আমাদের দুজনের ভিসাতেই লিখে দিয়েছে—'নির্গমন সীমান্ত গরিজিয়া'। রোম-বিমানবন্দর নয়।

যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। অগত্যা ফকির এখন বিশ্রামাগারের ইজিচেয়ারে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে বিশ্রাম নিতে বসে; আর তার জুনিয়ার সিটি-ম্যাপ বগলে নিয়ে ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে অফিস খুঁজতে বার হল।

ঘন্টা-খানেক হেঁটে পৌঁছনো গেল এয়ার অফিসে। ভগ্যক্রমে এয়ার অফিসের মেয়েটি অমায়িক। বুলবুলের বয়সী। ইতালিয়ান বোধ হয়। অচিরেই সে দুটি সীট রিজার্ভ করে দিল—রোম-টু নিউইয়র্ক। তাকে বলি, আচ্ছা, আমাদের ভিসায় যে লেখা

আছে আমরা গরিজিয়া-সীমান্ত দিয়ে ইতালি ত্যাগ করব এ নিয়ে এয়ারপোর্টে কোনো ঝামেলা হবে না তো?

—হতে পারে। কী দরকার? তুমি বরং পুলিস হেডকোয়াটার্সে গিয়ে তোমার ভিসায় এক্সিট পয়েন্টটা বদলিয়ে নিয়ে এস।

—ঠিক আছে। কিন্তু ইতালিয়ান কন্‌সুলেটটা কোথায়?

মেয়েটি হাসল আমার অনভিজ্ঞতায়। বললে, ইতালির চৌহদ্দির ভিতর ইতালিয়ান কন্‌সুলেট কোথায় পাবে তুমি? আমি বলছি—পুলিস হেডকোয়াটার্সে যেতে।

অর্থাৎ রোমের লালবাজারে; সেরেছে! কলকাতায় লালবাজারের নামেই প্লীহা-কম্পন অনুভব করি, আর এ একেবারে রোমান লালবাজার!

আমার মুখের অবস্থা দেখে মেয়েটি হেসে বলে, Audaces fortuna juvat!

আমি ইতালিয়ান জানি না বলায় মেয়েটি বলে, এটা ইতালিয়ান নয়, ল্যাটিন। তার অর্থ: নিয়তি নিয়ত নির্ভীকের সপক্ষে।

তাতেও আমি সাহস পাচ্ছি না দেখে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একখানা চিঠি লিখে দিল অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার কাপিতান পোপোলানোকে। আমার সাক্ষাতের কারণ জানিয়ে। বললে, ওখানে ইংরেজি-জানা কাউকে হয়তো পাবেই না। এই চিঠিখানা দেখিয়ে পাসপোর্ট দুটোয় কারেকশান করিয়ে এনো। Ave atque value! I mean, hail and fare well!

অনেক পথ পেরিয়ে, অনেক লাল-সবুজ বাতির বেড়া ডিঙিয়ে অবশেষে শেষ তীর্থে উপনীত হওয়া গেল। বেলা তখন একটা। সকাল থেকে প্রাতঃকৃত্যাদিই সারা হয়নি, তায় প্রাতরাশ! বাড়িটা হুবহু আমাদের লালবাজার। ব্যবস্থাপনাও। ফটকের সামনে উর্দিধারী। অনেক গলিঘুঁজি পার হয়ে অবশেষে উপনীত হওয়া গেল অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার কাপিতান পোপোলানোর এজলাসে। ঘরের সামনে কোনও পিয়ন নেই। নেমপ্লেটে অফিসারের পরিচয় আছে। পাল্লা খুলে ঘরে ঢুকেই আমি আঁৎকে উঠি। বোধ হয় কারও কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের আয়োজন হচ্ছে। হতভাগ্যটা বসে আছে উবু হয়ে, আর তিনচারজন পুলিস-পুঙ্গব তাকে ঘিরে...

—কী চাই?—না, ভাষায় বুঝিনি, ভঙ্গিতে। যে পুলিস অফিসার প্রশ্নটা করেছে, আন্দাজ করি, সেই হবে কাপিতান পোপোলানো। আমি শশব্যস্তে এয়ার অফিসের সেই মেয়েটির চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরি। আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে চিঠিখানা পড়ল। তারপর আমার হাতখানা টেনে নিয়ে চিঠিটা ফেরত দিল। এবং তারপর পুরো পাঁচ মিনিট ধরে সে যে সলিলকিটা শুনিয়ে দিল তাতে আমার মনে হল, সিনেটর সিসেরো রোমান ফোরামে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এক বর্ণও বুঝিনি। দম নিতে ও থামতেই বাও করে বলি—নো ইতালিয়ান!

দশ-সেকেন্ড নৈঃশব্দ। তারপরেই আর একটা লম্বা সলিলকি। এবার মনে হল সিসেরো নয়, ব্রুটাস বক্তৃতা দিচ্ছেন, সীজারের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে। এবারও ভাষণ শেষ হতে পুনরুক্তি করি—নো ইতালিয়ান!

লোকটা বোধহয় হাঁপিয়ে উঠেছে। এবার মূকাভিনয়। মুদ্রা যেটা করল ভাষায় তার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—গেট আউট!

ফিরে যাব কি না ভাবছি, উবু হয়ে বসে যে লোকটা এতক্ষণ ঠ্যাঙানি খাচ্ছিল সে নড়েচড়ে বসল। দু-হাঁটুর মধ্যে গোঁজা মুণ্ডটা তুলে ফোকলা গালে হেসে বলে, আই নো ইংলিৎ! আই হেল্ পয়ু। ইয়ে? ইউ হেল্প মি। নো?

ধড়ে প্রাণ আসে। বালি, ওরা তোমাকে ঠ্যাঙাচ্ছিল কেন?

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেয়, সে এক মহাভারত। চুরি করেছি বলে নয়, ওদের হিসাবমতো চুরির হিস্যা কম দিয়েছি বলে। আইন মোতাবেক ওদের ন্যায্য ঘুষ আমি ঠিকই দিয়েছি...তা সেসব কতা যাগ্‌গে-মরুগ্গে। শোন, সাহেব তোমাকে যা বল্‌ল তার অর্থ কী—

কাপিতান বাধা দিল না। চোরটা অনুবাদ করে শোনালো—কাপিতান পোপোলানোর মতে তাঁর অনেক অনেক কাজ। বর্তমান সরকার লীনিং টাওয়ার অব পীসার মতো অবস্থায় কোনো ক্রমে টিকে আছে তাঁর মতো দক্ষ এ্যাসিস্টান্ট কমিশনার আছে বলে। এমতাবস্থায় কোনো ভিন্‌দেশী সুম্বুদ্ধির পো কোন্ সীমান্তের গর্ত দিয়ে সেঁদুচ্ছে আর কোন সীমান্ত দিয়ে নিকাল যাচ্ছে তার হকহদিস-এর হিসাব রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আমি বলি, ওকে বল না, 'গরিজিয়া' কথাটা কেটে ওখানে 'রোম-এয়ারপোর্ট' লিখে দিতে?

লোকটা অম্লানবদনে বলে, বলছি, কিন্তু তার পরিবর্তে তুমি আমাকে কী দেবে?

—কী চাও বল?

—মাথা ঘুরিও না; এরা সন্দেহ করবে। ঠিক তোমার পিছনেই একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বছর সাতেক বয়স। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরা। যাবার সময় ওকে দু-লিরা দিয়ে যেও। হতভাগাটা কাল থেকে কিছু খায়নি।

—তোমার ছেলে?

—না, আমার স্ত্রীর বেজম্মা।

অতঃপর চোরটা কাপিতানোকে অনুবাদ করে শোনালো আমার অনুরোধ। তপ্ত তৈলপাত্রে বার্তাকু নিক্ষপ্ত হল যেন।

চোরটা বলে, কিছু লাভ হবে না। তুমি বরং কেটে পড়। তুমি না গেলে ওরা আমাকে মন খুলে ঠ্যাঙাতেও পারছে না।

আমি অবাক হয়ে বলি, তা ঠ্যাঙানি খাবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন?

—তা নয়! এসব পর্ব না মিটলে তো ছুটি পাব না। ঐ বাচ্চাটাকে বরং সরিয়ে নিয়ে যাও। ঠ্যাঙানি দেখলে বড় কান্নাকাটি করে। আর, হ্যাঁ, দু-লিরা—

—মনে আছে আমার।

ছেলেটাকে দু-লিরা দিয়ে ফিরে এলুম পড়ন্ত বেলায়। ফকিরকে আদ্যোপান্ত সবকথা খুলে বলি। ও বলে, ঠিক আছে; কিছু ভাববেন না। ম্যানেজ হয়ে যাবে এয়ারপোর্টে।

—কিন্তু কী করে কী হবে? যা মেজাজ দেখছি এদের সবায়ের!

ফকির বলে, তা বটে!

রোম থেকে দা-ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট দীর্ঘপথ। আমার নার্ভাসনেস কাটতে চায় না। বারে বারে একই প্রশ্ন করতে থাকি। হ্যাঁ হে, এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসার যদি আটকে দেয়? কী করে ম্যানেজ করবে?

ও বলে, দেখতেই পাবেন। একটা কিছু ফন্দি-ফিকির করতেই হবে।

যথারীতি ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক ফ্লাইটের যাত্রীদলের ডাক পড়ল। শামিল হওয়া গেল কাউন্টারে। টিকিট দেখিয়ে, মালপত্র জমা দিয়ে, বোর্ডিং কার্ড নিয়ে এক কোনায় চুপটি করে বসে থাকি। একটু পরেই ঘোষিত হল: সিকিউরিটি চেক্ করাতে যাও এবার। ফকিরকে সামনে নিয়ে দুরুদুরুবক্ষে এগিয়ে চলি।

যেখানে বাঘের ভয়!

আমাদের পাসপোর্টের যে পাতায় ইতালিয়ান ভিসা সেটা খুলে চম্‌কে উঠল সিকিউরিটি অফিসার, একী! তোমরা রোম এয়ারপোর্টে কেন? তোমাদের তো গরিজিয়া সীমান্ত দিয়ে রেলপথে ইতালি ত্যাগ করার কথা?

আমি নেই!

ফকির বলে, কথা সেরকমই ছিল ভাই। কিন্তু বদ্‌লাতে হল। এই দ্যাখ না—

এয়ার অফিসের সেই মেয়েটির ইতালিয়ান ভাষায় লেখা চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে। খোলা খাম। প্রাপক এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, হেড কোয়ার্টাস। সিকিউরিটি অফিসার ধৈর্য ধরে চিঠিখানা পড়ে শেষ করল। তারপর বলে, কই, কাপিতান তো সেই মর্মে সংশোধন করে দেননি?

এবার হাসল ফকির। ফিকিরের অমায়িক হাসি। বললে, অফিসার! কাপিতান পোপোলিনো আমাকে বলেছিলেন—লেখালেখি নিরর্থক! দা-ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে জনা চার পাঁচ সিকিউরিটি অফিসার আছে। তারাই পালাপালি করে ডিউটি দেয়। প্রায় সব কয়টাই আহাম্মক আর ভীতুর ডিম। আমি লিখে দিলেও আমাকে ফোন করে বিরক্ত করবে। কনফার্ম না করে তোমাকে যেতে দেবে না। শুধু একজনকে দেখবে—সুন্দর দেখতে, স্মার্ট ইয়াংম্যান, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর বসন্তের দাগ। সে ছোকরা বুদ্ধিমান, সে বুঝবে—যাকে গরিজিয়া দিয়ে ট্রেনে করে যাবার অনুমতি দেওয়াই আছে তাকে প্লেনে যেতে দেওয়া হলে পীসার লীনিং টাওয়ারটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে না। সুতরাং, আমি লিখে দিলেও কোনো লাভ নেই!

লোকটা একগাল হেসে বলে, কী বললেন উনি? গুড লুকিং ইন্টেলিজেন্ট স্মার্ট ইয়াং ম্যান!

ফকির বলে, বিশ্বাস না হয় কাপিতানকে ফোন করে দেখো না।

লোকটা বললে, তাঁকে বিরক্ত করার কোনো দরকার নেই। পীসার লীনিং টাওয়ার ভেঙে পড়বে না। অন্তত এটুকু রিস্‌ক আমি নেব।

আর ফকির অম্লানবদনে বলে বসল তার জ্ঞানরাজ্যের শেষ সীমান্তের একমাত্র

ল্যাটিন বাক্যটা—যেটা সে আজই সদ্য শিখেছে আমার কাছে: Audaces fortuna juvat! তোমার সাহস আছে। তোমার প্রমোশন হবার দেরি নেই দেখছি!

লোকটা হেসে ছাপমেরে ভিসা দুটি ফেরত দিল।

এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখি: সিকিউরিটি অফিসারটির মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। দাড়ির জঙ্গলের সীমান্তে, গালের এখানে ওখানে গুটিকতক বসন্তের দাগ। বছর বাইশ বয়স হবে ছোকরার, ইয়াং ম্যান সে নিশ্চয়ই; কিন্তু যার-যাতে-মজে-মন গ্যের্ল ফ্রেন্ড-এর কথা বাদ দিলে এই বোধহয় জীবনে প্রথম ও ছোকরা শুনল—ও দেখতে সুন্দর!

শুধু টুরিজম নয়, মনুষ্যচরিত্রটাও ফকির কুণ্ডুর নখদর্পণে। আমরা বাজারে গিয়ে যেভাবে বেগুন-পটল টিপে টিপে দেখিও ওর গ্লাসটপ্‌টেবিলের ও-প্রান্তে বসে মনে-মনে সারাজীবন ধরে টিপছে মনুষ্যচরিত্র! কোন মাছ কোন টোপ গিলবে ঠিক জেনে বসে আছে!

এমন হীরের-টুক্‌রো যাত্রাসঙ্গী না থাকলে বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমার কী হাল হত?

ভ্রমনে ভিসার ভূমিকাটা যে ভয়ঙ্করী সে তথ্যটা তোমাদের পইপই করে বোঝানোর চেষ্টা করছি। দুনিয়া ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। আমরা তো দু-কুড়ি সাতের খেলা সাঙ্গ করে আনলুম। এখন তোমাদের পালা। তোমাদের হামে-হাল উড়তে হবে—নব্বইয়ের দশকে, এমনকি সহস্রাব্দী পালটে গেলেও। তাই ব্যাপারটা ভালো করে সম্‌ঝিয়ে নাও ভাই। দেখ, আগে থাকতে সতর্ক ছিল বলেই ফকির কুণ্ডু ঐ 'Frontiera uscita Gorizia'-র গভীর গাড্ডায় পতন থেকে আমাদের দুজনকে রক্ষা করেছে। অথচ এমন যে তালেবর টুরিস্ট -কুলতিলক কুণ্ডু তাকেও ভিসার ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে হরফগুলো জার্মান সীমান্তে এক্কেরে ফ্ল্যাট করে দিল। Zur einveise-এর ক্যারাটে কায়দাটা ও ধরতেই পরেনি।

এবার আর একটি সত্য ঘটনার কথা জানিয়ে এ প্রসঙ্গের ছেদ টানি। এ-থেকে প্রমাণ হবে কখনো-সখনো ভয়ঙ্করী ভিসা পি. সি. সোরকারী কায়দায় সবিনয়ে তোমার অনুমতি নিয়ে, তোমার সামনেই তোমার নাক কাটবে! ক্ষুদে ক্ষুদে হরফ নয়—রীতিমতো পাইকা হরফে ছাপা 'গিলিগিলি হোকাস্‌-পোকাস্‌' বিজ্ঞপ্তি-সমন্বিত ব্যুকেতে বেঁধে ফুলের তোড়াটা তোমার দিকে এগিয়ে দেবে। তুমি ফুলটা শুঁকে যখন হাসি-হাসি মুখে দর্শকদের দিকে ফিরলে তখন তুমি জানতেও পারছ না দর্শকদল তোমাকে দেখছে না, দেখছে—সূর্পনখা!

তারিখটা লেখা আছে ডায়েরিতে—31. 1. 82

বুলবুল আর অন্তরা এসেছিল সান ফ্রান্সিস্কো থেকে। জামাই সেবার আসেনি। মাস দুত্তিন কলকাতায় থেকে মা-মেয়ে ওরা দুজন ফিরে যাচ্ছে সেদিন। টিকিট ওরা কেটেছে আমেরিকা থেকে। এসেছে অতলান্তিকের পথে ইউরোপ হয়ে—ফিরে যাবে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে। তার মানে ম্যাগেলানের মতো জাহাজে না হলেও মাত্র সাড়ে-তিন বছর বয়সে অন্তরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করতে চলেছে এবার।

ওদের প্লেন দমদম থেকে উড়বে মধ্যরাত্রে। ভোররাতে পৌঁছবে হংকং। একটি কানেক্‌টিং ফ্লাইট আছে ঘন্টা চারেক পরে। সুবিধা এই যে, দুটি প্লেনই একই এয়ারওয়েজের; এবং টিকিট কাটবার সময় জেনে নেওয়া গেছে যে, প্রথম প্লেনটির কোনো কারণে পৌঁছাতে দেরি হলে দ্বিতীয় প্লেনটি দেরি করে ছাড়ে। অবশ্য চার ঘন্টার মার্জিন যথেষ্টরও বেশি। তা সত্ত্বেও এ তথ্যটা আরও নিশ্চিন্ত করল। হংকং থেকে প্লেনটা টোকিও হয়ে একটানা উড়ে যাবে সান-ফ্রান্সিস্কো—প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে। ট্রাঙ্ক লাইনে, অর্থাৎ ওদের ভাষায় লঙ ডিস্টেন্সে অন্তরার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। সে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে ক্যাচ লুপ্‌বার জন্য লং-অন-বাউন্ডারী-ঘেঁষা ফিল্ডস্‌ম্যানের মতো এস. এফ. এয়ারপোর্টে হাজির থাকবে।

বুলবুলকে এয়ারপোর্টে সী-অফ করতে আমরা বাড়ি সুদ্ধ সবাই চলেছি দমদম। ফ্লাইট টাইম মধ্যরাত্রি। রিপোর্টিং টাইম ছিল বোধহয় রাত দশটা নাগাদ। বাড়ির গাড়িতে সামনের সীটে রানা ও মৌ; পেছনের সীটে মাঝখানে বুলবুল। তার দুপাশে বসেছে তার বাপ আর মা। রিন্টি—মানে অন্তরা যে কখন কার কোলে সেটা হিসেবের বাইরে!

—"বারো মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে..."

না। হিসাবে ভুল হল। গিরীশের রাণী বৎসরান্তে তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বালাবার সুযোগ পেতেন; বুলবুলের মায়ের তাও নয়। কৈলাস আর বঙ্গভূমের চেয়ে দমদম আর এস. এফ্‌-এর দূরত্বটা যে আর আরও বেশি। তাই বৎসরান্তিক সাক্ষাৎটাও সম্ভব নয়। কে জানে, আবার কবে দেখতে পাব!

গাড়ি ভি. আই. পি. রোডে পড়ল। বুলবুল হঠাৎ আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বলে, চুপচাপ এত কী ভাবছ বলত?

—না, ভাবনার আর কী আছে? তবে অমিত এবার নেই তো... এতটা পথ একা একা...

—একা কেন? রিন্টি তো আছে—বুলবুল রসিকতা করে।

রিন্টি বুঝতে পারে আমাদের কথা। বলে, শ্যিওর! অ'ল হেল্‌প্ মম্! ডোঞ্চু ওয়ারি দাদু!

মা-মেয়ের আশ্বাসে আমার চিন্তার গুরুভার লাঘব হল না দেখে বুলবুল আবার বলে, আচ্ছা বাবা, আমি তোমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে তুমি এতটা গোমড়া-মুখে বসে থাকতে না, নয়?

সত্যকথাই বলি, বোধহয় না! রানা হলে এতটা চিন্তা হত না আমার।

বুলবুল রুখে ওঠে, কেন? আমি বার-কয়েক আমেরিকা গিয়েছি; রানার চেয়ে অন্তত ফ্লাইং এক্সপিরিয়েন্স আমার অনেক বেশি। বয়সেও আমি ওর বড়, অর্থাৎ দুনিয়াদারীর অভিজ্ঞতাও অঙ্কের হিসাবে আমার বেশি হওয়ার কথা। তবু তুমি...

—তুই যে মেয়েমানুষ।

রানা সামনের সীট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে ফোড়ন কাটে, ঐ যারা বারো হাত কাপড়েও কাছা দেয় না, না বাবা?

এরপর বেধে গেল ধুম্‌ধুমার ঝগড়া।

'উইমেন্‌স্‌-লিব'-এর ধ্বজাধারিণী দুই বোন দুদিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ করল রানাকে। রিন্টি ছিল তার দিদার কোলে। অস্ফুটে বলে, হোয়াই ডু দে কোয়ার্ল লাইক দ্যাট? দে শুড সে 'ডাব-ডাব-ডাব—ভাব-ভাব-ভাব'। লাইক দিস্‌! রাইট দিদা?

তার ছোট্ট কড়ে-আঙুল চিবুকে স্পর্শ করিয়ে মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারত থেকে সে যে পঞ্চশীলের শিক্ষা পেয়েছে তার একটা প্র্যাকটিকাল ডিমন্সট্রেশন দিয়ে দেয়। দিদা ওকে সবলে জড়িয়ে ধরে। তারপর আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ থেকে একটা কয়লার কুচি বার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অবশেষে দমদম এয়ার-টার্মিনাল।

বুলবুল টিকিট-মিকিট চেক করালো। তারপর যথারীতি এ-পক্ষের ধরা-ধরা গলায়, 'নিয়মিত চিঠি দিস্‌, পনেরো দিন অন্তর-অন্তর'। এবং ও-পক্ষের, 'তোমরাও দিও।'

রিন্টি তার ছোট্ট হাতটা নাড়তে-নাড়তে মায়ের কোলে চেপে চলে গেল সিকিউরিটি বেরিয়ারের ও-প্রান্তে। আমি আমার কড়ে-আঙুলটা নিজ চিবুকে স্পর্শ করিয়ে জানাই : আই ল্যাভ ইউ!

বাড়ি ফিরে পোশাক পালটিয়ে শুতে শুতে রাত বারোটা বাজল। ভবানীপুর পাড়া নিশুতি হয়ে এসেছে। ক্বচিৎ কোনো মটোরের হুস্‌হুসানি অথবা রিক্‌শার ঠুন্‌ঠান্‌। বুলবুলের মা তাঁতের শাড়ি পাল্‌টিয়ে আর্টপৌরে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে উঠে পড়ল নিজের খাটে। মশারিটা গুঁজতে গুঁজতে একটা আধা-স্বগতোক্তি করে, এইরকম একা-একা যায়...আমার ভালো লাগে না বাপু...

আমার কর্তব্যজ্ঞান মাথা চাগা দিয়ে ওঠে। বুলবুলের মায়ের রক্তচাপ আবার ইদানীং বাড়তির দিকে। ঘুমটা না চড়ে যায়। তাই ওর দুর্ভাবনাটাকে বিদূরিত করতে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, না, না, ভয়ের কী আছে? হংকঙে একবার প্লেন বদলানো। ব্যস্‌! মিলিয়ান-টু-ওয়ান চান্স বাদ দিলে নিরাপদেই কাল-বাদ-পরশু পৌঁছে যাবে সানফ্রান্সিস্কো।

মশারি গোঁজার কাজ বন্ধ হল। কুঞ্চিত ভ্রু-যুগলের তলা দিয়ে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ আমার দিকে মেলে বলে, 'মিলিয়ান-টু-ওয়ান চান্স বাদ দিলে' মানে?

আমি বুঝিয়ে বলতে থাকি, যার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বলা যায়, তাকেই বলা হয় 'মিলিয়ান-টু-ওয়ান চান্স'। অর্থাৎ 'কোটিকে গুটিক' আর কি। মিলিয়ান অবশ্য ঠিক কোটি নয়, দশ মিলিয়ানে...

—আমি মাঝরাতে তোমার কাছে অঙ্ক শিখতে চাইছি না। আর 'মিলিয়ান-টু-ওয়ান চান্স' ঈডিয়ামটার ব্যাখ্যাও শুনতে চাইছি না। আমি জানতে চাইছি—ও নিরাপদে পৌঁছবে না এমন একটা কথা হঠাৎ এই মাঝরাতে কেন মনে হল তোমার?

বুঝুন কাণ্ড! এই আমার কথার অর্থ হল? আমি একবারও বলেছি যে— বুলবুল নিরাপদে পৌঁছাবে না? 'মিলিয়ান-টু-ওয়ান চান্স' মানে কি তাই?

—কী হল? কথা বলছ না যে?

ঘুমটা না চড়ে যায়! রাগারাগি না করে আমি বুঝিয়ে বলতে থাকি, আমি বল্‌ছি—যেসব দুর্ঘটনা দশ-লাখ ফ্লাইটে একবার হয় তেমন রেয়ার চান্স ছাড়া —মানে হঠাৎ ইঞ্জিন বিকল হওয়া, হাই-জ্যাকিং, ক্র্যাশ ল্যান্ডিং...

—থাক! হয়েছে! মাঝরাতে তোমাকে আর আডাক-কুডাকের অষ্টোত্তর শতনাম শোনাতে হবে না। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়!

বুঝুন! আমি শোনাচ্ছি? আডাক-কুডাকের অষ্টোত্তর শতনাম? না উনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শুনতে চাইছেন?

মনে পড়ল রানার যুক্তিটা : বারো হাত কাপড়েও যারা কাছা দেয় না।

বুলবুলের নিরাপদ পৌঁছনোর সংবাদ শুনলাম দূর ভাষণে। ও নাকি আমার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল, আমি ওর কথা বুঝতে পারছিলাম না। তবে 'ওয়ালনাট ক্রীক থেকে বলছি। আমরা ভালোভাবে পৌঁছেছি'—এই কথাগুলো শুনতে পেলাম।

তার দিন কয়েক পরে পেলাম তার দীর্ঘ পত্র।

আদৌ সে নিরাপদে পৌঁছয়নি। তবে রিন্টির দিদা যদি সে রাত্রে আমাকে বাধা না দিত এবং তামাম-রাত ভেবে ভেবে কুঁতিয়ে-কুঁতিয়ে আমি যদি শেষরাত নাগাদ দুর্ঘটনার অষ্টোত্তর শতনামের পুরো মালাটা গাঁথা শেষ করতাম তবু যে দুর্ঘটনায় ও পড়েছিল তার নাগাল পেতাম না। কারণ দুর্ঘটনা প্রাকৃতিক নয়, যান্ত্রিক নয়, আধিদৈবিক নয়, আধিভৌতিকও নয়,—শ্রেফ্ ভৈসিক। মানে 'ভিসা + ঝিক্'!

ভ্রমণে ভিসার ভয়ঙ্করী ভূমিকা!

হংকঙে যখন পৌঁছায় তখন ছয়টা। ওখানকার সময়। আমাদের তখন ভোর রাত—চারটে। হংকঙে ল্যান্ডিংটা ভারি অদ্ভুত—সানফ্রান্সিস্কোতেও তাই। মনে হয় প্লেনটা সমুদ্রে ডাইভ খাচ্ছে। কারণ এয়ার স্ট্রিপটা সমুদ্র-কিনারে। নিরাপদে প্লেনটা হংকঙের মাটি ছুঁলো। চার ঘন্টা সময় আছে পরবর্তী প্লেনটা ছাড়তে। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এক কোলে রিন্টি অন্য কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বুলবুল গুটিগুটি এসে লাইন দিল কাউন্টারে। কিউ-সরীসৃপ একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ও এসে পৌঁছালো কাউন্টারে। টিকিটটা বাড়িয়ে ধরল বোডিং কার্ড-এর জন্য। লোকটা বলল, তোমার লাগেজ?

—আমি দমদম থেকে আসছি। যাব সানফ্রান্সিস্কো। মলপত্র দমদম থেকে থ্রু বুক করা আছে। সঙ্গে আছে শুধু এই ওভার-নাইট ব্যাগ। টিকিটও পাঞ্চ করা আছে। শুধু এই প্লেনের বোর্ডিং কার্ড চাইছি। নন্ স্মোকিং এলাকায়।

লোকটা বললে, তোমার পাসপোর্ট ভিসা?

বুলবুল ব্যাগ খুলে ওর হাতে দিল।

—তোমার মেয়ের বয়স কত?

—সাড়ে তিন। কেন?

—সাড়ে তিন? ওর ডেট-অব্-বার্থ ঠিক কবে?

—বারোই জুলাই উনিশ শ' আটাত্তর। কেন বলো তো?

—তাহলে ওর পাসপোর্ট কই?

—এই তো আমার পাসপোর্টে এন্ট্রি আছে—উইথ বেবি-গার্ল।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু মার্কিন ভিসা?

—কী মার্কিন ভিসা?

এয়ার-ওয়েজ অফিসের লোকটি বুঝিয়ে দেয়, দু বয়স পর্যন্ত কোনো মানব শিশুর পৃথক ভিসার প্রয়োজন হয় না, পৃথক পাসপোর্টও লাগে না। মায়ের লগে-লগে সেও যে-কোনো দেশে ঢুকতে পারে বিনা পাসপোর্ট-ভিসায়, যদি তার মায়ের কাগজপত্রে লেখা থাকে—সঙ্গে শিশু আছে। কিন্তু সেই বাচ্চাটার বয়স দুই অতিক্রম করবে অমনি তার পৃথক ভিসা চাই।

বুলবুল বলে, আমার মেয়ের মার্কিন ভিসা লাগবে?

—শুধু ভিসা নয়, পাসপোর্টও লাগবে। ও যে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে জন্মেছে তা প্রমাণ করতে পার?

—এখানে এই মুহূর্তে তা কেমন করে প্রমাণ করব?

—তাহলে তুমি লাইন থেকে সরে দাঁড়াও। আমি দেখছি কী করতে পারি।

কিউ-সরীসৃপের ল্যাজটাও বোর্ডিং কার্ড নিয়ে চলে গেল। বুলবুল একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার এগিয়ে এসে বললে, আমার কী ব্যবস্থা করলে?

—বললাম তো। তোমার মেয়ের পৃথক পাসপোর্ট চাই।

—আমার টিকিট আছে অথচ আমাকে যেতে দেবে না?

—কেন দেব না? তোমাকে তো আট্‌কাচ্ছি না; কিন্তু তোমার মেয়েকে আমি যেতে দিতে পারি না, পৃথক পাসপোর্ট ছাড়া।

—পৃথক পাসপোর্ট কোথায় করাতে হবে?

—জন্মসূত্রে তোমার মেয়ে যখন আমেরিকান, তখন আমেরিকায়।

—কিন্তু সেখানে না পৌঁছলে আমি তা কেমন করে জোগাড় করব?

—তোমার স্বামীকে ট্রাঙ্ককলে তোমার সমস্যার কথা জানাও। সে তোমার বাচ্চার পাসপোর্ট করিয়ে এয়ার-মেলে পাঠিয়ে দেবে!

—সে তো সাতদিনের ব্যাপার!

—সাতদিনে হবে বলে মনে হয় না। হপ্তা দু তিন লাগবেই!

—মানে? আমি এখানে কোথায় থাকব? কেমন করে থকব? আমার তো...

—সরি! প্রতিটি যাত্রীর পার্সোনাল-সমস্যা সমাধান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বুলবুলের কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে। ওদের ফ্লাইটের যাত্রীদের সিকিউরিটি চেক্ করানোর ডাক ইতিমধ্যে ঘোষিত হয়েচে লাউড স্পিকারে। প্লেনটা ছাড়তে তখনো আধ ঘন্টা বাকি। বুলবুল বললে, তোমাদের এখানে অফিসার কে আছেন? তোমার 'বস্' আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

লোকটা বললে, শ্যিওর! টেলিফোনে স্থানীয় ভাষায় কাকে কী যেন বলল। অনতিবিলম্বে একজন তক্‌মা-ধারী অফিসার এসে উপস্থিত হলেন। ঐ লোকটা দুর্বোধ্য ভাষায় তাকে কী যেন বলল। অফিসার বিনয়ে বিগলিত হয়ে বুলবুলকে প্রশ্ন করলেন, হোয়াট ক্যানাই ডু ফর য়্যু, ইয়াং লেডি?

বুলবুল তার সমস্যার কথা বিস্তারিত জানালো। ভদ্রলোক ধৈর্য ধরে সবটা শুনে বললেন, জাস্ট ওয়েট এ মিনিট প্লিজ!

ওঁর টেবিলের দেরাজ থেকে একটা বাঁধানো বই এনে একটি বিশেষ পাতা মেলে ধরলেন বুলবুলের নাকের ডগায়। ইন্টারন্যাশাল অ্যাভিয়েশন-এর ধারাগুলি সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। চিহ্নিত প্যারাগ্রাফে বড় বড় পাইকা হরফে লেখা আছে—'হোকাস্ পোকাস্ গিলি-গিলি-গিলি!'

অর্থাৎ: সন্তান দ্বিতীয় বৎসর অতিক্রম করিলে তাহার পৃথক পাসপোর্টের ব্যবস্থা করিতে হইবেক। নচেৎ তাহার জননীকে সূর্পনখায় রূপান্তরিত করিতে হইবেক!

রিন্টি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভারী ব্যাগটা বুলবুল আগেই নামিয়ে রেখেছে মাটিতে। এবার রিন্টিকে ডাক কাঁধে থেকে নামিয়ে বাঁ কাঁধে স্থানান্তরিত করে বলে, এ্যাভিয়েশান রুলটা স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হবে বলে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাইনি। আমি বলতে চাই—তুমি এ সমস্যার কী সমাধান বাৎলাচ্ছ? মানছি, অ্যাভিয়েশনের এ আইনটা আমার অথবা আমার ট্রাভ্‌ল্ এজেন্টের জানা ছিল না...

লোকটা বাধা দিয়ে বলে, আইন না-জানা কোনও কৈফিয়ৎ নয়!

—কিন্তু হংকঙে তোমরা আমাকে রুখছ কোন্ অধিকরে? আমার মেয়ের যদি ইউনাইটেড স্টেটস্-এ এন্ট্রি ভিসা না থাকে তবে সে এফ্ এয়ারপোর্টে মার্কিন সিকিউরিটি অমাকে রুখবে।

—সরি! তা হয় না যেখানকার টিকিটে যাচ্ছ সে দেশের ভ্যালিড ভিসা ছাড়া তোমাকে প্লেনে চড়তে দেওয়া চলবে না।

তর্কাতর্কি। তর্কাতর্কি। ইতিমধ্যে ওদের আরও চার পাঁচজন কর্মী এসে জুটেছে। বুলবুলকে ভদ্রতা করে একটা বসবার চেয়ারও দিয়েছে। অ্যাভিয়েশান আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারা বিষয়ে কার কতটা জ্ঞান তা ওরা প্রতিযোগিতামূলক বাক্যালাপে বুলবুলকে বুঝিয়ে দিতে থাকে।

ইতিমধ্যে লাস্ট-ওয়ার্নিং হয়ে গেল। টোকিও—এস এফ—গামী প্লেনটা ছাড়ল। ওরা তখন বুলবুলকে বোঝাচ্ছে : এ সমস্যার একমাত্র সমাধান তাকে হংকঙে দু-তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে এবং তার স্বামীর মাধ্যম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি 'নো-অবজেকশান' সার্টিফিকেট আনিয়ে নিতে হবে।

বুলবুল জানতে চায়, তোমাদের সিটি-অফিসটা কতদূরে?

জানা গেল, সেটা বেশ কিছুটা দূরে। বুলবুল এয়ার-টার্মিনালের অফিসারকে বলল, আমি তোমাদের হেডঅফিসে যাব। এ হতে পারে না। সমাধান একটা কিছু আছেই। তোমরা জানো না...

—এ ছাড়া আর কোনও সমাধান নেই! বিশ্বাস করুন মাদাম....

—এ কথা তোমরা অনেকবার বলেছ। আমি হংকঙে তোমাদের হায়েস্ট অথরিটির সঙ্গে কথা বলতে চাই। তবে আমি এখানকার পথ-ঘাট চিনি না। স্থানীয় ভাষাও জানি না। তোমরা আমাকে একজন বিশ্বস্ত এস্‌কর্ট দাও। যে আমাকে ঐ এয়ার-অফিসে পৌঁছে দেবে। তার যাতায়াতের ট্যাক্সি ফেয়ার আমি দেব।

ব্যবস্থা হল। ওরা একজন যুবককে সঙ্গে দিল। মঙ্গোলিয়ান চেহারা। ইউরেশিয়ান হবে হয়তো। বছর ত্রিশেক বয়স। ঘুমন্ত রিন্টিকে কোলে নিতে চাইল সে। বুলবুল রাজি হল না।

অনেক ঘুরে ঘুরে একটা টিলার মাথায় উঠে এল ট্যাক্সিটা। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। একদিকে শহরের বিসর্পিল পথ-ঘাট, গাড়ি-ঘোড়া, রিক্‌শা—অপরদিকে আদিগন্ত সমুদ্রের ফেনিল উচ্ছ্বাস। বহু দূরে দূরে পাল তোলা নৌকার সাদা-লাল-নীল ফুটকি। মাথার উপরে পাক খাচ্ছে কয়েকটা সী-গাল। বুলবুলের এসব কিছুই নজরে পড়েনি। রিন্টির এতক্ষণে ঘুম ভেঙেছে। জুল্‌জুল চোখে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। কোন্ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে সে বুঝে নিয়েছে তার মম-এর কী একটা বিপদ ঘটেছে। খিদে পেয়েছে তার, তবু সাহস করে বলতে পারছে না। কোনওরকম বায়নাক্কা নেই। টেডি-বেয়ারটাকে সাবড়ে ধরে পুটপুট করে ইতিউতি চাইছে।

ট্যাক্সিটা পাকদণ্ডি পথে ঘুরে ঘুরে উঠে এল টিলার মাথায়। এয়ার-অফিসের পোর্টিকোর নিচে এসে দাঁড়ালো। ডলার ভাঙিয়ে ট্যাক্সি-ভাড়া মিটিয়ে নেমে এল বুলবুল, রিন্টিকে কোলে নিয়ে। যুবকটি প্রায় জোর করেই কেড়ে নিল হাত ব্যাগটা। বইবার জন্য।

সকাল তখন সাড়ে নয়টা হবে। এয়ার-অফিস সবে খুলেছে। অফিসের সামনেই একটি বিজ্ঞপ্তি : 'কুকুর ও শিশুদের ভিতের নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

আউটার অফিসের গদি আঁটা সোফায় বসল ওরা। যুবকটি বললে, বেবি আমার কাছে থাক। আপনি ভেতরে যান।

রিন্টি ইংরেজি বোঝে। ঝাঁকড়া চুল সমেত মাথা ঝাঁকিয়ে সে প্রতিবাদ করে, ন্‌নো!

অজানা অচেনা পরিবেশ। বেগানা লোক। মায়ের মুখটা থম্‌থমে। রিন্টির আর দোষ কী? খিদের কথাটা চেপে আছে, তাই বলে মাকে ছেড়ে সে এখানে একা-একা থাকতে রাজি নয়। কিন্তু যে প্রাজ্ঞ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কুত্তা ও মানবশিশুকে ব্র্যাকেটভুক্ত করে ঐ বিজ্ঞপ্তি টাঙাবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি বোধকরি এবম্প্রকার সেন্টিমেন্টের ধার ধারতেন না। বুলবুলকে দশটা মিনিট ব্যয় করতে হল এখানে : বাট্ য়্যু প্রমিস্‌ড্ দাদু, দ্যাট য়ু উড হেল্‌প মি?

রিন্টিকে স্বীকার করতে হল। হ্যাঁ, ঐ রকম একটা প্রতিজ্ঞা সে করেছে বটে। যাত্রাপথে প্রয়োজনে মম্‌কে সাহায্য করবে। সে জন্যই তো সকাল থেকে মায়ের মুখখানা দেখে ও একবারও বলেনি যে, ওর খিদে পেয়েছে। কিন্তু তার মানে কি ঐ

অচেনা লোকটার কাছে একা-একা বসে থাকা? তবু বুঝমান, লক্ষ্মী মেয়ে। রাজি হল সে।

মেয়ে রাজি হলে কি হয়, মা যে এবার রাজি হতে পারে না। হংকঙ কুখ্যাত জায়গা। কিংকঙ-এর সঙ্গে অন্তর্মিল হয় বলে নয়, ফ্রি-পোর্ট বলে। নানান জাতের দুষ্কর্মের পীঠস্থান। ছিনতাই-চুরি-অ্যাবডাক্‌শন, কী নয়? ঐ লোকটার নাম পর্যন্ত বুলবুলের জানা নেই। এয়ারপোর্ট-এর সেই লোকগুলো ভবিষ্যৎ এন্‌কোয়ারির সময় যদি ডাহা অস্বীকার করে? যদি বলে বসে, না না! আমরা তো ওঁর সঙ্গে কোনো এস্‌কট্‌ দিইনি! তখন?

"আকাশ ভরে উঠ্‌ত কেঁদে হারিয়ে গেছি আমি!"

... বুলবুল তার বাপকে এখানে লিখেছিল, 'পথের-মহাপ্রস্থানে' তুমি একটা ঘটনার প্রসঙ্গে ঐ উদ্ধৃতিটা দিয়েছিলে, মনে আছে? তোমার মেয়ে ঘুমের ঘোরে অতল খাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল আর তুমি শেষ মুহূর্তে তার ফ্রক চেপে ধরেছিলে। আমার অবস্থা তোমার চেয়েও সঙ্গীন! প্রথমত তুমি ও-কথা ভেবেছিলে বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরে, আর আমি ভাবছি বিপদটা মাথায় নিয়ে। দ্বিতীয় কথা, তোমার চরমতম আশঙ্কাটা ছিল সসীম—কন্যার মৃত্যু; আর আমার বেলা সেটা অসীম—মরার বাড়া গাল!...

বুলবুল এগিয়ে গেল এয়ার-অফিসের কাউন্টারের কাছে। ঠিক সামনেই বসে আছেন একজন বর্ষিয়সী আমেরিকান মহিলা। অম্লানবদনে তাঁকে ইংরেজিতে বললে, আমি আপনাদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে ভিতরে যাচ্ছি। বাচ্চা নিয়ে যাবার কানুন নেই বলে ঐ অপরিচিত ভদ্রলোকের জিম্মায় আমার মেয়েটাকে রেখে যেতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি কি কাইন্ডলি একটু নজর রাখবেন আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত?

বুলবুলের কণ্ঠস্বর কিছু অনুচ্চ ছিল না। হয়তো উত্তেজনায় অথবা এসব ঠুনকো সৌজন্যের দিকে মন দেবার মেজাজ ছিল না বলে। যুবকটি উঠে এল রিন্টিকে নিয়ে। কাউন্টার টপকিয়ে ঐ প্রৌঢ়া মহিলার জিম্মায় রিন্টিকে গচ্ছিত করে দিয়ে বুলবুলকে বললে, এবার আমিই বরং নজর রাখি বাচ্চাটার উপর।

বুলবুল অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে কিছু বলবার উপক্রম করতেই লোকটা তাকে বাধা দিয়ে বলে, তুমি যা করেছ, করছ, তা যুক্তিসঙ্গত। অনুরূপ অবস্থায় আমার মা-বোন যদি এটা না করত তাহলে আমি তাদের গালমন্দ করতাম। তুমি কোনও কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা কোরো না সিস্টার। যাও, ভিতরে যাও।

বুলবুল এবার ঐ এয়ার-ওয়েজ-এর হংকঙ স্থিত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল। বড়-সাহেবের চেম্বারটা এয়ার-কন্ডিশন করা। সাহেব ওর ভিজিটিং-স্লিপে নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, ইয়েস্‌, ম্যাডাম হাউ ক্যান আই হেল্‌প্‌ য়ু?

বুলবুল একেবারে 'আদিকাণ্ডে রাম জন্ম সীতা-পরিণয়' দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছিল। বড়সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি যতক্ষণ ট্যাক্সিতে এখানে এসেছ ততক্ষণে এয়ারপোর্টের ওরা আমাকে সবিস্তারে ব্যাপারটা টেলিফোনে জানিয়েছে।

আমি অ্যাভিয়েশান রুলস্‌ও ইতিমধ্যে কন্‌সাল্ট করে দেখেছি। এ ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। তোমাকে দু-এক হপ্তা হংকঙে থেকে যেতে হবে। তুমি সানফ্রান্সিস্কোতে তোমার স্বামীকে ট্রাঙ্ক-কলে সমস্যাটা জানাও। সে ওখানকার ...

বুলবুলও তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, লুক হিয়ার স্যার! এই সৎ পরামর্শটুকু শুনবার জন্য আমি ট্যাক্সি ভাড়া করে এতটা পথ আসিনি।

—আই সী। তবে কেন এসেছ?

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে টিকিটটা বার করে দিয়ে বুলবুল বলে, আমার টিকিটের পিছনে তুমি লিখে দাও অ্যাভিয়েশান রেগুলেশানের অমুক ধারা মোতাবেক তুমি টিকিট থাকা সত্ত্বেও আমাকে প্লেন-এ বোর্ড করতে দাওনি।

সাহেব কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বলে, কেন? তাতে তোমার কী লাভ?

—আমার স্বামী যখন তোমাদের এয়ার-ওয়েজের বিরুদ্ধে মামলা লড়বে তখন তোমার সই করা কাগজখানা এভিডেন্স হিসাবে প্রয়োজন হবে।

বড়সাহেব হেসে বল্‌লে, তুমি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছ, মিসেস্‌ বাসু। শোন, মামলা-মোকদ্দমার ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। আমরা বে-আইনি কিছু করছি না...

—হতে পারে। আমি তো আইন-কানুন ভালো জানি না। সে-বুঝবে আমার সলিসিটার। কিন্তু নেক্সট উইকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি চাকরিতে আমার যোগদান করার কথা। আমি নিয়োগপত্র পেয়েছি, এবং তাদের জানিয়েছি নির্দিষ্ট সময়ে আমি যোগদান করব। তোমরা রুখে দেওয়ায় সে চাকরি আমার হাতছাড়া হবে। তার সঙ্গে তুমি আমাকে যে বিপদে ফেলেছ তার অর্থনৈতিক ও মানসিক আঘাত মিলিয়ে আমার আন্দাজ ড্যামেজ-স্যুটটা মিলিয়ান ডলারের কাছাকাছি দাঁড়াবে। তোমার লিখিত রিফিউজালটা আমার চাই-ই।

সাহেব একটু রাগতভাবেই ওর হাত থেকে টেনে নিল টিকিটটা। বললে, অল-রাইট! তাতেই যদি তোমার তৃপ্তি হয় তা লিখে দিচ্ছি আমি। কিন্তু এটাও বলি, ইয়াং লেডি, তুমি প্রকাণ্ড একটা ভুল করছ। ড্যামেজ স্যুটটা আদৌ দাঁড়াবে না। তোমার একমাত্র স্ট্যান্ড হতে পারে আইন না জেনে ভুলটা করেছ। কিন্তু আইন না জানা কোনও কৈফিয়ৎ নয়। আমরা ইন্টারন্যাশ্‌নাল অ্যাভিয়েশান রুলস্‌-এর একচুল বাইরে যাইনি তোমাকে প্রত্যাখান করে।

বুলবুল জোর দিয়ে বলে, শ্যিওর। সেজন্য তো আমরা মাম্‌লা লড়ব না। আমাদের অভিযোগ তো সম্পূর্ণ উল্টো। কেন 'উড়তে দিলে না', বলে নয়, কেন 'উড়তে দিলে' বলে।

বড়সাহেব কলমের খাপটা খুলেছে ইতিমধ্যে। থমকে থেমে বলে, মানে? বুঝলাম না।

—আমি যখন দমদম এয়ারপোর্টে তোমাদের এয়ার-ওয়েজ মারফত প্লেনে উঠি তখন আমার মেয়ের বয়স ছিল দুই বছরের বেশি এবং তার পৃথক পাসপোর্ট ভিসা

ছিল না। তা সত্ত্বেও তোমরা ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাভিয়েশন রুলস্ ভায়োলেট করে দমদম-টু-হংকঙ আমাকে আসতে দিলে? তোমরা আইন জানো না বলে? কিন্তু আইন না-জানা তো কোন কৈফিয়ৎ নয়—বিশেষ এয়ার-ওয়েজ কোম্পানির।

দম নিতে একটু থামল ও। তারপর বলে ওঠে, কেন তোমরা আমাকে দমদমে রোখনি? এটাই তো আমাদের ড্যামেজ-স্যুট।

সাহেব কলমের খাপটা বন্ধ করে বললে, সে জন্য আমি দায়ী নই; আই মীন আমার হংকঙ অফিস দায়ী নয়।

—শ্যিওর! তবে আমার কমন্‌সেন্‌স বলে হংকঙ এবং ক্যালকাটা এই দুই ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের উপর একজন 'কমন-বস' আছেন। বস্তুত মামলাটা তো ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে নয়। গোটা এয়ার-ওয়েজের বিরুদ্ধে। তোমাদের বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার সবাই তো আসামী। কেসটা তো হবে সানফ্রান্সিস্কো কোর্টে—যেখানে টিকিটটা প্রথম ইস্যু করা হয়। বস্তুত সকন্যা আমাকে যখন এস. এফ. এয়ারপোর্ট থেকে ভারতে আসতে দেওয়া হয়েছিল তখনই আমার কন্যার বয়স দুই-এর বেশি। আসামী তো একজন নয়, অনেকে। না কি বল?

সাহেব ততক্ষণে কলমটা পকেটে তুলে ফেলেছে। বলে, তোমার মেয়ে কোথায়?

—বাইরে বসিয়ে রেখে এসেছি। এ-ঘরে কুত্তা আর বাচ্চার প্রবেশ নিষেধ...

—না, না। তুমি আগে বাচ্চাটাকে নিয়ে এস।

রিন্টিকে নিয়ে বুলবুল যখন বড়সাহেবের ঘরে ফিরে এল তখন সে টেলিফোনে কার সাথে যেন কথা বলছে। লাইন কেটে দিয়ে বুলবুলকে বলে, লুক হিয়ার মিসেস বাসু। আমি এইমাত্র আমাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইসারের সঙ্গে কথা বললাম। ও একটা ভাল বুদ্ধি বাৎলেছে। কাছেই থাকে, ও এক্ষুণি এসে পড়বে।

একটু পরেই এলেন তিনি। করিৎকর্মা লোক। জানালেন, বুলবুল যদি কোনওক্রমে প্রমাণ করতে পারে যে, তার মেয়ে আমেরিকায় জন্মেছে তাহলে একটা টেম্পোরারি পারমিট ইস্যু করে তাকে উড়োজাহাজে চাপিয়ে দেওয়া যায়। সে অধিকার নাকি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। অ্যাভিয়েশান আইনের কোন ধারায় কোন উপধারায় এই 'হোকাস পোকাস গিলিগিলি গ্যান' নির্দেশটা আছে তা লিগ্যাল অ্যাডভাইসরের কণ্ঠস্থ। বুলবুল বলে, আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই।

যে বর্ষিয়সী মার্কিন মহিলার কাছে রিন্টিকে জমা দিয়ে প্রথম এ-ঘরে এসেছিল তিনি বলেন, তোমার হস্‌পিটাল কার্ড, মেয়ের ফার্স্ট ভ্যাক্‌সিনেশান, প্রথম ট্রিপল্ অ্যান্টেজেন সার্টিফিকেট এনি থিং ...

হ্যাঁ আছে। একটা সার্টিফিকেট খুঁজে পেল বুলবুল, হাতব্যাগ হাৎড়ে।

ওয়ালনাট-ক্রীক-এ অবস্থিত কাইজার হাসপাতালে ডক্টর জোনস্-এর first immunization shot দেবার একটা সার্টিফিকেট। সেটা শিশু জন্মানোর ছয় সপ্তাহ পরে

দেওয়া হয় এবং সেটা না দিলে শিশুকে প্লেনে চাপানো যায় না। দেয়ারফোর শিশু আমেরিকায় জন্মেছে।

ওঁরা তৎক্ষণাৎ বললেন, এনাফ্! এতেই হবে। হলও। অনতিবিলম্বে টেম্পরারি পারমিট ইস্যু করিয়ে পরের দিনের ফ্লাইটে ওর সীট রিসার্ভ করানো গেল।

আসলে আইন-বিশারদ ইতিপূর্বেই ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজারকে জনান্তিকে জানিয়েছিলেন, যে কোন নলচের আড়াল দিয়ে ঐ বিচ্ছু ভারতীয় ভদ্রমহিলাকে হংকঙ থেকে বিদায় কর! সে যা স্ট্যান্ড নিয়েছে তা অব্যর্থ! ড্যামেজ-স্যুট হলে বিমান কোম্পানির হার হবার আশঙ্কা ষোলো আনা ছেড়ে আঠারো আনা! যাকে বলে 'পেয়িং-থ্রু-দ্য নোজ্'—পিতৃনাম-স্মরণান্তক খেসারদ!

ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার জানতে চাইলেন, বিমান-কোম্পানির খরচে তোমাকে কোনও হোটেলে সীট বুক করিয়ে দেব?

—কোন্ হোটেল আমার পক্ষে নিরাপদ হবে বলে মনে করো?

একটু গম্ভীর হয়ে রইল বড়সাহেব। তারপর বলল, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমি কোনও গ্যারান্টি দিতে পারি না। হংকঙে খানদানি হোটেল অসংখ্য; কিন্তু খুন-জখম মাতলামিও বড় কম হয় না। তুমি একা মেয়েছেলে...

—আমি যদি রাতটা এয়ারপোর্ট-এ কাটাই।

—আমি বারণ করব। শেষ প্লেন চলে যাবার পর ওখানে সিকিউরিটি আলগা হয়ে যায়। সারারাত ওখানে কেউ থাকে না। বিশেষত তোমার বয়সী মেয়ে!

বুলবুল একটু ভেবে নিয়ে বললে, হংকঙে Y. W. C. A-এর কোনও ব্র্যাঞ্চ আছে?

জানা ছিল না বড়সাহেবের। টেলিফোন গাইড হাতড়ে পাওয়া গেল একটা নাম্বার। বুলবুল ঐ বড়সাহেবের ঘর থেকেই টেলিফোন করল। ধরলেন, মাদার সুপিরিয়ার স্বয়ং। বুলবুল তার বিপদের কথা জানিয়ে আবেদন করল--সে চার্চের শরণ নিতে চায়। একরাত্রের জন্য কি আশ্রয় পাওয়া যাবে?

—শ্যিওর মাই চাইল্ড! চার্চ তো তোমাদের জন্যই। চলে এস।

—আমি কিন্তু হিন্দু। খ্রিস্টান নই!

—বলডারড্যাস্! বিপদে পড়ে যে যীসাস্-এর শরণ নেয় সে খ্রীস্টভক্ত নয়?

সেই যুবকটিই ওদের ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিল মেথডিস্ট চার্চে। মাদার সুপিরিয়ার ওদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। পরদিন বিশ্বস্ত ড্রাইভার দিয়ে ওকে ভোরবেলা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বুলবুল যখন অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে তার সারা সকালের যাত্রা-সহচরকে ট্যাক্সি ফেয়ারটা দিতে গেল তখন সে বললে, সিসটার, এখন বেলা একটা। তুমি তো সকাল থেকে কিছুই খাওনি। খাবে কিছু?

এতক্ষণে বুলবুল টের পেল দারুণ খিদে পেয়েছে তার। বললে, কী পাওয়া যাবে এখানে?

—সামনেই রেস্তোরাঁ আছে। সব কিছুই পাওয়া যায়। চাইনিজ ডিস পছন্দ করো? চিলি-চিকেন, ফ্রায়েড-প্রন আর চাও চাও?

বুলবুল একশ নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, ডেলিশাস! তিনজনের মতো। তুমিও আমার সঙ্গে লাঞ্চ করে যাও।

লোকটা চলে গেল খাবার কিনে আনতে।

বুলবুল এতক্ষণে রিন্টির দিকে পুরো নজর দেবার সময় পায়। বলে, কি রে? খিদে পেয়েছে?

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল রিন্টি। বলে, ঈয়া! বী-সন্! আয়াম ভেরি ভেরি হাংরি!

—সে কিরে! তাহলে এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন?

—'ক্যজ্ আমি যে দাদুকে প্রমিস্ করেছিলাম, দ্যাট আই'ল হেল্প্ ইউ!

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বুলবুল এতক্ষণে হুহু করে কেঁদে ফেলেছিল কি না সে-কথা সে চিঠিতে লেখেনি তার বাপকে।

‘শিকড়’-এর সন্ধানে

বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দিতে হয়েছিল সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরে। বাংলায়। আমার আন্দাজমতো তাতে শতকরা বিশটি ইংরাজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। স্বীকার করতে কোনও কুণ্ঠা হচ্ছে না কিন্তু। কারণ ইংরাজি শব্দের মিশেল দিয়েছি সজ্ঞানে, ইচ্ছে করেই।

ছেলেবেলায় ব্রতচারী ছিলাম না—প্রতিজ্ঞা করতে হয়নি : ‘খিচুড়ি ভাষায় বলিব না’। ফলে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়নি। অবশ্য মানি, কাজটা খারাপ—ঐ খিচুড়ি ভাষা। না-হলে গুরুসদয় দত্ত মশাই বারণ করবেন কেন? বলুন? তা হোক শুধু হাতি-নারায়ণ নয়, মাহুত-নারায়ণের নির্দেশটাও তো মানতে হবে লেখক নারায়ণকে। এক পণ্ডিত বারণ করলেও আর এক পণ্ডিত আমাকে অনুমতি দিয়ে রেখেছেন : প্রয়োজনবোধে নির্বিচারে খিচুড়ি-ভাষা চালিয়ে যেতে।

‘বাস্তুবিজ্ঞান’-এর পাণ্ডুলিপি বগলে দেখা করতে গেছিলাম রাজশেখর বসু মশায়ের সঙ্গে। পরিভাষা-সংক্রান্ত কয়েকটা জট ছাড়াতে। তারিখটা মনে আছে : তেরই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ’ ঊনষাট। এঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি-বিদ্যার পরিভাষা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘Bending moment-এর বাংলা কি করেছ’? জবাবে বলেছিলাম, করিনি। বাংলা হরফে ‘বেন্ডিং মোমেন্ট’ লিখেছি। উনি খুশি হয়েছিলেন, অনুবাদে আমি ‘বঙ্কিম মোমেন্ট’ লিখিনি বলে। পরামর্শ দিয়েছিলেন পণ্ডিতদের ঐ সব আপত্তি—গুরুচণ্ডালী, খিচুড়ি ভাষা, ও-সব শিকেয় তুলে রাখ। মনে রেখ, তোমার বিষয়টা জটিল : এঞ্জিনিয়ারিং। তোমার একটিমাত্র লক্ষ্য : পাঠককে বুঝিয়ে দেওয়া। যে ভাষায় লিখলে তোমার পাঠক সবচেয়ে সহজে বুঝবে তোমার ভাষাটা হওয়া উচিত সেই জাতের।

তাই সেদিন বার্কলেতে নির্বিচারে ইঙ্গবঙ্গ খিচুড়ি ভাষায় বক্তৃতা চালিয়ে গেছি।

‘বার্কলে’-র নাম নিশ্চয় শুনেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানিতে যেমন ছিল ‘গ্যোটেনজেন’—যুদ্ধোত্তর মার্কিন মুলুকে তেমনি বার্কলে। ক্যালিফোর্নিয়ায়। সানফ্রান্সিস্কো শহরের অনতিদূরে। এ এক বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়। অ্যাটম-বোমার অন্যতম আবিষ্কারক প্রফেসর ই. ও. লরেন্স এখানে বসেই পয়দা করেছিলেন : ‘ক্যালুট্রন’! নাম শোনেননি তো? আমিও শুনিনি। সংবাদ নিয়ে জানা গেল—ওটি হচ্ছে ‘সাইক্লোট্রন’ পূর্ণিমার ষোড়শ কলার শেষ-কলা। ‘সাইক্লোট্রন’-এরও নাম শোনেননি। তাহলে আমি নাচার। সেক্ষেত্রে আপনাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’-এর শরণাপন্ন হতে হবে।

মোট কথা গত তিন-চার দশক ধরে এখানে অধ্যাপক মশাইদের মধ্যে নোব্‌ল-লরিয়েটদের ন্যূনতম সংখ্যা নাকি : তিন। কখনো কমে তিন, কখনো বেড়ে পাঁচ। তাতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কী ফায়দা হয়েছে জানি না, আমাকে একদিন পেটে কিল মেরে উপোসী থাকতে হয়েছিল।

আমেরিকা গেছিলাম নাতনি শ্রীমতী অন্তরা বাসুর আমন্ত্রণে। আমার জীবনে সবই উল্টোপাল্টা : প্রথমে স্থায়ী, পরে সঞ্চারী, শেষ জীবনে অন্তরা। তা সেই অন্তরাদেবী ঐ বার্কলে ইউনিভার্সিটিতে হপ্তায় একদিন ক্লাস করতে যায়। কলকাতাবাসী ছাত্র-ছাত্রীর কাছে প্রেসিডেন্সি-লেডি ব্রেবোর্ন-এ ভর্তি হওয়ার মতো ক্যালিফোর্নিয়ায় বার্কলেতে ভর্তি হওয়া শ্লাঘার বস্তু। সেই বার্কলেতে সপ্তাহে একদিন ক্লাস করতে যাওয়া নিশ্চয়ই গৌরবের; কিন্তু অন্তরার ভাবগতিকে তা মালুম হত না। অন্তরার বাবা—মানে আমার জামাই—অমিত— ঐ বার্কলে থেকে এম. এস. করেছে। তার প্রাক্তন কলেজ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। ওয়ালনাট-ক্রীক থেকে ড্রাইভ করে। লাঞ্চ-ব্রেক-এ ক্যান্টিনে লাইন দিয়েছি; কিউ-সরীসৃপ গুটিগুটি এগিয়ে চলেছে ব্যুফে-লাঞ্চের টেবিল পানে। সেখানে থরে থরে সাজানো নানান সুখাদ্য, আর সাহায্যকারিণী সুবেশা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী পরিবেশিকা— অর্ধেকের নামই জানি না; মানে আমি খাবারগুলোর নামের কথা বল্‌ছি। খিদেটাও চন্‌মনে। অমিত ছিল ঠিক আমার পিছনেই। কানে-কানে বললে, 'আমাদের পিছনে প্লেট-হাতে যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁদের মধ্যে দুজন নোবল্‌-লরিয়েট।'

ব্যস! আমার হয়ে গেল।

এরপর কি আর মাথার ঠিক থাকে? বলুন? পরিস্থিতিটা কল্পনা করুন একবার : ব্যুফে-লাঞ্চের টেবিল পানে আপনি গুটিগুটি এগিয়ে যাচ্ছেন; মনটা চন্‌মনে, দিল্‌টা খুশ-খুশ, জিহ্বাটা রসসিক্ত—এমন ব্রাহ্মমুহূর্তে আপনার কর্ণমূলে কেউ নিবেদন করে গেল—ফর্কপ্লেট হাতে আপনার পিছনে যাঁরা অপেক্ষায় আছেন তাঁদের একজনের নাম— সি. ভি. রমন এবং আরজনের নাম আর. এন. টেগোর। 'পহিলে আপ্‌' আইনে আপনার হাত-সাফাইয়ের পরে ওঁরা চান্স পাবেন। ভাবা যায়? চাইব 'হ্যাম্বারগার'—মুখ-ফস্‌কে বেইরে গেল—'হাম-ঘর-বার'!

প্রাণপাখি যে তখন ডাইনিং-হল খাঁচার বাইরে যেতে পারলে বাঁচে।

এ-হেন বার্কলেতে ক্লাস করতে যায় বলে মনে করবেন না অন্তরা কিছু পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ স্টুডেন্ট। মাত্র পাঁচটি বসন্ত পাড়ি দিয়েছে সে। অথবা এ-হেন বার্কলেতে বক্তিমে দিতে এসেছে বলে তার দাদু একটা কেওকেটা তালেবর। সেদিন অন্তরার দাদুর বক্তৃতা শুনতে বার্কলেতে যারা হাজির হয়েছিল তাদের ন্যূনতম বয়স : পাঁচ। অর্থাৎ কখনো কমে পাঁচ, কখনো বেড়ে পনেরো। গড়ে : দশ।

সবাই সানফ্রান্সিস্কোর বে-এরিয়ার—'প্রবাসী বাংলা স্কুল'-এর ছাত্র-ছাত্রী।

স্কুলের বয়স দশ। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে উনিশ। অর্থাৎ এ দশ বছরে কখনো

কমে এগারো, কখনও বেড়ে পঁচিশ। স্কুলে দুটি বিভাগ। জুনিয়র বিভাগে বিদ্যার্থীদের বয়স পাঁচ থেকে নয়। সিনিয়র বিভাগে দশ থেকে পনেরো। আদিযুগে ক্লাস নেওয়া হত বিভিন্ন গার্জেনদের বাড়িতে; পর্যায়ক্রমে। রবিবাসরীয়, পূর্ণিমা সম্মেলন জাতীয় সাহিত্যসভা যেমন পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয় এক এক বার এক-এক জন সভ্যের বাড়িতে। সময়টা নির্দিষ্ট : রোব্বার, বেলা দেড়টা-টু-তিনটে; ভেনুটা ভেরিয়েব্‌ল্‌। সেটা টেলিফোনে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হত। ক্রমে এ ব্যবস্থায় দেখা দিল নানান অসুবিধা। আজ্ঞে না, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। ও দেশে ছয় মাসে না-হোক দু-তিনশ টেলিফোন কল ধরেছি/করেছি। কলকাত্তাইয়া টেলিফোনেটিক পরিভাষার সেই সব যোগরূঢ় শব্দগুলি—রঙ-নাম্বার, অহৈতুকী এন্‌গেজ্‌ড্‌-টোন, ফল্‌স্‌ রিঙিং সিগ্‌ন্যাল, লাইন্স-ডেড, অথবা ইটার্নাল ট্রায়াঙ্গ্‌ল-এর জটিল জট—তাদের পাত্তা পাইনি। ওঁদের অসুবিধা হয়েছিল এই যে, যাঁর বাড়িতে ক্লাসটা বসছে তিনি সবাইকে আপ্যায়ন করতে শুরু করলেন : "আরেট্টু চিলি-চিকেন নিন...জিন-না বিয়ার?...অ্যাপ্‌ল্‌-পাঈটা কি সুবিধার হয়নি?"

ছাত্রছাত্রী অথবা তাদের অভিভাবকেরা এবম্বিধ আপ্যায়নে আপত্তি জানিয়েছিলেন কিনা ইতিহাসে সে কথা লেখা নেই, কিন্তু ব্যবস্থাটা বরদাস্ত হল না যুগ্ম শ্রীমতী সর্বাণী ঘোষাল তথা সুমিত্রা রায়-এর। 'প্রবাসী বাংলা স্কুল'কে একটি যাত্রাপার্টি হিসাবে কল্পনা করলে ওঁদের ভূমিকা যথাক্রমে অধিকারী মহাশয়া এবং মূল গায়েন-এর। ওঁরা বললেন, ব্যবস্থাটা পাল্‌টানো দরকার। বাংলা-শেখার ক্লাস মানে খানা পিনার আসর নয়।

মধ্যযুগে তাই ক্লাস নেওয়া হত—সেন্ট আল্‌বান্স চার্চে। দুপুরে। 'মাস'-এর পরে। কিন্তু তাতেও জুৎ হল না। বিদেশের চার্চে সাবাথ ডে-তে গিয়ে সমস্বরে 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' বলে হর-হপ্তা চেল্লাচিল্লি করাটা ভালো দেখায় না। সৌজন্যে বাধে।

অগত্যা ওঁরা ধরে পড়লেন ঐ বার্কলে য়ুনিভার্সিটির কোনও বড়কর্তাকে।

ব্যবস্থা হল। বার্কলের বড় কর্তা বললেন : ও কে। রোব্বারে ঘরগুলো তো ভেকেন্ট পড়েই থাকে। তোমরা কাপ্‌ল্‌ অব রুম্‌স্‌ য়ুজ করতে পার। শেখাও তোমাদের কিড্‌স্‌দের; শেখাও টেগোরের ল্যাঙ্গোয়েজ।

প্রসঙ্গতি বলি, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় এ-জাতের অনুমতি অনেককেই দিয়েছেন। ওদের নোটিশ বোর্ড-এর বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি দেখে ব্যাপারটা জেনেছি। শুধু টেগোর নয়, মায় সফোক্লিস, দান্তে, গিল্‌গামেশ ইত্যাদি।

গ্রীক-ল্যাটিন-হিব্রু ছেড়ে আ-মরি বাংলা ভাষার কথা বলি।

প্রতি রবিবার বার্কলেতে বঙ্গ-সরস্বতীর আরাধনা চলে দেড়ঘণ্টা—দেড়টা থেকে তিনটে। বিশ-পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে পেট্রল, থুড়ি, গ্যাস পুড়িয়ে বাচ্চার বাবা/মা শিশুটিকে নিয়ে আসে। বাচ্চা ক্লাস নেয়, বাপ-মা গাছতলায় বসে গুলতানি করে। ছুটি

হলে আবার বিশ পঞ্চাশ মাইল ড্রাইভ করে বাড়ি ফেরে। বিদ্যাসাগর মশাই রাস্তার গ্যাসের আলোয় পড়াশুনা করে মানুষ হয়েছিলেন। এইসব বাপ-মায়ের আর্থিক অবস্থা ঠাকুরদাস বাঁড়ুজ্জের চেয়ে ভালো; কিন্তু হর-হপ্তা একশ মাইল ড্রাইভ করা তৎসহ সপ্তাহান্তের পাঁচ ছয় ঘণ্টা ফুঁকে দেওয়া ইজ নট চাট্টিখানি কথা! তাহলে কেন এ কৃচ্ছ্রসাধন? আসছি সে প্রসঙ্গে।

প্রথম ব্যাচের একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল—শর্মি ঘোষাল। মূল গায়েন শ্রীমতী সর্বাণীর কন্যা। দশ বছর আগে এই স্কুলেই সে শিখেছিল—'অ'-য় অজগর আসছে তেড়ে। এখন সে নিজেই ক্লাস নেয়। বাচ্চাদের শেখায়—'অজগর' ইজ এ ব্যাড গাঈ—আ পাইথন; অ্যান্ড 'আসছে তেড়ে' মীন্‌স্—অ্যাপ্রোচেস্ অ্যাটাকিংলি। ফলো?

স্কুল অবৈতনিক। অভিভাবকদের একজনকে (মোস্টলি মম্‌স্; 'ক্যজ ড্যাড য়্যুজুয়ালি হ্যাভ টু ক্লিন অ্যান্ড ভ্যাকুয়াম্ দ্য হাউস, ইউ নো) পালা করে বছরে একমাস ক্লাশ নিতে হয়। তার সর্বাণীদি 'স্বগৃহে আহারান্তে বন্য মহিষ বিতাড়ন ব্রত'য় দীক্ষিত। তিনি বছরে বাহান্নবার ক্লাস নিতে হাজির। তিনি যদি বড়দের ক্লাসটা নেন তাহলে ঐ সাময়িক পালা-করে ক্লাস-নেওয়া শিক্ষিকাকে নিতে হয় জুনিয়র ক্লাসটা। নেহাৎ যদি পড়ানো ধাতে না আসে তাহলে বিকল্প ব্যবস্থাও আছে। কী ভাবে? কেন, দায়িত্ব নিয়ে বাচ্চাদের দিয়ে কোনও ফাংশান করাতে পার। নাচ-গান, জলসা, নৃত্যনাট্য, থিয়েটার। আ-মরি বাংলা ভাষায়। খোঁজ নিয়ে দেখো, এভাবেই ওরা ইতিমধ্যে করেছে—পূজারিণী, পেটে ও পিঠে, অবাক জলপান, ভাড়াটে চাই, সীতাহরণ। বড়রা করেছে গান্ধারীর আবেদন। ভি. ডি. ও ক্যাসেটে ওদের 'হ-য-ব-র-ল' শোনা ও দেখা গেল ডক্টর দাশের বাড়িতে। ডক্টর শক্তি দাশ ইউরোলজিস্ট। সাহিত্য এবং সঙ্গীত রসিক। বইটার নাট্যরূপ তাঁরই দেওয়া। তাছাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপে লস্ অ্যাঞ্জেলেসে দেখে এলাম লস্ অ্যাঞ্জেলেসী অ্যাঞ্জেলদের 'আলিবাবা'—শ্যামল মুখার্জির পরিচালনায় বাচ্চারা করল। অভিনয় এবং উচ্চারণ শুনে কে বলবে যে ওদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। সেটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজও নয়!

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। যদিও অধিকাংশেরই বাবা-মা দুজনেই বাঙালি, তবু সেকেন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ নেবার মতো উঁচু ক্লাসে ওরা যখন ওঠে তখন বেছে নেয় ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ্ বা জার্মান। বাংলা ভাষা শোনেই বা কতটুকু? মাতৃভাষা তো মায়ের জাত-নির্ভর নয়, জিহ্বা-নির্ভর। জ্ঞান হবার পর অধিকাংশ বাচ্চাই শোনে বাপ্‌মাকে ডাকে 'হানি'; মা বাপ্‌কে সাড়া দেয় : 'হাঈ'!

ক্রিব অথবা বেবিকটে শুয়ে শুয়ে শোনে পাশের ঘরে ড্যাড-মম্ ধুম্‌ধুমার দাম্পত্য কলহ চালিয়ে যাচ্ছে—বিশুদ্ধ ইঙ্গিরিতে। নাতনি অন্তরা রাতে ঘুমোতো আমার সাথে— ঘুমের ঘোরে সে যে বক্তিমে শোনাতো তা মার্কিনী উরুশ্চারণে ইম্পেকেব্‌ল্ ইংলিশ! মানে, যে-বয়সে ওর ভেতো-বাঙালি দাদু ইংরেজি শেখার স্বপ্ন দেখতো সেই পাঁচ বছর বয়সে ও ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখে। বাংলা সে বলতে পারে, জুৎ পায় না। ও

একা নয়, ওর সমবয়সী যতগুলি বাঙালি বাচ্চাকে দেখেছি ওর সঙ্গে খেলা করতে সকলেরই এক হাল। সুকুমার রায়ের সেই চার লাইনের দারুণ কবিতাটায় ওরা একটুও মজা পেল না :

'কই ভাই কহ রে, অ্যাঁকাচোরা শহরে
বদ্যিরা কেন কেউ আলু ভাতে খায় না।
লেখা আছে কাগজে আলু খেলে মগজে,
ঘিলু যায় ভেস্‌তিয়ে বুদ্ধি গজায় না।।'

রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম আমি। কারণ আমার ছেলেবেলার ঐ ছড়াটা আমার খুব প্রিয় ছিল—মা আলু ভাতে পাতে দিলেই এ নিয়ে মজা হত। বলতাম : দিও না দিও না! ঘিলু ভেস্‌তিয়ে যাবে!

অথচ ফোর-লেন ট্রাফিকের কম চওড়া রাস্তার কথা যার মাথায় ঢোকে না তাকে অ্যাঁকাচোরা শহর আমি কেমন করে বোঝাই? 'ঘিলু যায় ভেস্‌তিয়ে' বোঝানো আরও অসম্ভব। বাধ্য হয়ে ছড়াটা অনুবাদ করি :

"Tell me father Brown, why in Halloween Town
The doctors exchew pumpkin-pie ?"
"Says the ancient scripture, it causes brain-rapture
And makes one zombie. if one does n't die !"

আশ্চর্য! এবার রস গ্রহণে কোনও বাধা হল না ওদের।

ফাদার ব্রাউন যে ইংরাজি সাহিত্যের এক নামকরা গোয়েন্দা সে রসিকতাটা অবশ্য ওরা বুঝল না, কিন্তু Halloween Town, pumpin-pie অথবা zombie-র ব্যাখ্যা দিতে হল না।

শুধু অন্তরা নয়, সবারই এই হাল। শুধু সানফ্রান্সিস্কো নয়, সর্বত্র। লন্ডন, প্যারী, নিউ-ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস্—যেখানেই প্রবাসী বাঙালিদের আসরে এ-বিষয়ে কথা বলেছি। সর্বত্রই দেখেছি একমুঠো হীরের টুকরো ছেলে-মেয়েকে তাদের মধ্য যৌবনে। যারা দু-তিন-দশক আগে প্রেসিডেন্সি লেডি ব্রেবোর্ন—শিবপুর যাদবপুরে ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হত। তারপর স্কলারশিপ পেয়েছে; বিদেশ গেছে। এম. এস. অথবা পি. এইচ. ডি এবং বিয়ে করেছে। বাপ-মা হয়েছে। গ্রীনকার্ড এবং চাকরি। দুখানা গাড়ি না হলে সংসার অচল। একটা গাড়ি নিয়ে কর্তা যায় অফিসে—আর একখানা নিয়ে গিন্নি যায় ইতি-উতি। ফ্রম-জুতো-সেলাই-টু-চণ্ডীপাঠ। তিল তিল করে একটা নতুন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। দু-তিন-পাঁচ বছর অন্তর দেশে এসেছে। মর্মাহত হয়েছে কলকাতার অবস্থা দেখে। মনোহর দাস তড়াগের অপমৃত্যু, যদু বাজারের নাভিশ্বাস, সেন্ট্রাল এভিন্যুর কঙ্কাল, চতুর্দিকে জঞ্জাল, জঞ্জাল আর পোস্টার! মুখ ফুটে রা কাটেনি! একবারও বলেনি, রেগান আর মন্ডেলের ভোটের দিন মার্কিন আমেরিকায় ছুটি ছিল না; বলেনি, দশ কোটি লোককে একদিনে ভোট দিতে দেখেছে

ওরা, কিন্তু একটিও পোস্টার কোনও রাস্তাকে কদর্য করতে দেখেনি, একটিও স্ট্রিট-কর্নার মিটিঙের জন্য ট্রাফিক জ্যাম হতে দেখেনি। এসব কথা ওরা এখানে বলতে সাহস পায় না—পাছে আত্মীয়-স্বজনেরা বলে বসে—ন্যাকামি। সব সাহেব-মেমসাহেব হয়েছেন! প্রথমে খেয়েছে ফোটানো জল, পরে রাব্‌ড়ি, ক্রমে ভাপা-ইলিশ এবং শেষ-মেশ চোখ কান বুজে ফুটপাতি ফুচ্‌কা! শীতালী পাখির মতো ওরা আসে 'থ্যাংস্‌-গিভিং ডে' পার করে। না, ভুল হল। শীতালী পাখি নয়, লীপ-ইয়ারের মতো। বছর বছর কি আসা যায়? এক কাঁড়ি ডলার! শীতকাল ছাড়া অন্য সময় এলে বাচ্চারা সইতে পারে না। ওদের নিয়েই তো ঝামেলা। দাদু-দিদা মাসি-পিসির মনটা যে পড়ে থাকে ওদের জন্যই। ওদেরও।

ঐ খোয়া-যাওয়া হীরের টুকরোগুলোকে ফিরিয়ে এনে আবার যে গলার মালায় গাঁথবে এমন ক্ষমতা নেই দীন-দুখিনী ভারত মায়ের। অক্ষমতাটা শুধু আর্থিক নয়; মর্মান্তিকভাবে মানসিকতারও। মায়ের এবং ছাঁয়ের। উভয় তরফেই! অনেকের নাগরিকত্ব ঘুচেছে। হয় খোয়া গেছে, নয় খোরানা হয়ে গেছে। কিম্বা দিওয়ানা। ইদানীং নাগরিকত্ব ত্যাগের প্রবণতাটা বেড়েছে। মা রে! অভিমান করিস্‌ না। উপায় কী বল? চার বছর জ্বালিয়েছেন, আরও আরও চার বছর জ্বালাবেন। আমি ঐ রেগন সাহেবের কথাই বলছি। ব্যয়বরাদ্দের বৃকোদরভাগ বর্তাচ্ছে 'আর্মস্‌ রেস্‌'-এর গহ্বরে। উন্নয়নখাতে বাজেট কাট হচ্ছে। তাই ইদানীং চাকরি প্রায় সবই ডিফেন্স খাতে। মার্কিন নাগরিক না হলে সে বাজারে নাক গলানো : নিক্স! অর্থাৎ নাথিং ডুইং। অনেকে এখনো নামমাত্র ভারতীয় অর্থাৎ বাঙালি। তবু ওরা প্রাণপণে প্রার্থনা করে যেন ওদের খোকা-খুকুর নাকের ডগায় সেই অবাক দরজাটা বন্ধ না হয়ে যায়—যার চিচিং-ফাঁকে উঁকি দিলে ভিতরে দেখা যায় থরে থরে সাজানো নানান মণিমুক্তো, হীরে-জহরৎ : মাটির পিদিম, তুলসীর মঞ্চ, ধানসিঁড়ি খেত, ঘুঘুর ডাক, শিশিরভেজা ঝরা-শিউলি অথবা ঝড়ে-ঝরা ফোটা-কদম। যেগুলির জন্য পাঁজরের খাঁজে খাঁজে আজও বাজে নস্ট্যালজিক বেহাগের মূর্ছনা! যে গানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন— সেই বীরভূমি বাউল, বিদ্রোহী ভৃগু, অপু-দুগ্গার পুরুৎ-বাপ অথবা হাজার বছর ধরে পথচলা কোনও ক্লান্ত পথিক।

এ বেদনা বাচ্চাদের নয়। তাদের ড্যাড-মম্‌-এর! বাচ্চারা বেঁচেছে—সেই কাঁচি সিগ্রেটের সাবেক বিজ্ঞাপনের মতো—যে বিজ্ঞাপনের কথা আপনারা জানেন, তোমরা জানো না : ওরা কী হারিয়েছে তা ওরা জানে না! তাই ঐ বাচ্চার দল রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বিভূতি বাঁড়ুজ্যে বা জীবনানন্দকে ছোঁবার লোভে বাঙলা শিখতে আসে না। ডাড-মম্‌দের অবাধ্য হতে নেই বলেই আসে। হয়তো-বা অন্য কোনও গোপন কারণ আছে। একটি তাজা ড্যাফোডিল-এর মতো ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে যেমন আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে জানিয়েছিল তার প্রথম প্রেমের গোপন কথা : 'মাই গ্যের্ল-ফ্রেন্ড কান্ট ফলো মি, ইউ সী? সী ডাজন্ট নো ইংলিশ্‌ অ্যাট অল্‌। বাট সী ল্যভস্‌ মি হেভ-ওভর

হীল্‌স্—ইফ্ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটাই মীন! আই ল্যের্ন বেঙ্গলি ওন্‌লি ফর দ্যাট গ্যের্লস্ সেক য়্যু নো?

টোবা-টোবা গাল, পরনে হাফপ্যান্ট, ঠোঁটদুটো টুক্‌টুকে, বছর চারেক বয়স। বাঙালি!

ফিস্‌ফিস্ করে জানতে চেয়েছিলুম, টেল মি ইন কন্‌ফিডেন্স, ক্লাসের কোন্ মেয়েটা?

জবাবে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ইউ আর এ নিন্‌কম্‌পুপ্! এখানকার কোনও মেয়ে নয়। সে থাকে বার্ডওয়ানে, মাই গ্র্যান্ড-মা।

শ্রীমতী সর্বাণী ঘোষাল আমাকে বলেছিলেন, 'মেসোমশাই, এদের জন্য কেউ ভাবে না। এদের জন্য কেউ বই লেখে না। এরা ধোপা-নাপিত, গো-গাড়ি-গঞ্জ, রাজপুত্তুর-রাজকন্যা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী—কিচ্ছু চেনে না। 'কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল' শুনে সে জানতে চায় : Is she a blonde, brunette or a red-headed ? বাধা দু'জাতের : ভাব আর ভাষা। এদের চেনা-জানা দুনিয়ার উপর যুক্তাক্ষর-বর্জিত কোনও বইয়ের সন্ধান দিতে পারেন? যে বইয়ে 'অ'-জগরের পরিবর্তে 'অ-ক্টোপাস্' তেড়ে আসে; যে হাইওয়ে দিয়ে এক্কা গাড়ি ছোটানোর কল্পনা করতে হবে না, যে আকাশে উড়বে "এরোপ্লেন"?

আমি জানতাম এমন বই কলকাতায় জোগাড় করতে পারব না।

স্বাভাবিক। আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্যিকেরা এ সমস্যার কথা জানতেন না। বস্তুত উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন বা যোগীন্দ্রনাথের আমলে এ সমস্যাটার জন্মই হয়নি। আমি কিন্তু এ সমস্যাটা মর্মে-মর্মে অনুভব করেছি আমার সাম্প্রতিক ইউরোপ-আমেরিকা সফরে। শুধু তাই নয়, ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও—বোম্বাই-দিল্লি-মাদ্রাজ, এমন কি পাটনা-ভুবনেশ্বর-গৌহাটি—যেখানে বাঙালি বাচ্চা হিন্দি-ইংরাজি বা স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে স্কুলে পড়াশুনা করে। ভারতে সমস্যাটা একদিকে যেমন কম, অপরদিকে বেশি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্নসংস্থানের জন্য যে বঙ্গভাষী থাকতে বাধ্য হন তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাকে বাংলা শেখাতে বেগ পান। ইংরেজির মাধ্যমে বাংলা শেখানোর উপযুক্ত বইয়ের প্রচণ্ড অভাব। এদের সমস্যাটা একদিক থেকে কম—কারণ বাংলা না হলেও ওরা ভারতীয় বাতাবরণে মানুষ হচ্ছে। ঋষিমশাই বসেন পূজায় বললে হাঁ হয়ে যায় না। অপরপক্ষে ওদের অনেককে জ্ঞান সমুদ্রে ভাসতে হয়েছে যে নৌকায় তার হাল-দাঁড়ে বসেননি শেক্সপীয়র, মিল্টনের মতো দক্ষ নাবিক। তাদের মাধ্যম : হিন্দি!

সাগরপারে সমস্যাটা অন্যদিক থেকে তীব্র। মনে আছে, অন্তরা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, "হাউ কাম? এভ্‌রি বিজি-বডি কান্ট বি টুনটুনিজ ব্রাদার? 'ভাই' মীন্‌স্ ব্রাদার? রাইট?"

তা বটে! সানফ্রান্সিস্কোর শহরতলি ওয়ালনাট ক্রীক হচ্ছে কলকাতার প্রায় একশ

আশি ডিগ্রি ফারাকে—পুব পথেই যাও অথবা পশ্চিমে। সেখানে সেই ফায়ার প্লেসের আগুনের সামনে বসে ওর দাদু ভেবে পায়নি কেমন করে নাতনিকে বুঝিয়ে দেবে ঐ অনবদ্য শব্দ-ঝংকারের মাধুর্য : "এস ভাই, বস ভাই, টুনটুনি ভাই, ভাত বেড়ে দিই খাবে ভাই, খাট পেতে দিই, শোবে ভাই?"

রাশিয়া বা চীনে ছাপা কিছু বাংলা বই দেখেছি—অনেক-অনেকদিন ধরেই দেখে আসছি (মনে আছে, অন্তরার মায়ের একটি প্রিয় বই ছিল, মস্কোয় ছাপা, 'দাদুর দস্তানা'। যুক্তাক্ষর শেখার পরের পর্যায়ের) যার ছবি অতি উৎকৃষ্ট, ছাপা অসম্ভব ভালো। কাহিনির আবেদন অনবদ্য এবং মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু হায়! অনুবাদের ভাষা নিম্নমানের! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। ভাষান্তর করা হয়েছে নিষ্ঠাভরে—'bending moment' যেমন 'বঙ্কিম মুহূর্ত'! সে বইগুলির শতকরা নব্বইভাগ সাফল্য ছবি ও পরিকল্পনায়। পাঠে নয়। নিতান্ত শিশুদের উপযোগী করে যুক্তাক্ষর-বর্জিত কোনও বই যদি মস্কো, বা বেজিং-এ আদৌ ছাপা হয়ে থাকে, তবে তা আমার নজর এড়িয়েছে। কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে যাঁরা শিশু-সাহিত্য বিষয়ে বই ছাপেন তাঁদের দোরে দোরে ঘুরেও বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি।

প্রশ্ন হতে পারে—বাংলা মায়ের ঐ সব হীরের টুকরো ছেলে-মেয়ে—ঐ যারা বিদেশেই রয়ে গেল, রয়ে যাচ্ছে, যেতে বাধ্য হচ্ছে—ওদের খোকা-খুকুরা যদি বাংলা ভাষাটা আদৌ না শেখে তাহলে ক্ষতি কী? ক্ষতি কার? কতটুকু? বাঙলা ভাষার ক্ষতি যে কতটুকু তা তৌল করা মুশ্‌কিল। একটা কথা শুধু বলতে পারি—ঐ খোকা-খুকুর আই-কিউ বেশ অনেকটা উপরে। মানে, আপনি যতটা উপরে ভাবছেন তার চেয়েও বেশি। আপনার আত্মীয় বা চেনা-জানার মধ্যে কেউ যদি ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডা- আফ্রিকায় পরবাসী থাকে তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখবেন তাদের ছেলে-মেয়ে স্কুলে কেমন রেজাল্ট করছে। আশ্চর্য! শতকরা আশি-পঁচাশিটি ক্ষেত্রে শুনবেন তারা ক্লাসে প্রথম পাঁচজনের একজন। অবশ্য সংবাদটা সংগ্রহ করতে রীতিমতো বেগ পেতে হবে আপনাকে। কারণ ওসব দেশে ক্লাসে কেউ ফার্স্ট-সেকেন্ড হয় না। বাচ্চাদের প্রতিযোগিতামূলক আচরণের বিপক্ষে ওরা—অন্তত জ্ঞান রাজ্যে। ওটাকে খেলার ময়দানে রেখে আসতে বলে। সে যাই হোক, আমার ভ্রমণকালে বাচ্চাদের বাপ-মার কাছ থেকে অন্তরঙ্গ আলাপে জেনেছি—বাঙালি বাচ্চারা যতটা A-1 ঘেঁষা মার্কিনী শিশুরা অতটা নয়। শুধু বাঙালি নয়, ভারতীয় মাত্রেই। তার অনেকগুলি হেতু। আমি স্বল্পদিন বিদেশে ছিলাম; মাত্র ছয় মাসের পর্যবেক্ষণ সমাজতত্ত্বের এসব গূঢ় ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার জন্মায় না। তবু আমার যা মনে হয়েছে, বলি। দুটি হেতু প্রধান। সবচেয়ে বড় কথা : হেরিডিটি। ওদের ড্যাড-মমের আই-কিউ। ভারতে যারা দুর্দান্ত রেজাল্ট করত তারাই জি. আর. ই-তে উৎরেছে, স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে গেছে। অথবা ভালো ছাত্রী ছিল বলেই—ভালো রেজাল্ট করা ছাত্রের ঘরণী হয়েছে। আরও একটা হেতু—আমার যা মনে হয়েছে—শৈশবে নিশ্চিন্ততা। ওদের প্রতিযোগী মার্কিন-

কানাডিয়ান-ইংরাজ শিশুদের সামনে সর্বদা দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে আছে এক একানড়ে! তার ভয়ে ওরা সর্বদা তটস্থ : ডিভোর্স জুজু! ড্যাড-মম্ যে কোনোদিন মুখ দেখাদেখি বন্ধ করতে পারে—যেমন করেছে ওদের সহপাঠী অ্যালিস-বব্-ডরোথি-মারিয়ার বাপ-মা! অধিকাংশই সিঙ্গল-পেরেন্টের সন্তান। ক্র্যামার-ভার্সেস-ক্র্যামারের মামলাটা শেষ হলে শিশুটি হয় হবে পিতৃহীন অথবা মাতৃহীন! খুঁড়িয়ে চলে তারা। যার দু-দুটো ঠ্যাঙই দেখতে পাবেন, খোঁজ নিয়ে দেখবেন—কৃত্রিম-ঠ্যাঙের একটা হয়তো বিমাতা অথবা বিপিতা। ভারতীয় বাচ্চারা এদিক থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে নিশ্চিন্ত। সংখ্যাতত্ত্ব তাই বলে। তাই মন দিয়ে পড়াশুনা করবার মন ও সুযোগ ওরা পায়।

ফলে, ঐ সব হীরের টুকরো ছেলে-মেয়ে বাংলা না শিখলে আমাদের কিছুটা ক্ষতি হবেই। ওদের অধিকাংশই হয়তো বিদেশে থেকে যাবে, ভারতে ফিরবে না। হয়তো ইংরেজি সাহিত্য এমন গ্রন্থ রচনা করবে যাতে নোব্‌ল্-প্রাইজ পাওয়া যায়; অথবা নোবেলোত্তর প্রাইজ পাবার উপযুক্ত বলে নোব্‌ল্ প্রাইজটা পাবে না—যেমন : 'Savitri'; কিন্তু আমরা তো সে-জাতের নিখুঁত সাহেব চাই না। নীরদ চৌধুরী মাথায় থাকুন, আমরা চাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে লিখুক : 'ভবানী মন্দির'। কিম্বা নেহাৎ যদি না ফেরে তবে ঐ মার্কিন মুলুকে বসেই ধনগোপাল মুখুজ্জের মতো লিখুক 'চিত্রগ্রীব', 'যূথপতি'।

কিন্তু ওর কনভার্স থিওরেমটা?

ওদের কি কিছু ক্ষতি হবে বাঙলা ভাষাটা না শিখলে?

বলা আরও শক্ত। বিদেশে ওরা যে ধরনের শিক্ষা পাচ্ছে তা যে দেশে থাকলে পেত না—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রক আমাকে মার্জনা করবেন—এ-কথা গৃহচূড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলা যায়। এ আমার 'সাহেব-প্রীতি' বলে মনে করবেন না। অন্তরার স্কুলে কী পড়ানো হয়, কেমন করে পড়ানো হয় তা আমি খুব অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি চার-ছয় মাস ধরে। ফার্স্ট গ্রেড পর্যন্ত ওদের পড়াশুনার চাপ খুব কম। খেলা-খেলা পড়া। হোম-টাস্ক নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে আবার নানান জাতের কম্পোজিশান করতে দিত—যেমন 'হ্যালোইন' (halloween)-এর দিনে লিখতে দিল ভূতের গল্প। পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চা—কিন্তু প্রতি সোমবার লাইব্রেরি থেকে দু-দুখানি বই আনে—রঙিন ছবি-ওলা বই, বড়-বড় হরফ, হার্ড কভার—পরের সোমবার ফেরত দেয়। লাইব্রেরি টিচার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর কাছে ফেরত দেওয়া বই দুটোর বিষয়ে কিছু আলোচনা করে, কেমন লেগেছে জানতে চায়—অর্থাৎ প্রকারান্তরে যাচাই হয়ে যায় বই দুটি সে পড়েছে কি না। অবশ্য প্রয়োজন নেই—আমি ওর প্রতিটি ইস্যু-করা বই তিন-চার মাস ধরে পড়েছি। অপূর্ব! যেমন লেখা, তেমন ছবি। ইচ্ছে করত সবগুলোই অনুবাদ করে ফেলি। বস্তুত করে এনেছিও খান দুই। টেলিভিশনে দু-তিনটি চ্যানেল বাচ্চাদের জন্য নির্দিষ্ট। বিভিন্ন বয়সের।

বিভিন্ন সময়ে। সবচেয়ে বাচ্চাদের জন্য 'সেসিমিস্ট্রি'। কথাটা আসলে 'সিসেম্ স্ট্রিট' (Sesame Street); অর্থাৎ 'চিচিং-ফাঁক' (Open Sesame) পাড়ার গপ্পো। তার চেয়ে একটু বড়দের জন্য মিস্টার রজার্স-এর মেক-বিলিফ ওয়ার্ল্ড, স্কুবি-ডু ইত্যাদি অনুষ্ঠান। শনি-রবি বাদে প্রত্যহ। এ-ছাড়া জীবজন্তু, বিশ্বরহস্য, সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট চ্যানেলে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী অনবদ্য সব অনুষ্ঠানে টি-ভি প্রোগ্রাম ঠাসা। ইংলন্ডের বি.বি.সি এবং আমেরিকার পূর্ব-প্রান্তের নিউইয়র্ক থেকে পশ্চিম প্রান্তের এল. এ.—এস. এফ্. পর্যন্ত তাই দেখেছি। 'লিট্‌ল্ হাউস্ অন দ্য প্রেয়ারি' নামে একটা প্রোগ্রাম হয়—সপ্তাহে পাঁচদিন, শনি-রবি বাদে। দৈনিক একঘণ্টা করে। না হোক্ গোটা বিশেক কাহিনি আমি দেখেছি—প্রায় প্রতিটি অনবদ্য। যেমন কাহিনি, তেমন অভিনয়, ফটোগ্রাফি, পরিচালনা। ছোট বড় সবাই সমান আনন্দ পায়। বাংলা ছায়াছবি 'পরিবর্তন' মনে পড়ে? অথবা সে আমলের সি.এল.টি.-র অনুষ্ঠান। অনেকটা সেই ধরনের। মানবিক মূল্যায়ন চিন্তার খোরাক জোগায়; শিশু-কিশোর বয়স্কদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। কলকাতা দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ যদি 'আই ল্যভ্ লুসি'র ধাষ্টামোতে ক্ষান্ত দিয়ে এবার আমেরিকা থেকে ঐ সিরিজটা এনে দেখানো শুরু করেন তাহলে আমরা বুড়ো-বাচ্চা সবাই কেনা হয়ে থাকব। [সম্প্রতি একটি চিঠিতে অন্তরা তার দাদুকে জানিয়েছে—সানফ্রান্সিস্কো রেডিও স্টেশানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভারত সরকার 'লিটল হাউস অন্ দ্য প্রেয়ারি' সিরিজটা দিল্লি দূরদর্শন থেকে দেখানোর ব্যবস্থা করতে চলেছেন। কলকাতায় কি এটা হয় না? আপনারা 'দর্শকের দরবারে'-তে একটু লেখালেখি করে দেখুন না।]

তাই মনে হয়—বাঙলা ভাষাটা না শিখলে ওরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিশু-সাহিত্য, সঙ্গীত কোনক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে থাকবে না। ওদের জন্য কী জাতের ব্যবস্থা হয়েছে তার দু-একটা নমুনা শোনাই :

আমার মেয়ের বাড়ির পিছনে—মানে, সানফ্রান্সিস্কো বে-এরিয়ার ওয়ালনাট ক্রীকে একটি পার্ক আছে : লাকি পার্ক। সেখানে আছে একটি 'পেট লাইব্রেরী'। অর্থাৎ সেখানে আলমারির থাকে বইয়ের পরিবর্তে ঘর ভর্তি জীবজন্তু। বিভিন্ন খাঁচায়। শিশু-কিশোর- কিশোরীরা তার মেম্বার হতে পারে—অভিভাবক দায়িত্ব নিলে। সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে বাচ্চাকে নিয়ে তার অভিভাবক (ইউজুয়ালি মম্‌স্, ফর রিজন্স ইউ ক্যান ওয়েল গেস্) হাজির হয়। খাঁচা-সমেত একটি জীবকে নিয়ে যায় বাড়িতে। গ্রন্থাগারিক—থুড়ি, জীবাগারিক একটা কার্ড ধরিয়ে দেয়—তাতে লেখা আছে ঐ জীবটা কী খাবে, কতটা খাবে, নাইবে কি না, কীভাবে খাঁচা সাফা রাখতে হবে, ইত্যাদি। এ-ছাড়া ঐ বিশেষ জীবটির সম্বন্ধে ছোটদের উপযোগী করে লেখা বিচিত্রিত তথ্য। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে তারা থাকে, মাপে কত বড় হয়, কোন সময়ে বাচ্চা পাড়ে, কী তাদের বৈশিষ্ট্য, এন্‌ডেঞ্জার্ড স্পেসিস্ কি না। পরের শতাব্দীতে এন্‌ডেঞ্জার্ড হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে কি না ইত্যাদি। জীবটি পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, মাছ-সরীসৃপ অনেক কিছু

হতে পারে। সাতদিন পরে সেটাকে বদলে—আমরা যেমন লাইব্রেরী থেকে বই বদলে আনি—অন্য একটি জীবকে নিয়ে আসতে হবে। সাতদিনের চেয়ে দেরি করে ফেললে ফাইন দিতে হয়—সেটা ঐ জীবাগারের সঞ্চয়ের খাতে জমা পড়ে। একই বই যেমন রি-ইস্যু করা চলে সেভাবে একই জীবকে সাতদিনের বেশি সচরাচর রাখতে দেওয়া হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়, যেমন ধরুন আপনি আপনার বাচ্চাকে দেখাতে চান 'ককুন থেকে কীভাবে শুঁয়োপোকা হয়' অথবা 'শুঁয়োপোকা হয় প্রজাপতি'। সচরাচর কেন অনুমতি দেওয়া হয় না তার কারণটা বোঝা যাবে একটা ঘটনা থেকে। বুলবুল, মানে অন্তরার মা আমাকে বলল ওর সামনে এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাচ্চার ইস্যু করা জীবটাকে আরও এক সপ্তাহ রাখতে চাইলেন। সেটা কী ছিল—কাঁকড়া-কাছিম-মাকড়শা, অথবা চিংড়ি গিরগিটি-ইঁদুরছানা—তা ওর মনে নেই। জীবাগারিক মহিলাটি (সচরাচর কলেজের ছাত্রী—বায়োলজির, পার্ট-টাইম করতে এসেছে) জানতে চাইলেন : কেন?

বাচ্চার মা হেসে বললে, আমার খোকন বোধহয় ওটার প্রেমে পড়ে গেছে; আরও সাতদিন রাখতে চায়।

জীবাগারিক কিন্তু হাসল না। গম্ভীরভাবে বলল, সরি! ঠিক ঐ কারণে ওটাকে রি-ইস্যু করা চলবে না। আমরা চাই—নেক্সট-জেনারেশান আমেরিকান জীবপ্রেমিক হয়ে উঠুক। নিজের কুকুর-বেড়াল-খরগোশকে কে না ভালোবাসে? আমাদের উদ্দেশ্য—ওদের শেখানো : জীবজন্তুকে ভালোবাসতে। জীবনকে।

দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা বুলবুলের পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ।

বছর দু-তিন আগেকার কথা। অন্তরার মা সেবার কলকাতায় আসবে। অন্তরার বাবা ছুটি পেয়েছে। টিকিট কাটা হয়েছে, প্লেনে রিজার্ভেশান হয়েছে, বাঁধাছাদা সারা। তারপর বুলবুল গেছে অন্তরার স্কুলে, মেয়ের জন্য ছুটির দরখাস্ত নিয়ে। ক্লাস-টিচার সব শুনে বললেন, সরি! মিড-সেশনে দু-মাসের ছুটি স্যাংশান করানো যাবে না।

বুঝুন কাণ্ড! অন্তরা নার্সারী স্কুলের প্রথম ধাপের ছাত্রী।

কিন্তু তাহলে কী হয়, স্কুলটা হচ্ছে পাব্‌লিক স্কুল। প্রাইভেট নয়। অর্থাৎ এক সেন্ট খরচ নেই। নাম কাটিয়ে নিয়ে এসে আমেরিকায় আর কোনও পাব্‌লিক স্কুলে ভর্তি করা মুশকিল। আর প্রাইভেট স্কুল মানেই এক কাঁড়ি ডলার। তাও ও-পাড়ায় ভালো স্কুল নেই। বুলবুল ওদের প্রিন্সিপাল-এর কাছেও দরখাস্ত করল। তিনি বললেন, ক্লাস টিচার ঠিকই বলেছেন, মিড-সেশানে দু-মাস ছুটি দেওয়া সম্ভব নয়। যা হোক, তুমি কাল এস। কী স্থির করলাম জানাবো।

সে-রাত্রে অন্তরার ড্যাড আর মম্ কোন ভাষায় এবং কী জাতের বিশ্রম্ভালাপ করেছিল ঠিক জানি না। কিন্তু দুজনে যে সিদ্ধান্ত নিল তার ফলে পর দিন বুলবুল দুরুদুরু বুকে মেয়ের স্কুলে এসেছিল—প্রয়োজনে নাম কাটিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুতি হয়েই। প্রিন্সিপাল ওকে বললেন, 'আয়্যাম সরি, তোমার মেয়ের ছুটির স্যাংশন করা

গেল না। কারণ ওকে আমরা একটা স্টাডি-ট্যুরে ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই খাতাখানা ধর। অন্তরা যেন ফিরে এসে তার প্রজেক্ট রিপোর্ট সাব্‌মিট করে।

ভদ্রমহিলা একখানা খাতা বুলবুলের হাতে ধরিয়ে দিলেন। তাতে ছক কাটা আছে। ছাত্রী কবে কোথায় গেল। কী কী দেখল। সেখানকার মানুষজন কী পোশাক পরে, কোন ভাষায় কথা বলে, দেশটা গরম না ঠান্ডা, জীবজন্তু, ফুল-ফল, পোকা-মাকড় কী কী দেখল। পত্রিকা অথবা পিক্‌চার পোস্টকার্ড কেটে কেটে খাতাখানা ভর্তি করতে হবে, এবং ছবির ক্যাপশান সন-তারিখ সাজিয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে দুর্গাপূজার ছবি ও বর্ণনা। সে নানান বায়নাক্কা।

খাতাটা আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। বস্তুত নাতনিকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতেও হয়েছে। ছাপানো বা সাইক্লোস্টাইল করা প্রশ্ন নয়। টাইপ করা। আমার আন্দাজ—অন্তত ঘণ্টা দুই ব্যয় করেছেন ভদ্রমহিলা ঐ খাতার প্রশ্নাবলী ছকতে এবং টাইপ করে স্টেপল করতে।

এই মওকায় আরও একটা মজার কথা বলি। খাতায় ও একটি প্রসেশনের ছবি সেঁটেছিল। ইন্দিরা গান্ধীর শোভাযাত্রা। আমাকে অন্তরা ডেকেছিল ঐ ছবির উপযুক্ত একটা ক্যাপশান তৈরি করার প্রয়োজনে। ইন্দিরা গান্ধী লোকটি কে বোঝাতে আমি Politician শব্দটা ব্যবহার করেই থম্‌কে যাই। অতটুকু বাচ্চার পক্ষে শব্দটা অত্যন্ত ভারী। তবে যে মেয়ে halloween, pumpkinpie অথবা zombie শব্দের অর্থ জানে সে কি এই শব্দটার অর্থ জানে না? তাই ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি জানো—'পোলিটিশিয়ান' কাকে বলে?

ঘাড় নেড়ে জানালো, সে জানে।

প্রশ্ন করি, বলত, কাকে বলে 'পোলিটিশিয়ান?'

জবাবে অন্তরা তার দাদুকে 'রাজনৈতিক নেতা'র যে প্রাঞ্জল সংজ্ঞার্থ দাখিল করেছিল তেমন প্রাণ-জল ডেফিনিশান ওর দাদুও মাথা খাটিয়ে পয়দা করতে পারত না : A politician is one who, says, "Follow me, or else you'll be in trouble". [রাজনৈতিক নেতা তাকেই বলব যে বলে, 'আমার পিছু-পিছু এস নইলে গভীর গাড্ডায় পড়বে'।]

বুঝুন কাণ্ড! অন্তরা এ-কথা বলেনি যে, রাজনৈতিক নেতা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে জনগণকে গভীর গাড্ডায় পতন থেকে রক্ষা করে; অথবা জনগণ ঐ নেতার পিছু-পিছু না গেলে গভীর গাড্ডায় পড়বে! যেন রাজনৈতিক নেতাদের সে ঐ পাঁচবছরেই অস্থিতে-অস্থিতে সম্‌ঝে নিয়েছে।

অন্তরার চেয়ে অনেক উঁচু ক্লাসে পড়ে এমন আট-দশ-পনেরো বছরের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি—তাদের পড়ার চাপ যথেষ্ট। রাত জেগে তাদেরও প্রজেক্ট-ওয়ার্ক করতে হয়; কিন্তু স্কুল-প্রতিষ্ঠান অথবা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর

বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ প্রায় শোনাই যায় না। তার একটা কারণ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটা একটু অন্য ধরনের। টিচার যেন বিগ-ব্রাদার অথবা এল্ডার-সিস্টার। বন্ধু স্থানীয়। এখানেও কি তা হয় না? হয়। শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলে হার্দিক সম্পর্কটা মনে হয় একটু বেশি আন্তরিক—যেটা ক'লকাতায় অপেক্ষাকৃত কম। আমি যখন ত্রিশের দশকে আসানসোল ই. আই. আর. স্কুলে পড়তাম তখন আমাদের হেডমাস্টার মশাই ৺হরিদাস গোস্বামীকে দেখেছি প্রতিটি ছাত্রের পিতৃ-পরিচয় জানতেন—বোধকরি তারা কী দিয়ে ভাত খেত তাও। অন্যান্য শিক্ষকদের শুধু ভয় বা শ্রদ্ধা করতাম না, ভালও বাসতাম। পড়াশুনার বাইরে যে খেলতে পারে, গান গাইতে পারে বা কবিতা লেখে তারা মাস্টার মশাইদের কাছে উৎসাহ পেত। এখন— বিশেষ করে শহরাঞ্চলে শিক্ষায়তনগুলি হয়ে উঠছে 'পাশ-করানোর ফ্যাক্টারি'। বিশেষ করে নাম করা ইস্কুলগুলো। ক্লাস-ওয়ানে হাজার-দেড়-হাজার কাঁচামাল আসে—ওঁরা ছাঁটতে-ছাঁটতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যে 'ফিনিশড্-গুড্স্'-দের পাঠান তাদের স্বীকায় চিন্তাও 'ফিনিশড্'! হয়তো তার হেতু হিমালয়ান্তিক সিলেবাস; হয়তো বা মা ষষ্ঠীর অকৃপণ দয়া, অর্থাৎ ভালো স্কুলের চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাধিক্য। অবস্থা দিনকে-দিন সঙ্গীন হয়ে উঠ্ছে। একবার দশ ক্লাস, একবার এগারো; এই শুন্ছি 'অংরেজি হঠাও', পরক্ষণেই 'অংরেজি-কো-পাকড়ো'! বছরের পর বছর যা বাড়ছে তা শুধু সিলেবাস-এর আয়তন এবং ওজন। ছেলেমেয়েরা ডানে-বাঁয়ে তাকাবার সুযোগ পায় না। স্কুলের পড়া তৈরি করতেই বেচারিরা ভারবাহী বলদের মতো ঘাড় গুঁজড়ে পড়ে। ওরা টি-ভি দেখে না, সিনেমা দেখে না—দেখে শুধু সরষের ফুল : পরীক্ষাতঙ্ক!

নাতনির প্রসঙ্গ ছেড়ে আমার ছোট মেয়ে মৌ-এর কথা বলি। সে পড়ত মধ্য কলকাতার একটি নামকরা ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে। পড়ার বইয়ের মলাট-টু-মলাট তাকে শুধু মুখস্থ করতে বলা হত। মাধ্যমিকে যে প্রশ্ন কস্মিনকালেও আসে না তাও তাকে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করতে হত : "আইজল ছাড়া মিজোরামের তিনটি প্রধান শহরের নাম লিখ।"

অথচ মাধ্যমিক-পাস ছাত্র-ছাত্রী জানে না—লিংকল্ন্—লাওৎসে—বিতোফেন—ভলতেয়ার-এর নাম কী জন্য স্মর্তব্য। কারণ তা মাধ্যমিক সিলেবাসে নেই! ক্লাসে যা নোট লেখানো হয়, মানে বইতে যা লেখা আছে তাই ক্রমাগত কণ্ঠস্থ করে যেতে হবে! তার বাইরে পা-দেওয়া মানা!

একটা উদাহরণ দিই :

মৌ-এর স্কুল-জীবনের ঘটনা। ক্লাস নাইনে ওদের একটা প্রবন্ধ এসেছিল পরীক্ষাতে : "তোমার দেখা একটি খেলা।"

মৌ খেলার ধারে-কাছে থাকে না। টি-ভি-তে ভারত যখন ওয়ান-ডে-ক্রিকেটে হ্যাভক্ করছে তখনও সে গরহাজির। ফুটবল সম্বন্ধে এটুকু জ্ঞান সে অর্জন করেছে—'মোহনবাগান' ঘটিদের আর 'ইস্টবেঙ্গল' বাঙালদের টীম। আর, ও হ্যাঁ, নাম শুনে সে

বলতে পারে 'মহামেডান স্পোর্টিং' মুসলমানদের ফেভারিট টীম। ব্যস্। এটাই তার খেলার জগতের জ্ঞানসীমার শেষ-প্রান্ত। কিছুটা স্বভাবগতভাবে সে ক্রীড়াবিমুখ, কিছুটা পড়ার চাপে, কিছুটা বা ঘনবসতি এলাকায় বাস করার জন্য। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নটা দেখে তার মাথায় একটা জবর গল্পের প্লট এসে গেল। বাপকো বেটি! তাই অপর দুটি অল্টার নেটিভকে এড়িয়ে সে ঐ প্রশ্নটাকেই আক্রমণ করে বসে।

যে ভাষায় প্রবন্ধটা সে লিখেছিল তা হুবহু অনুলিখন করতে পারব না। আমার বর্ণাশুদ্ধি প্রুফ-রীডার সামলে নেবেন, মৌ-য়েরটা সামলানো যায়নি। তবে মোটামুটি সে যা লিখেছিল তা এইরকম :

খেলাধুলার দিকে আমার তেমন ঝোঁক নেই। খেলার মাঠই নেই এ তল্লাটে। তাছাড়া ফ্রক ছাড়ার পরে ওসব হুটোপুটি করার অবকাশই কি ছাই পেয়েছি? নিজে খেলি না, তাই খেলা দেখতেও যাই না। তবে কথা যখন উঠল তখন আমার দেখা একটা খেলার গল্প আপনাদের শোনাই :

একতলায় আমার পড়ার ঘরে টেবিলের সামনে একটা বড় জানলা। পড়তে বসলে রাস্তার একটা খণ্ডাংশ নজরে আসে। তাতে মন বিক্ষিপ্ত হয় বলে একটা সবুজ রঙের পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। আবার একনাগাড়ে পড়তে পড়তে যখন ক্লান্ত লাগে তখন পর্দা সরিয়ে ঐ একমুঠো বাইরের দুনিয়াকে দেখে নিই।

রাস্তার ওপাশে একটা উদ্‌বাস্তু বস্তি। প্রায়ই নজরে পড়ে মুন্নি তার ন্যাকড়ার পুতুল নিয়ে নিমগাছটার তলায় বসে পুতুল খেলছে। ছেঁড়া ফ্রক, তৈলতৃষিত একমাথা ঝাঁকড়া চুল। হাতে-পায়ে খড়ি-ওঠা দাগ। মুন্নি ঐ বস্তির একটা বাচ্চা মেয়ে। বছর ছয়েক বয়স। ডালডা-কৌটার ঢাক্‌নি ওর থালা, নারকেলের মালা ওর কড়াই, ধুলোবালি ওর চাল-ডাল। মুন্নিরা ছয় ভাই বোন। ছোট ভাইটাকে কোলে নিয়ে সে আপনমনে তার ঘর-করনা করে।

আমার মনে পড়ত নিজের ঐ বয়সটার কথা। আমার ছিল বড় বড় অনেকগুলো কলের পুতুল। বাবা জাপান থেকে এনেছিল। ওঁয়া-ওঁয়া ডাকত, পেট টিপলে। শুইয়ে দিলে চোখ বুজত। মুন্নির পুতুল ন্যাকড়ার।

একদিন মুন্নি বসে পুতুল খেলছে, হঠাৎ খাপরা টালি-ঘরের ভিতর থেকে মুন্নির মা হাঁক পাড়ল। মুন্নি তার পুতুলটাকে গাছতলায় শুইয়ে রেখে একছুটে ঢুকে গেল ওদের দরমা-ঘেরা ছাপরায়। আমার মাথায় হঠাৎ একটা দুষ্টুবুদ্ধি এল। চুপি চুপি ওর পুতুলটাকে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখলাম। একটু পরে ফিরে এল মুন্নি। অবাক হল। ইতিউতি খুঁজল। তারপর কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল হঠাৎ। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলে, দিদিমণি, আমার ছুটকিরে দেখিছ? এ্যাইমাত্তর শুইয়ে দে গেলাম, দ্যাখ্-না-দ্যাখ্ কই চলি গেছে!

আমি অবাক হবার ভান করে বলি, তোর সেই ন্যাকড়ার পুতুলটা? ছুটকি? না, দেখিনি তো!

—দ্যাহেন দেহি কাণ্ড! পই-পই করি মানা করি : ছুট্‌কি! এমন বেভ্‌ভুল হয়ি উথাল-পাথাল রাস্তা পার হস্‌নি! কোনোদিন মটোরচাপা পড়ি মরবি-অনে—

ঠিক যে ভাষায় ওর মা ওকে বকে! আমি কতদিন শুনেছি। বল্‌তে বলতে বেচারির চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে! আমি তাড়াতাড়ি বলি, এই মুন্নি এদিকে শোন?

চোখ মুছতে মুছতে আমার জানলার তলায় এসে দাঁড়ায় : কী?

—তুই আমার এই ডল পুতুলটা নে বরং। আমি তো আর আজকাল পুতুল খেলি না, পড়েই আছে বাক্সে।

জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে জাপানি পুতুলটা নিল। নেড়ে চেড়ে দেখল। অনেকদিনের অনভ্যাসে জঙ ধরায় পুতুলটা আর ওঁয়া-ওঁয়া করে না। তবু এখনো সে নিখুঁত মেম-পুতুল। মুন্নির কিন্তু কি জানি কেন পছন্দ হল না। পুতুলটা ফেরত দিয়ে বললে, আমার ঘরে কি এ্যারে মানায় দিদিমণি? গাছতলায় শুলে নিমুনি হয়ে মরবে অনে।

মুন্নির দাদা অল্পদিন আগে নিমুনিয়ায় মারা গেছে। অতটুকু ঘরে তার ঠাঁই হত না; সে কম্বল মুড়ি দিয়ে গাছতলায় খাটিয়া পেতে শুতো।

বাধ্য হয়ে বার করে দিতে হল ওর সেই ন্যাকড়ার পুতুলটাকে। ওর হাতে দিয়ে বলি, দেখছিস্ মুন্নি! ছুট্‌কিটা কী দুষ্টু হয়েছে! আমার টেবিলের তলায় লুকিয়ে বসে আছে।

মুন্নি ল্যাগব্যাগে বাচ্চাটাকে ফেরত পেয়েই দুচ্চার থাপ্পড় কষালো! আবার বুকে চেপে ধরে সোহাগও করল। আমি পর্দাটা টেনে দিয়ে পড়ায় মন বসাবার চেষ্টা করি।

এখানেই 'আমার দেখা একটি খেলা' শেষ হবার কথা। কিন্তু এই সুবাদে আর একদিন দেখা আর একটা খেলার কথা মনে পড়ছে। না কি ও-দুটো পৃথক নয়? একই খেলার এপিঠ-ওপিঠ?

ঐ ঘটনার মাসতিনেক পরে মটোর চাপা পড়ে মুন্নি মারা যায়। বোধকরি সে বেভ্‌ভুল হলে উথাল-পাথাল রাস্তা পার হচ্ছিল। ছয়-ছয়টা পেটের একটা কমল—কোথায় ওর মার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়বে, তা নয়—গভীর রাত্রে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করতে করতে কখনো পর্দাটা সরিয়ে বাইরে তাকালে নজরে পড়ত নিমগাছ তলায় মুন্নির মা বসে আছে উদাসীন বাওয়ার মতো! আমি তাড়াতাড়ি পর্দাটা টেনে দিতাম। ভয় হত—কী জানি ও যদি এগিয়ে এসে জানতে চায় : 'আমার মুন্নিরে দেখিছ দিদিমণি? এ্যাই-মাত্তর শুইয়ে দে-গেলাম, আর দ্যাখ-না-দ্যাখ কোই চলি গেছে।'

মৌ সেবার বাংলা-পরীক্ষায় টায়ে-টায়ে পাশ করে। কারণ প্রবন্ধ-প্রশ্নে সে কুড়ি নম্বরের ভিতর পেয়েছিল চার। বোঝার উপর শাকের আঁটি—মার্জিনে লালকালিতে মন্তব্য : "ক্লাসে যা নোট দেওয়া হয় তা শোনা হয় না কেন?"

পরে জেনেছি, ওদের ক্লাসে ঐ প্রবন্ধটা লিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল—বাস্কেটবল না ভলিবল তা আমার মনে নেই।

এখানে স্কুল কর্তৃপক্ষ চান ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট—স্কুলের, ইন্ডিভিজুয়াল ছাত্রছাত্রীর মানসিক বিকাশ নয়! তাই ওঁদের মূলমন্ত্র ক্রমাগত মুখস্থ করানো : তট-তট-তট তোটয়ঃ; স্কট-স্কট-স্কট স্কোটয়ঃ, ঘূণ-ঘূণ-ঘূণ ঘূণাপয়ঃ!

বিদেশে বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে এ-জাতীয় প্রতিযোগিতা নেই। তাদের লক্ষ্য প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর অ্যাপ্‌টিচুড হিসাবে বিকাশ। প্রকাশ নয়, বিকাশ। তাই বিশ্বাস করতে মন চায়—বাংলা-ভাষাটা না শিখলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-খেলাধুলা—কোনো বিষয়েই ওদের কোনো খামতি হবে না। তবু মনে হয়, হয়তো না সত্ত্বেও কারও কারও মনের কোঠায় কী একটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে। বড় হয়ে নিজেকে হঠাৎ হয়তো একদিন নিরবলম্ব মনে হবে। ভাবতে বসবে : আমি না-ঘরকা, না-ঘাটকা!

সবারই যে হবে এমন কথা বল্‌ছি না। কিন্তু একটু ভাবপ্রবণ অভিমানী মানুষের হয়তো তাই মনে হবে। আফটার অল ধমনীর রক্তটা যে অভিমানী বাংলা-মায়ের।

বাংলা-মায়ের আঁচলের খুঁট খুলে ঐ যে একমুঠো জুঁই ফুল স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে গেছে অতলান্তিক অথবা প্রশান্তের ওপারে—ওদের জন্য প্রয়োজন দুটি জিনিস—

: ডানা আর শিকড়!

ওরা আলট্রামেরিন—থেকে—কোবাল্ট-ব্লু-রঙা অজানা আকাশে রামধনুর সাতটা রঙ খুঁজতে অ্যালবাট্রসের মতো ভাসতে চায়—তাই ওদের একজোড়া ডানা চাই। ওরা কালবৈশাখীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঁশঝাড়ের মতো লুটোপুটি খাবে, কিন্তু ভেঙে পড়বে না—তাই চাই শিকড়টাও।

যে ঘাটে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকেছে সেখানে সহজেই ওরা জোগাড় করবে এক জোড়া ডানা : Wings! পক্ষিরাজের পরিবর্তে স্পেস্‌-শাট্‌ল্‌। উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, সুকুমার রায়ের নাগাল ওরা পাবে না—পরিবর্তে পাবে হ্যান্স অ্যান্ডারসন, গ্রীম্‌স্‌ ভাইদের, লুই ক্যারলকে! কঙ্কাবতীর পরিপূরক ডিজনীর ওয়ান্ডারল্যান্ডের অ্যালিস্‌; কুঁচবরণ রাজকন্যার বদলে স্নো-হোয়াইট, সিন্ডেরেলা।

কিন্তু : Roots?

সেটা ওদেশে পাওয়া যায় না। সেটা যোগান দেবার দায় আপনার-আমার।

বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন আমাকে দু-দুটো বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। একটা বালখিল্যদের, একটা তাদের ড্যাড-মম্‌দের উদ্দেশে। যে কথাটা সেদিন আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটাই সবিনয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আজ :

ইউরোপ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আফ্রিকা বা অন্যত্র আমাদের যে কয়েক হাজার নাতি-নাতনি ছড়িয়ে আছে—দিল্লি-বোম্বাই-মাদ্রাজ-বাঙ্গালোর ধরে যা নাকি কয়েক লাখ—তাদের জন্য 'শিকড়' যোগান দেবার দায়টা আপনার-আমার। বিদেশে ড্যাড-মম্‌ ওদের জন্য প্রাণপাত করছে। ক্রমাগত যোগান দিয়ে যাচ্ছে নানান-জাতের

'উইংস্'—মেকানো, লোগো, জিগ্স্-পাজ্ল। ভিডিও ক্যাসেট, মিনি কম্পিউটার—কী নয়? কিন্তু ওরা কিছুতেই খুঁজে পাবে না সেই শিকড়টা—যেটা বাঁশঝাড়কে ধুলোয় লুটিয়ে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ ঐ শিকড়টা ডলারের বিনিময়ে পাওয়া যায় না—জেম্কো সেফওয়ে, পে-লেস্, থ্রিফটি প্রভৃতি চেন-স্টোরে।

: Roots !

দুনিয়া ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। প্রত্যেক পরিবারেই খোঁজ নিলে দু-চার-জন নিকট-দূর আত্মীয় বন্ধুকে খুঁজে পাবেন যারা পরবাসী। তারা বিদেশ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে—'তোমার নাতি-নাতনির জন্য দু-একখানা সহজ বাংলা বই পাঠিয়ে দিও তো।' আপনারা তখনই কলেজ স্ট্রিট পানে দৌড়ান—দাদু-ভাই অথবা দিদি-ভাই-এর জন্য বইয়ের খোঁজে। বৎসরান্তে বুক-ফেয়ারে তল্লাশ করেন। মনে আনবার চেষ্টা করেন—বিশ-পঁচিশ বছর আগে ঐ দাদু-ভাই অথবা দিদি-ভাই-এর বাপ অথবা মা কোন্ বইটা পড়ত বুঁদ হয়ে। বই কিনে পাঠিয়ে দেন; সী-মেল-এ অথবা লোক মারফত। মনের চোখে দেখতে থাকেন দাদুভাই অথবা দিদিভাই টুমটুম হয়ে বসে বই পড়ছে—যেমন পড়ত ওর বাবা অথবা মা আপনার কোলে বসে। বাস্তবে কিন্তু তা হয় না; হবার সম্ভাবনা নেই। নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। অন্তরার জন্য আমি নিজেও এতদিন ঐভাবে বাংলা বই পাঠিয়েছি। চার মাস অন্তরার সঙ্গে ঘর করে এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি—ওভাবে হবে না। ওভাবে হবার নয়। অ্যাঁকাচোরা শহরে বদ্যিরা কেন আলু ভাতে খায় না এ নিয়ে ওদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। ওরা বরং জানতে চায়—Halloween Town-এ ডাক্তারেরা কেন পাম্পকিন-পাঈ খায় না।

ওদের জন্য নতুন করে লিখতে হবে শিশুসাহিত্য।

ভুল বুঝবেন না আমাকে।

ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত, ক্ষীরের পুতুল, ঠাকুরমার ঝুলি, টুনটুনির গল্প, আবোল-তাবোল, হ-য-ব-র-ল সব চাই; স—বই চাই; কোনোটাই বাদ যাবে না। কিন্তু সবার আগে ওদের ভাষাটা শেখাতে হবে।

জানি, শিক্ষাবিদেরা যে-কথা বলেন আমি তার বিপরীত কথা বল্‌ছি। কিন্তু বলছি কি সাধ করে? ঘটনাচক্র আমাকে যে ঘাড় ধরে বলাচ্ছে। আমি তো সাধারণ শিশুর কথা বলছি না, বলছি antipodesদের কথা। একটু বুঝিয়ে বলি :

মনস্তত্ত্ববিদ এবং শিক্ষাবিদেরা পরামর্শ দেন যে, জীবনের প্রথম ছয় বছর শিশুকে মাতৃভাষাতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ মানবজীবনের ঊষাকালে তাহলে শিশুকে একজোড়া বাধার বিরুদ্ধে লড়তে হয় না : বিষয়বস্তু ও ভাষা! মাতৃভাষাতে বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হলে শিশু দ্বিতীয় ভাষাটা আয়ত্ত করতে সুবিধা পায়। এজন্য ভারতীয় শিক্ষাবিদেরা অনেকে বলেন, শিশুকে প্রথম ছয় বছর মাতৃভাষায় শেখাও, তারপর হিন্দি বা ইংরেজির প্রশ্ন উঠবে। 'এ্যান্টিপডে'র দেশে সবই যে উল্টো। আগেই বলেছি—মাতৃভাষা মায়ের জাত-নির্ভর নয়, জিহ্বা-নির্ভর। ঘরে-বাইরে ক্রমাগত

ইংরেজি শোনার জন্য বাংলা ওদের মাতৃভাষা নয়। তাই ভাষার বাধাটা সরাতে না পারা পর্যন্ত, ওরা নিজে নিজে ঐ বইগুলো পড়তে না পারলে উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, অবনঠাকুর, সুকুমার রায়-এর বই ওদের কাছে পাঠানো অর্থহীন!

নাছোড়বান্দা ড্যাড-মম্ যদি রামায়ণ-মহাভারত পড়ে পড়ে শোনায় তাতে কাজ হবে যৎসামান্য। ওরা যদি প্রবাসী না হত তাহলে মুখে-মুখে অনেক কিছু শিখত। এমন কি ভাষাটা। দাদুর কাছে, দিদার কাছে, মাসি-পিসি, বাড়ির ঝিয়ের কাছে। দেওয়ালের পোস্টারে হত অক্ষর পরিচয়, বিদ্যাসাগরের মতো মাইলস্টোন দেখে শিখত এক-দুই-তিন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা হল না। ওরা যে পরিবেশে আছে তার ত্রিসীমানায় বাংলা নেই। স্কুলের আর পাঁচটা বাঙালি-বাচ্চাও ইংরেজিতে কথা বলে! এখানে যেমন ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়া বাচ্চা বাপ-মায়ের কাছে ধমক খায় সহপাঠীর সঙ্গে বাঙলায় কথা বললে, তেমনি ওরা ধমক খায় ইংরেজিতে গুজুর-গুজুর ফুশুর-ফুশুর করলে। মাঝে মাঝে ড্যাড অথবা মম্-এর বিবেক চাগা দেয়, টনক নড়ে। সপ্তাহান্তিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং বন্ধ রেখে খোকন অথবা খুকীকে টেনে নিয়ে বসে : লেটস্ সী হোয়াট হ্যাপ্‌ন্ড টু সীতা!

কিন্তু সীতা উদ্ধারের আগেই বেজে ওঠে টেলিফোন। রামায়ণটা বন্ধ করে ছুটে গিয়ে বলতে হয় : হা-ঈ! সো ইউ হ্যাভন্ট কম্‌প্লিট্‌লি ফরগট্‌ন্ আস্, ইট সীম্‌স্!

উপায় নেই। ওদের সময় বড় কম। আর সাতদিন অন্তর প্রতি রোব্বারে চেষ্টা করলে একটা বিদেশি ভাষাকে আয়ত্ত করা শক্ত। বিদেশি বইকি। একেবারে পৃথিবীর ও-প্রান্তের একটা ভাষা।

এমন ব্যবস্থা করা চাই যাতে বাচ্চারা নিজে নিজেই ভাষাটা শিখতে পারে। অনেকের আন্তরিক ইচ্ছা আছে; কিন্তু ড্যাড-মম্ সময় পায় না। কীভাবে ওদের সাহায্য করা যায়?

প্রথম কাজ : ওদের জন্য নতুন করে লিখতে হবে একখানা 'প্রথম ভাগ' অথবা 'সহজ পাঠ'।

খেয়াল রাখতে হবে—তালগাছকে ওরা এক পায়ে খাড়া থাকতে দেখেনি, দেখেছে পাইনকে। 'শরৎ' মানে 'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, গেঁথেছি শেফালি মালা' নয়, 'শরৎ' মানে ফল-কালারের মরশুম। পাতা ঝরার দিন। 'হ্যালোঈন'-এর ভূত সাজার দিন। পৌষ ওদের 'আয় আয়' বলে ডাক দেয় না। ওরাই বরং পৌষকে 'যাও যাও' বলে তাড়াতে চায়। সোনার পৌষ-এর—সোনালি নয়—রুপোলি-রেখা সিলভার লাইনিংগুলো হচ্ছে : কৃস্‌মাস্, নিউ-ইয়ার, স্কেটিং-এর আনন্দ। পুকুরের দুই পারে দুই রুই-কাৎলা ভেসে ওঠার প্রশ্নই ওঠে না—কারণ মাছ বলতে ওরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোঝে গ্রসারির ডীপ্-ফ্রিজ সেক্‌টারে প্যাক-করা ক্যাট-ফিস্, সার্ডিন, স্যামন। খেয়াল রাখতে হবে, 'অ'-য়ে অজগরের বদলে 'অক্টোপাস' তেড়ে এলেও 'আ'-য়ে আমের বদলে 'আপেল' পেড়ে খাওয়া চলবে না। আজ্ঞে না, আদিম-মানবী ঈভ ঐ কুকর্মটি

করে ফ্যাসাদে পড়েছিল বলে নয়, ইংলিশ-মার্কিন উচ্চারণে 'আপেল' 'আ'-দিয়ে শুরু হয় না, সেটা 'এ্যাপ্‌ল্‌'। অক্ষরগুলো অচেনা—যে 'ইমেজারি'-র সাহায্যে সেই অচেনা অক্ষরকে চেনাতে বস্‌ব সেগুলো যেন 'এক্কাগাড়ি' অথবা 'ঋষিমশাই' জাতীয় দুর্লভদর্শন না হয়।

দ্বিতীয় কাজ : ঐ আজব পের্‌থমভাগটা লেখা শেষ হলে সেটা সৌমিত্র, দেবদুলাল, প্রদীপ ঘোষ, কিংবা খোদ শম্ভু মিত্তির মশায়ের নাকের ডগায় মেলে ধরা। বাবা-বাছা বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে বইটা ওঁকে দিয়ে জোরে জোরে পড়ানো। ঠিক তখন তাঁর নাকের ডগায় ধরে রাখতে হবে একটা মাইক্রোফোনের মাউথপিস। এট্টু দূরে বসে কেউ তালে তালে বাজাবে ফুলুট অথবা ব্যায়লায় ক্যাঁ-কো। পাঠক প্রতিবার পাতা ওল্টানোর সময় বলবেন : টার্ন ওভার।

তিন-নম্বর কাজ : বিদেশে প্রচার করা : ঐ আজব 'পেরথমভাগ-কাম-ক্যাসেট' কোনো ইন্ডিয়ান স্টোরে কিনতে পাওয়া যাবে। বিশ্বাস করুন, সব সহরেই আছে গুটি কয়েক ইন্ডিয়ান স্টোর—যেখানে পাবেন অমিতাভ বচ্চনের ভিডিও-টেপ, লতা মুঙ্গেশকরের ক্যাসেট, হিং-হল্‌ দি-পান-মশলা এবং বাসমতি দেরাদুন চাল। আর আছে বাঙলা পত্র-পত্রিকা। হয় ছাপা, নয়তো xerox! সর্বত্র—লন্ডন-পারী-নিউইয়র্ক-এস্‌-এফ- শিকাগো—কোথায় নয়? আমাদের সচরাচর মফঃস্বলী পত্রিকার মতো তাতে বর্ণাশুদ্ধি নেই, প্রবন্ধগুলি সত্যিই উচ্চমানের। স্তম্ভিত হতে হয় এদের উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠা দেখলে। অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার নাম ঠিকানা তো আমিই জানি। আমার বিশ্বাস, খরচ করে বিজ্ঞাপন দিতে হবে না শুধু সম্পাদককে চিঠি লিখে খবরটা জানিয়ে দিন। ঐ যারা বাচ্চাদের আ-ম্‌রি বাংলা ভাষাটা শেখাবার তাগিদে হর-হপ্তা একশ মাইল ড্রাইভ করে তারা ঐ বই-ক্যাসেট কিনতে দ্বিধা করবে না।

বইটার নাম? আজ্ঞে না, 'ঠাকুরমায়ের নয়া-ঝুলি' চল্‌বে না। প্রোষিত-নাতিকা ঠাম্মার প্রেম হোক না কেন হেড-ওভার-হীলস্‌! ঠাম্মা দূর অস্ত্‌—তাঁর ঝুলিতে ধূলি। বইটার নাম হোক : 'স্যান্টাক্লজের ঝুলি'।

ওরা বইটা নিয়ে ফায়ার-প্লেসের সামনে ক্যাসেট চালিয়ে বসবে। একা একা। ছবি দেখবে, পড়বে শুনতে শুনতে। পাতা ওল্টাবে সৌমিত্র অথবা শম্ভু মিত্তির মশায়ের কণ্ঠে 'টার্ন-ওভার' নির্দেশ পাওয়া মাত্র। অচেনা অক্ষরগুলো ক্রমে চেনা হয়ে আসবে। ঐ সঙ্গে অচেনা নামগুলো : অভিমন্যু-উত্তরা, লব-কুশ, হনুমান; কিংবা প্রহ্লাদ-ধ্রুব-নালক। জিহ্বার আড়ষ্টতা ক্রমশ ভাঙবে। ভারতকে ভারট্‌, বিদেশকে বিডেস, পিসেমশাইকে পিসেমোশাই বলবে না আর। কারণ ও উচ্চারণ তো সৌমিত্র তো কিংবা শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে শুনছে না বারে বারে। বইটা পড়ে পড়ে মুখস্ত হয়ে গেলে ড্যাড-মম্‌কে বলবে ইন্ডিয়ান স্টোর্স থেকে ঐ রকম আর একখানা বই নিয়ে আসতে। এভাবে দু-চারখানা বই শেষ করার পর নিজেরাই এসে দাঁড়াবে সেই অবাক দরজাটার সামনে। যেন রাঙা-ঘোড়ায় চড়া বীরপুরুষ! হাঁক পাড়বে : চিচিং ফাঁক! ধীরে ধীরে

খুলে যাবে পাষাণ দিয়ে গড়া পাল্লাটা। দেখা যাবে ভিতরটা। সূর্যের সোনালি আলোর ছোঁওয়ায় ঝলমল করে উঠবে বহু বছর ধরে সঞ্চয় করা সম্পদ। হীরে-মানিক-মণি-মুক্তো!

: ছোটদের রামায়ণ-মহাভারত, ক্ষীরের পুতুল, ঠাকুরমায়ের ঝুলি, আবোল-তাবোল, হ-য-ব-র-ল, টুনটুনির গল্প আরও কত মণি-মাণিক্য!

'রোজ কত কি ঘটে যাহা-তাহা, এখন কেন সত্যি হয় না আহা?'

জানি, আপনারা কী বলবেন!

বলবেন, বছর-দশেক আগেই, এই ষাটের-ঘাটেই আমাকে বাহাত্তুরেয় পেয়েছে।

অথবা বলবেন, একটু খোঁজ দিয়ে দেখোতো হে গুরুদেবের 'সহজপাঠ'কে লেঙ্গি মারার এই নয়া-প্যাঁচটা এ ভদ্রলোক কোথায় পেল? কার প্রেরণায় এমন বেসুরে গাইছে? কে ওকে দিয়ে এসব লেখাচ্ছে? সিয়া না কেজিবি? কঙ্গি না সিপিয়েম্?

বেশ, মশাই বেশ! মেনে নিলাম এ আমার আজব, অবাস্তব পরিকল্পনা। 'স্যান্টাক্লেজের ঝুলি-কাম-ক্যাসেট' একটা আকাশ কুসুম! হল তো?

তাহলে বলুন—আসন্ন বই মেলার প্রাক্কালে প্রকাশক মশাই আর শিশু-সাহিত্যিকদের প্রতি এই আমার সোচ্চার প্রশ্ন : সন্ধান দিন—পরবাসী লাখ্ লাখ্ নাতি-নাতনির অক্ষর পরিচয়ের জন্য কোন বইখানি খরিদ করব আমরা?

সংক্ষেপে : কোথায় পাব সেই শিকড়?

অবাঞ্ছিত

অনিন্দিতা বাসু

সাত নম্বর বাসটা থার্ড এভিন্যুর মোড়ে এসে থামল।

ধীরে ধীরে বাস থেকে নামলেন মিসেস্ বুদাকিয়েন। কুচো কাঠের টুকরো ভর্তি ভারী থলেটা নামিয়ে দাঁড়ালেন ফুটপাতে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর রাস্তার এদিক-ওদিক দেখে পার হলেন রাস্তাটা। ওপারেই ওঁর বাড়ি—সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওটার মুখে মনে পড়ল : মেলবক্স!

মিসেস্ বুদাকিয়েনের চিঠিপত্র আসে কদাচিৎ। অধিকাংশই বিজ্ঞাপন, 'সেল'-এর বিজ্ঞপ্তি। আর চিঠিলেখার মতো আপনজনই বা রইল কই? আজ সাত বছর হল তিনি বিধবা। একমাত্র ছেলে মারা গেছে তারও আগে। একমাত্র? হ্যাঁ! তাছাড়া কী? মেয়েটেয়ে তো হয়নি তাঁর। মাত্র তেইশ বছর বয়সে ক্রীস্টমাস-ঈভে কেইন মারা গিয়েছিল একটা মটোর দুর্ঘটনায়।

তবু দিনের শেষে মেলবাক্সটা যাদুর মতো আকর্ষণ করে যেন।

মিসেস্ বুদাকিয়েন চাবি ঘোরালেন। আজ ডাকে মাত্র তিনখানি চিঠি। প্রথমটা প্যাসিফিক্ গ্যাস্ অ্যাণ্ড ইলে্কট্রিক কোম্পানির বিল। আর দ্বিতীয়টা মনে হচ্ছে ওঁরই অফিসের পারসোনেল ডিপার্টমেন্ট থেকে। তৃতীয়খানা অচেনা হাতের লেখা—পেন্সেল্ভেনিয়ার ছাপ।

অ্যাপার্টমেন্টের চাবি খুলে ঢুকে জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দিলেন বুদাকিয়েন। মার্চ মাসের এই সময়টাতে অফিস থেকে ফিরে এলে তবু একমুঠো পড়ন্ত সূর্যের আলো পাওয়া যায়। মিসেস্ বুদাকিয়েন যতক্ষণ পারেন— যতটুকু পারেন, সেই দিনান্তের শেষ আলোটুকু গণ্ডুষভরে পান করেন। না হলে মনে হয় সারাটা দিন অফিসের ডেস্কের অন্ধকূপে হিসাবের খাতাতেই বিকিয়ে গেল বুঝি বা।

নাকি মনকে এভাবে বুঝিয়ে প্রকৃতি-প্রেমিক সেজে বুদাকিয়েন আসলে ইলেক্ট্রিক বিলের অঙ্কটা নামিয়ে আনতে চান? আগের মাসে সাতাত্তর ডলার বিল এসেছে, তার সবটুকু শোধ না হতেই আবার বিল এসে হাজির। যাক, সে চিঠি খোলার আগে কুচো-কাঠ বোঝাই থলিটা থেকে কাঠ গুঁজে দিতে হবে উড্-স্টোভটাতে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে যে কাঠগোলাটা পড়ে— পিয়ারসন্স লাম্বারইয়ার্ড—সেখান থেকেই ঝড়তি-পড়তি কাঠের টুকরো কুড়িয়ে থলিতে ভরে নিয়ে আসেন রোজ; ওরা কিছু মনে করে না, দামও চায় না। নিঃসন্তানা বিধবা বুড়িকে তারা অনেকদিন ধরেই চেনে।

উড-স্টোভটায় গন্‌গনে আগুন হয়েছে। এতেই বুদাকিয়েন রান্না করেন, ছোটখাটো জামা আগুনে শোকান, আবার এ আগুনে ঘরটাও গরম হয়। যতটা সম্ভব স্টোভটার কাছে এগিয়ে গিয়ে চিঠিগুলো একে একে খুলতে থাকেন।

পি. জি. এ্যান্ড ই-র এ মাসের বিল একশো-এক ডলারের।

পারসোনেল থেকে ওঁকে জানিয়েছে, মিসেস বুদাকিয়েন তাদের কোম্পানির এক বিশেষ গর্ব। তিনি যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে সুদীর্ঘ উনিশ বছর কোম্পানিকে নিরলস সেবা করেছেন এজন্য কোম্পানি কৃতজ্ঞ। কিন্তু বাজার এতই মন্দা যে, এ-হেন বুক্‌কিপার বুদাকিয়েনকে কোম্পানি আর্লি-রিটায়ারমেন্ট দিতে বাধ্য হচ্ছে। এজন্য তারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত। আর সেইজন্য সাধারণত যা দেওয়া হয় সেই দু-সপ্তাহের পরিবর্তে তাঁকে পুরো একমাসের সময় দেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি...

বুদাকিয়েন খোলা জানালা দিয়ে বিদায়কামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত। ইদানীং অফিসের অবস্থা দেখে আশঙ্কা একটা ছিলই; তবে কেমন যেন বিশ্বাস হত না। শেষ পর্যন্ত মিসেস্ বুদাকিয়েন! তিনি যে ভূষণ্ডী কাকের মতো ওই টেবিলের প্রান্তে বসে বসে দেখেছেন—কত-কত ম্যানেজার বদল হতে, এমন কি কোম্পানির মালিকানা পর্যন্ত হস্তান্তরিত হতে! অফিসঘরের ওই টেবিলটা যে ছিল তাঁর দ্বিতীয় সংসার। অফিসের মানুষগুলো স্যেরা, মেলনী, ডেভিড, সবাই তো তাঁর সন্তানের মতো।

বুদাকিয়েন চোখ থেকে চশমাটা খুলে ঝাপ্‌সা হয়ে যাওয়া কাচ দুটো মুছলেন।

তারপর খুলে ফেললেন তৃতীয় চিঠিখানা। অপরিচিত হস্তাক্ষর। ডানদিকের কোণে তারিখ পড়েছে দিন-চারেক আগেকার। লেটার-হেডে লেখা চিঠি। নামটা পড়েই চম্‌কে উঠলেন বুদাকিয়েন!

পয়লা মার্চ
অ্যালেন টাউন, পেনসেলভেনিয়া

ডিয়ার মিসেস বুদাকিয়েন,

তুমি এ চিঠি পেয়ে নিশ্চয় খুব অবাক হয়ে যাবে। এবার ক্রিস্টমাসের সময় অ্যান্টিক ঝাড়াপোছা করতে করতে আমার মায়ের একটা পুরাতন ডায়েরি খুঁজে পেয়েছিলাম। সেটা প্রায়ই আমারই বয়সী। তা থেকেই তোমার নাম ও ঠিকানা পেয়েছি। মিসেস্ ভ্যানগলভার, আমার মা, গত উইন্টারে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন চিরদিনের মতো। তুমি হয়তো জান না। আর 'পা' তো তার অনেক আগেই গেছেন।

যাই হোক, মার্চের একুশ তারিখ শুক্রবার, আমি বার্কলে ইউনিভার্সিটিতে একটা বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছি। [এখানে মিসেস্ বুদাকিয়েন চিঠিপড়া বন্ধ রেখে লেটার-হেডের ছাপা অংশটুকু আবার পড়লেন। না, জনাথনের নামের পূর্বে ডক্টর বা প্রফেসর, কিংবা নামের পরে কোনও উপাধি-চিহ্ন নেই। একটু অবাক হলেন উনি। এমন উপাধিবিহীন কেউ তো বার্কলেতে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পায় না] বেলা তিনটে থেকে পৌনে চারটে আমার লেকচার। আন্দাজ চারটের সময় বক্তৃতা মঞ্চ থেকে

বাইরে বেরিয়ে আসব। বক্তৃতাটা হচ্ছে ক্লকটাওয়ারের নিচে মেন-অডিটোরিয়ামে। আমার বক্তৃতার বিষয় নিউক্লিয়ার-ফিজিক্স। নিতান্ত নীরস বক্তৃতা—না হলে তিনটের সময়েই তোমাকে আসতে বলতাম। আমি একাই যাচ্ছি—মেলিসা বা জসূয়ারা যাচ্ছে না ...ও! আয়াম সরি! তুমি তো ওদের চেনই না। মেলিসা আমার স্ত্রী, আর জসূয়া আমার পুত্র; তার একটি দিদিও আছে—কোয়েল।

"আমি তোমাকে চিনতে পারব না। কিন্তু তুমি পারবে। না হয় গেটে নিজের পরিচয় দিয়ে বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও।

"আর কিছু নয়, তোমাকে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে। দু-দণ্ড কথা বলতে ইচ্ছে করছে। জানি না, এ চিঠি তোমার হাতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছাবে কিনা। সাঁইত্রিশটা বছর সচরাচর মানুষে একই ঠিকানায় থাকে না তো।

ইতি

জনাথন ভ্যানগলভার।"

জনাথন! ওটা কী বললে? নেহাৎ যদি তোমাকে না চিনতে পারি তাহলে অডিটোরিয়ামের গেট-এ নিজের পরিচয় দেব? কিন্তু কী পরিচয় দেব? তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? কী বলব?

..."আর কিছু নয়, ওকে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে?"

ফর্‌ফর করে স্মৃতিগ্রন্থের একগাদা পাতা উল্টে গেল। ফিরে গেলেন সাঁইত্রিশ বছর আগেকার জীবনে। যখন এই বৃদ্ধা ছিলেন বিশ-বাইশ বছর বয়সের নবীন ঘরণী।

তোমাকে চিনতে পারব না জনাথন? তুমি যে ঠিক তোমার দাদার মতো দেখতে ছিলে। এই সাঁইত্রিশটা বছরে কতটা বদলেছ তুমি? তোমাতে-আমাতে মাত্র একবারই সাক্ষাৎ হয়েছে—মেটার্নিটি ওয়ার্ডে। তুমি তখন সদ্যোজাত শিশু। সেই প্রথম ও শেষ সাক্ষাতে তোমার ছোট্ট শরীরটা আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করেছিল। সুযোগ হয়নি। নার্স সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, 'It's a boy! Did you two decide on any name yet?'

আমি ঠোঁট কামড়িয়ে চোখের জলটা সামলাবার চেষ্টা করেছিলাম। প্রসবের পরেও যে প্রসব-যন্ত্রণা থেকে আমার মুক্তি হয়নি। তোমার-আমার যে দু-দুবার নাড়ি কাটার আয়োজন!

নার্স বলল, একটা মিষ্টি নাম দিও ওর। ভা-রি মিষ্টি হয়েছে দেখতে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলি, তুমি হয়তো জান না, হাসপাতালের সঙ্গে আমরা ব্যবস্থা করে রেখেছি। He'll be adapted, and his foster parents would give him a name!

'রূপ' দেয় মা, 'নাম' দেয় যার নাম দেবার অধিকার।

পরে জেনেছি—ওরা তোমার নাম দিয়েছিল : জনাথন।

তোমাকে দেখতে—জানলে জনাথন—ঠিক তোমার দাদার মতো ছিল—কেইন-এর মতো। একইরকম লম্বা, একুশ ইঞ্চি—একইরকম ওজন, আট পাউণ্ড;

একরকম ন্যাড়া মুণ্ডি, নীল চোখ আর ঠিক একইরকম গাব্‌লু-গুব্‌লু মুখখানা। আসলে তোমরা দুজনেই তোমাদের দাদু—মানে আমার বাবার মতো দেখতে।

আমি আর তুমি একই সঙ্গে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাই; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পথে। নার্সারিতে শেষবারের মতো দেখব বলে উঁকি মেরে দেখি, ওরা নিয়ে এসেছে রাশি-রাশি নতুন জামা-কাপড়, নামী ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের নামাঙ্কিত থলিতে। তার ভিতর থেকে উঁকি মারছে ক্রীব মোবাইলটা। আমাদের বাড়িতে এইরকম একটা ক্রীব মোবাইল আছে। হয়তো একই ঘুম-পাড়ানি গান শোনাতো তোমার দাদা কেইনকে। তুমি আমার সংসারে এলে সেটা পেতে। তবে আমরা সেটা গ্যারাজ সেল থেকে সেকেন্ড হ্যান্ডে কিনেছিলাম। এটা ঝক্‌ঝকে নতুন। নতুন কারসীট দেখেও নিশ্চিন্ত হলাম : তুমি সুখে থাকবে।

জনাথন আমার শরীরে এসেছিল কেবলই ভার হয়ে। অবাঞ্ছিত ভূমিকা নিয়ে। একটুও আশা-আনন্দ নিয়ে নয়। আমার বিয়ের তিন বছর পরে। রোজই ভাবতাম, আমি যখন চাইনি, বব্ যখন চায় না—তখন ভগবান কিছুতেই একে আমার ঘাড়ে চাপাবেন না। নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নেবেন। নিশ্চয়ই কালই কিছু একটা হবে। কেইন তখন বছর তিনেকের দামাল। সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়ায়। অথচ তিন বছর আগে, কেইন যখন আসন্ন, আমাদের কত সমস্যার মধ্যেই না দিন কেটেছে। আমি তখন ঊনিশ বছরের অবিবাহিত এক কলেজের ছাত্রী, পার্টটাইম কাজ করি একটা ব্যাঙ্কে। বব্ ফুলটাইম আন্ডার-গ্র্যাড্ স্টুডেন্ট। যেদিন প্রথম জানতে পারলাম 'আয়াম ক্যারিয়িং' সেদিন খুব কেঁদেছিলাম। বব্ যে আমার অবস্থা দেখে স্কুল ছেড়ে আমায় নিয়ে সংসার পাতবে এমন আশা করা অন্যায়। দোষটা নিতান্তই আমার। আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। হয়ে ছিলামও! তবু কী করে যে কী হল! ফলে, আমার সামনে তখন দুটো রাস্তা খোলা ছিল—হয় ক্যাথীর মতো 'সিংগ্‌ল্ পেরেন্টিং'-এর দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সারাজীবন লড়ে যেতে হবে, নয় লিজার সহজ সহজ সমাধান। কিন্তু লিজার কাছে যা সহজ, গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে আমার কাছে তা মোটেই সহজ নয়। ভ্রূণহত্যা আমি করতে পারব না।

মা মেরীই রক্ষা করলেন। শুধু আমাকে নয়, কেইনকেও!

বব্ হঠাৎ যেন কিং-আর্থারের 'নাইট' হয়ে গেল। লেডি-ইন-ভিস্ট্রেস্-এর সামনে এসে দাঁড়ালো তার নাইটহুড শ্যিভল্‌রির পশরা মাথায়। স্বপ্নের মতো একদিন দু-হাতে আমার মুখটা তুলে মুখটা তুলে ধরে বলেছিল, Suppose I Formally propose to you now. Would you accept?

আমার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল সেদিন।

কেইন এল আমার কোলে। তার আগেই আমি এসেছি বব্-এর ঘরে। বিবাহিত বধূ। বব্ হয়ে গেল পার্টটাইম স্টুডেন্ট। আমি ফুলটাইম বুককীপার। কেইন মানুষ হতে থাকে তালেগোলে—কিছুটা বাবা, কিছুটা কেয়ারটেকারের হেপাজতে। কিছুদিন পরে

আমার একার রোজগারে আর কুলায় না। বব্ বাধ্য হয়ে ফুলটাইম কাজ নিল একটা মটোরগাড়ির কারখানায়। আমার খুব খারাপ লাগত। বব্ ছাত্র ভালো। আমিই ওর কেরিয়ারটা নষ্ট করে দিলাম! ও কিন্তু ব্যাপারটাকে খুব সাধারণভাবে নিল। সাময়িক ও সহজ সমাধান যেন! বলত, শীঘ্রই ওর বাকি এক বছরের কলেজ ক্রেডিট্‌গুলো করে নেবে একটু সামলে নিয়েই। তারপরই ও হয়ে যাবে সত্যিকারের প্রফেশনাল এঞ্জিনিয়ার। নো মোর ব্লু-কালার জব!

এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ দ্বিতীয় সন্তান এল আমার গর্ভে। আমরা দুজনেই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ি। দু-দুটো বাচ্চাকে কোনোমতেই মানুষ করে তুলতে পারব না—এটা নিশ্চিত। মাঝে মাঝে আমাদের ফ্রাস্ট্রেশানের শিকার হত বেচারা কেইন। মনে আছে, ওই সময় একদিন লাঞ্চের পয়সা বাঁচিয়ে আমি ওর জন্য একটা সুন্দর পশু-পাখির বই কিনে এনেছিলাম। ভাবলাম সপ্তাহান্তে কেইনকে নিয়ে যাব চিড়িয়াখানা দেখাতে। তার আগে ওকে বই দেখিয়ে চিনিয়ে দেব সব। জামা-কাপড় পালটিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি ছবি-দেখার বদলে কেইন বইটাকে কুচি-কুচি করে ছিঁড়েছে! আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। প্রচণ্ড প্রহার করেছিলাম সেদিন! তারপর আমারই গলা জড়িয়ে ধরে যখন সে ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল—তখন অজস্র চুমুতে ভরিয়ে দিচ্ছিলাম ওর কচি মুখটা। হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙে গেল। কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল কেইন। কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না। আমিই কি ছাই নিজেকে বুঝতে পারছিলাম? কেইন যে এমনতর হয়ে উঠেছে সেজন্য সে একাই কি দায়ী? মায়ের সান্নিধ্য পায় না, অন্যলোকের কেয়ারে ... (কেয়ারে না পাহারায়?) ...ও আমার মূল্যবোধ পাবে কোথা থেকে?

নাঃ? দু-দুটো বাচ্চাকে কোনোমতেই সামলাতে পারব না আমরা।

এই সময়ে একদিন টি.ভি. দেখতে বসে একটা প্রোগ্রাম নজরে পড়ল। এক জোড়া ইন্টারভিয়ু। একটি সংস্থা বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে। দু'টি দম্পতি। একজোড়া স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা—কী করে একটি সন্তান লাভ করা যায়; অপর-দম্পতির সমস্যা কী-ভাবে অবাঞ্ছিত সন্তানকে মানুষ করা যায়। ওদের পারস্পরিক পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে এই সংস্থা উভয়পক্ষের সমস্যার সুন্দর সমাধান করলেন। তাড়াতাড়ি সংস্থাটির নাম ঠিকানা টুকে নিলাম। আইডিয়াটা বব্-এরও পছন্দ হল। চিঠি দেওয়া গেল। অচিরেই যোগাযোগ হল। পরিচয় হল ও পক্ষের সঙ্গে। মিস্টার ও মিসেস্ ভ্যানগলভার। ভদ্রলোক অঙ্কের অধ্যাপক, স্ত্রী পিয়ানো শেখান। আট দশ বছর বিবাহ হয়েছে! নিঃসন্তান। তাঁরা জানালেন—ছেলে মেয়ে যাই হোক, এমনকি জন্মগত কোনও খুঁত থাকলেও তাঁরা আমাদের সন্তানকে গ্রহণ করবেন। মানুষ করবেন।

প্রথাগত অ্যাডাপটেশনের লালফিতার বাঁধন এড়ানো গেল। পরিবারটিকে আমাদের পছন্দও হল। ওঁদের একটি মাত্র শর্ত—সন্তানের সঙ্গে পরে যোগাযোগ করা চলবে না। এটা কোনো নিষ্ঠুর শর্ত নয়। দু-নৌকায় পা দিলে আমাদের অজাত সন্তান কোনো ঘাটেই পৌঁছাতে পারবে না।

সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী জনাথনকে ওঁরা হাসপাতাল থেকেই নিয়ে গেলেন। আমাদের পরিবারের কেউ ওয়ালনাট ক্রিকে থাকে না। ছেলে-কোলে হাসপাতাল থেকে ফিরলাম না দেখে প্রতিবেশীরা ধরে নিল বাচ্চাটার অকালমৃত্যু হয়েছে। শুধু আমার বাবা বোস্টন থেকে ফোন করলেন—ভীষণ আগ্রহ তাঁর ছোট্ট দাদুভাইকে দেখবার। একটু হয়তো ক্ষুণ্ণ হলেন, যখন বলা হল ওর নাম রাখা হয়েছে (আমরা ভাববাচ্যেই জানিয়েছিলাম) 'জনাথন'। তাঁর হয়তো আশা ছিল নামটা হবে : হ্যারল্ড জুনিয়ার। টেলিফোনে জানালেন, মাস দুয়েক পরে ক্রিস্টমাসের ছুটিতে তিনি ওয়ালনাট ক্রিকে আসবেন নাতিকে দেখতে। বাবাকে কী মিথ্যে কথা বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সত্যি কথাটা বলব?—'জনাথনকে দেখতে ঠিক তোমার মতো হয়েছে!' তাও বলতে পারিনি মুখ ফুটে।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে মিথ্যাও বল্‌তে হয়নি। ক্রিস্টমাসের আগেই হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাকে হ্যারল্ড সিনিয়ার মারা গেলেন।

পরিবারের আর কে কী ভেবেছিল তা নিয়ে চিন্তা করার আমার না ছিল অবকাশ না শক্তি।

মিস্টার এবং মিসেস্ ভ্যানগলভারের সঙ্গে আর একবার আমাদের দেখা হয়েছিল কিছু ফরম্যাল কাগজে সই-সাবুদ করার ব্যাপারে। ওঁরাই এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে! জনাথনকে সঙ্গে আনেননি। বিচক্ষণতার পরিচয় নিশ্চয়। শুধু মিসেস্ ভ্যানগলভারের একটা বেফাঁস কথায় জনাথনের একটা আবছা আভাস পাওয়া গেল। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন আমাকে, 'আচ্ছা কেইন কি ছেলেবেলায় মুখের মধ্যে চারটে আঙুল পুরে ঘুমাতো?'

মিস্টার ভ্যানগলভার হাসতে হাসতে বললেন, যদিচ—কিন্তু মনে হল যেন ধমক দিলেন—'এসব মেয়েলি কৌতূহল থামাও দিকিন! কাজ-কর্মগুলো করতে দাও!'

ওরা বলেনি, তবু আমি জানি—জনাথন ঠিক তার দাদার মতোই ঘুমোবার সময় হাতের চারটে আঙুলই মুখে পুরে চুষতে থাকে!

এরপর ভ্যানগলভার জানতে চাইলেন, জনাথনের জন্য আমরা কোনো টাকা পয়সা চাই কিনা!

আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠেছিল। জবাব দিতে পারিনি। বব্ তৎক্ষণাৎ বললে, নিশ্চয় নয়! শুধু দেখবেন—বড় হয়েও যদি কোনো কলেজে যেতে চায় তাহলে টাকা পয়সার জন্য যেন সেটা না আট্‌কায়। এজন্যই আমরা বাধ্য হয়ে....

কথাটা বব্ শেষ করতে পারেনি। তার আগেই মিস্টার ভ্যানগলভার আমাদের নিশ্চিন্ত করলেন— ওর নামে আলাদা অ্যাকাউন্ট থাকবে।

ক'দিন একটানা বৃষ্টির পর আজ ঝলমলিয়ে রোদ উঠেছে। মার্চ মাসের এই শেষদিকটা সবচেয়ে ভালো লাগে বুদাকিয়েনের। জনাথন ওঁকে চারটের সময় আসতে বলেছে—মিটিং ভাঙার পর; কিন্তু উনি ওয়ালনাট ক্রিক থেকে রওনা হয়েছেন বেলা

দেড়টায়—যাতে তিনটের আগেই তিনি 'লেকচার হলে' এসে পৌঁছতে পারেন। বার্ট—মানে শহরতলির রেলগাড়িতে ওয়ালনাট ক্রিক থেকে বার্কলেতে সরাসরি আসা যায় না তো। মাঝে ট্রেন বদল করতে হয়। জনাথন লিখেছে নীরস বক্তৃতা তাঁর ভালো লাগবে না। কিন্তু উনি তো শুনতে যাচ্ছেন না। যাচ্ছেন দেখতে! মিটিঙ-এর পরে ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতে যদি সঙ্কোচ হয়? তার চেয়ে ভিড়ের মধ্যেই পুরো একঘণ্টা ধরে দেখবেন সেই নেইমুণ্ডি, নীলচোখো টোব্‌লা-গোল বাচ্চাকে।

জানা আছে ওঁর, তারপর সাঁইত্রিশটা বছর কেটে গেছে। তা যাক্।

মার্চের এই শেষ সপ্তাহে বার্কলে পাহাড়টার যেন বার্ষিক ফুলশয্যা হয়। চারিদিকে সাদা-নীল আফ্রিকান ডেইজি ফুলে ভরে গেছে পাহাড়ী শহরটা। কলেজের ছেলে মেয়ে রঙিন প্রজাপতির মতো ইতস্তত উড়ছে ফুলে ফুলে। কোথা থেকে একটা মরশুমী পাখি লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে একটানা ডেকে চলেছে; ও পিটার! ও পিটার! ও পিটার!

–Who are you mocking at, Birdie?

ফুলের গাড়িটা নিয়ে মেয়েটা হাঁকছে—রোজেস্ ফর এ ডলার!

মিসেস্ বুদাকিয়েন যখন লেকচার হল-এর সামনে এসে পৌঁছলেন তখনও তিনটে বাজতে মিনিট পনেরো বাকি। বেশ ভিড় হয়েছে। অডিটোরিয়াম প্রায় ভরে এসেছে। উনি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন গেটের সামনে। ওরা যদি প্রবেশপত্র দেখতে চায়? ওঁকে ও-ভাবে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ভলান্টিয়ারদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললে, ম্যাডাম, যদি বসে বসে লেকচার শুনতে চান তাহলে এখনই সীট দখল করা বুদ্ধিমানের কাজ।

বিনা বাধায় ঢুকে গেলেন লেকচার হলে।

একটু পরেই যবনিকা উঠে গেল। মঞ্চে বসে আছেন সাত-আট জন ইউনিভার্সিটির ডন। তার মধ্যে নিতান্ত তিনজন বৃদ্ধ। বাকি ক-জনের বয়সটা চল্লিশের কাছাকাছি। মিসেস বুদাকিয়েনের হৃদপিন্ডটা মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল। তিনি চিনতে পারছেন না—ওর মধ্যে কোনজন একদিন তাঁরই জঠরে আশ্রয় নিয়েছিল।

একটি মেয়ে কী একটা ছাপানো হ্যান্ডবিল বিলি করছিল। ওঁর হাতেও ধরিয়ে দিল একখণ্ড কাগজ। উনি দেখলেন, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার শাখা একটা ফোল্ডার তৈরি করেছে। তাতে প্রফেসর জনাথন ভ্যালগলভার-এর একটি ছবি এবং পরিচয় দেওয়া আছে। এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে একটু আত্মশ্লাঘারও প্রকাশ। প্রফেসর ভ্যালগলভারের জন্মতারিখ —মা ও বাপের নাম, তাঁর ছাত্রজীবন এবং কী কী পেপার প্রকাশ করেছেন তিনি, সবই লেখা আছে। পড়তে পড়তে বার দুয়েক চশমার কাচটা ওঁকে মুছতে হল। এতক্ষণে চিনলেন জনাথনকে।

মঞ্চের উপর ততক্ষণে একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক তাঁর প্রিয় ছাত্রকে স্বাগত জানাচ্ছেন। একটি মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রফেসর ভ্যানগলভারকে প্রকাণ্ড একটা গোলাপের তোড়া দিয়ে গেল।

শুরু হল সংক্ষিপ্ত ইন্‌ট্রোডাক্‌শন। তারপরই অধ্যাপক ভ্যানগলভারের দীর্ঘ বক্তৃতা। ব্ল্যাকবোর্ডে শীতালী পাখির মতো নেমে এল এক ঝাঁক আল্‌ফাবীটা-এপ্‌সাইলন-থিটা-ফাই।

আদ্যন্ত গ্রিক!

মিসেস্‌ বুদাকিয়েন শুধু নয়নভরে দেখছেন বক্তাকে।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে বসে বসে তিনি দিবাস্বপ্নের জাল বুনতে থাকেন—

বক্তৃতা-অন্তে মায়ে-পোয়ে কী জাতের গল্প হবে। জনাথন বলবে, শীঘ্রই সে এই বার্কলে কলেজে যোগদান করবে। এখানেই প্রফেসারি নেবে সে। অ্যালেন টাউনে পাহাড়ের উপর ছবির মতো তাদের বাড়ি। ব্যাক ইয়ার্ডে প্রায়ই হরিণের উপদ্রব হয়। তা হোক, বাচ্চারা সেটা খুবই এঞ্জয় করে। হ্যাঁ, তার দুটি সন্তানের সঙ্গেই মিসেস্‌ বুদাকিয়েনের ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছে। মেয়েটা সাত—কোয়েল। আর তিন বছরের ছেলে জসুয়া জুনিয়ার। জসুয়া সিনিয়ার তো ছিলেন জনাথনের বাবা। মানে, মিস্টার ভ্যানগলভার। তিন বছরের বাচ্চা ছেলে, কিন্তু সূর্যের মতো প্রখর দীপ্তিমান। আর কোয়েল চাঁদের মতো স্নিগ্ধ শান্ত। সে নাকি দেখতে তার ঠাকুমার মতো। ঠাকুমা! সে কে? সে যাইহোক ওর বউ মেলিসা ভারি লক্ষ্মী। কিন্তু তারও পড়াশুনার বাতিক। কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। মুশ্‌কিল হয়েছে দু-দুটো বাচ্চাকে নিয়ে। ডে-কেয়ার টেকারের কাছে কী বাচ্চা মানুষ করা যায়? তাতে না হয় এদিক, না ওদিক। মেলিসা ওঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে—তুমি চলে এস না এখানে? আমাদের একতলায় তিনখানা ঘর তো তালাবন্ধ থাকে। একা একা কী পড়ে আছে ওয়ালনাট ক্রিকে?

তা বটে! মিসেস্‌ বুদাকিয়েন বাগানটাকে একেবারে ঢেলে সাজাবেন। ওরা তো সময়ই পায় না। তাই বাগান একদিন ছিল আগাছায় ভর্তি। এখন কত কত মরশুমি চারা লাগিয়েছেন। নানান জাতের গোলাপ, আর বীজহীন মিষ্টি আঙুর। আপেল আর আঙুর ক্যালিফোর্নিয়াতে সহজেই হয়। ছুটির দিনে নাতি-নাতনিও আসবে তাঁকে সাহায্য করতে। আগাছা তুলে ফেলবে, গাছে হোসপাইপ দিয়ে জল দেবে। কিন্তু না! কোয়েলকে উনি লন-মোয়ারটা চালাতে দেবেন না। শেষে রক্তারক্তি কাণ্ড হোক আর কি!

নাতি-নাতনি যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরবে তখন ফ্রেশ কেক-কুকির গন্ধে গোটা বাড়িটা ম'-ম' করবে! কোয়েল তার দিদার গলা জড়িয়ে ধরে বলবে : ইউ আর এ জুয়েল অব্‌ এ গ্র্যান্ড-মা! এমন কুকি আর কারও গ্র্যান্ড-মা বানাতে পারে? বলুক সে!

মিসেস্‌ বুদাকিয়েন ধমক দেবেন, সব নাতনিই ও-কথা বলে তার গ্র্যান্ডমার হাতে গড়া কুকি খেয়ে। যাতে আর দুটো বেশি পাওয়া যায়!

—মোটেই না!

বৌটা সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে বাড়ি ফিরে যখন দেখবে ঘর-দোর ঝক্‌ঝক্‌-তক্‌তক করছে, গরম খাবারের গন্ধে বাড়িটা ম'-ম' করছে তখন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে ওঁকে : ও মম্‌! উই আর সো লাকি দ্যাট ইউ এগ্রীড টু স্টে উইথ আস্‌! থ্যাঙ্কস্‌ এ লট্‌!

আর রাত দুপুরে স্টাডি-রুমে আলো জ্বলছে দেখে উনি যখন আলো নেভাতে আসবেন তখন দেখবেন, বড় সেক্রেটারিয়াট টেবিলে মাথা থেকে ওই পাগলটা—ওই যে ব্ল্যাকবোর্ডে কী হাবিজাবি লিখছে—ও অঘোরে ঘুমাচ্ছে! ঘুমন্ত প্রফেসরের মুখটা দেখে বুদাকিয়েন ভাবতে বসবেন—জনাথন কি দেখতে ঠিক কেইন-এর মতো? নাকি নাকটা ওর বাবার মতো? ঠিক ঠিক! কোথায় যেন জনাথনের সঙ্গে মিল আছে তার বাপের। ফোল্ডারে-লেখা ওই বাপের সঙ্গে নয়, বব্-এর সঙ্গে।

হঠাৎ করতালি ধ্বনিতে দিবাস্বপ্ন ত্যাগ করে বুদাকিয়েন ফিরে আসেন প্রেক্ষাগৃহে।

বক্তৃতা শেষ হয়েছে। দলে দলে দর্শকেরা বার হয়ে আসছে।

ওঁর পাশের সীটে বসেছিলেন যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক তিনি ওঁর দিকে ফিরে বললেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য! কী বলেন?

বুদাকিয়েন ম্লান হাসলেন।

—ওঁর বক্তৃতা আগে শুনেছিলেন কখনও?

বুদাকিয়েন বলে বসলেন, না! বড় হবার পর থেকে ওকে দেখিই নি কখনো!

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, অর্থাৎ ছেলেবেলায় দেখেছিলেন?

বৃদ্ধা কোনোমতে ঢোক গিলে বলেন, ও আমার ছেলে...ছেলের বন্ধু ছিল। তখন ও খুব ছোটো।

—আই সি!

সরীসৃপ গতিতে ভীড়ের চাপে বের হয়ে এলেন। গেটের সামনেই একটা জটলা। প্রফেসর জনাথন ভ্যানগলভার দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ইতিউতি চাইছেন। মনে হল, কী যেন খুঁজছেন তিনি।

বুদাকিয়েন ভীড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে গেলেন। আরও কাছ থেকে ওকে দেখতে। সুযোগ হলে একবার ওর বাহুমূলটা স্পর্শ করতে। প্রফেসর ভ্যানগলভারের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন সেই বৃদ্ধ ডন। নোবেল-লরিয়েট ফিজিসিস্ট। যাঁর ছাত্র জনাথন। তিনি বললেন, তুমি কি কাউকে খুঁজছ, মাই বয়?

—ইয়েস স্যার! একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। এখানেই। ঠিক চারটের সময়।

—ভদ্রমহিলা? কে তিনি? আমরা চিনি?

—না স্যার। তিনি আমার মা..মায়ের বন্ধু ছিলেন। তখন আমি খুব ছোটো!

মিসেস্ বুদাকিয়েন ডোরিক স্তম্ভটার আড়ালে আত্মগোপন করতে চাইলেন। প্রয়োজন ছিল না। চোখাচোখি হলেও ওঁর ছেলের বন্ধু চিনতে পারত না তার মায়ের বান্ধবীকে।

ঈশ্বর জানেন—ওর ভালোর জন্যেই মিসেস্ বুদাকিয়েন একদিন স্বীকার করে নিয়েছিলেন—জনাথন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই তাঁর অবাঞ্ছিত সন্তান।

কিন্তু ঈশ্বর জানলেও জনাথন কি জানে? তাকে কি জানতে দেওয়া হয়েছে? কেন আজ মিসেস্ বুদাকিয়েন ওর মায়ের বান্ধবী ছাড়া আর কিছু নয়? সাঁইত্রিশ বছর পরে

সেই অদেখা 'মায়ের বান্ধবী' সম্বন্ধে কেন ওর শেষ কথা : 'আর কিছু নয়, তোমাকে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে; দু-দণ্ড কথা বল্‌তে ইচ্ছে করছে!'

বার্টের রেলগাড়ির কামরায় বসে ওয়ালনাট ক্রিকে ফিরতে ফিরতে মিসেস্ বুদাকিয়েন মাউন্ট ডায়াব্লো পাহাড়ের ওপারে অস্তগামী সূর্যটাকে দেখছিলেন। লালে-লাল হয়ে গেছে পশ্চিমাকাশ। যৌবনের ঊষালগ্নে কী একটা কারণে ওই সূর্যটা লজ্জায় রাঙা হয়ে গিয়েছিল—সারা আকাশটা পাড়ি দিয়ে শেষ বিদায় মুহূর্তে সেই সরমের কথাটাই বুঝি আবার মনে পড়ে গেছে তার। সূর্যটা আবার তেমনি লাল হয়ে উঠেছে।

মিসেস্ বুদাকিয়েন তাঁর এতদিনের অভ্যস্ত ওয়ালনাট ক্রিকের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে, এতদিনের পুরনো চাকরিটা ছেড়ে...না ভুল হল, চাকরিটাই ওঁকে ছেড়ে যাবে দশদিন পরে... তিনি কোথাও যেতে পারবেন না। নির্বান্ধব বাড়িটা তো কোনো আনন্দঘন ছোট্ট নীড় নয়—সেখানে শুধু দু-দণ্ড নয়, বাকি কটা দিন তিনি দণ্ডভোগের অবকাশ পাবেন। সেখানে তিনি অবাঞ্ছিতা নন!

আচ্ছা, জনাথন কী ভাবছে? কী আবার ভাববে?

"সাঁইত্রিশটা বছর সচরাচর মানুষ এক ঠিকানাতেই থাকে না তো!"

হঠাৎ একটা উট্‌কো কথা মনে হল তাঁর :

বুদ্ধি করে আসার সময় যদি থলেটা নিয়ে আসতেন তাহলে এখন ফেরার পথে পিয়ারসন্স লাম্বার-ইয়ার্ড থেকে এক থলে কুচো কাঠ বাড়ি নিয়ে যাওয়া যেত! তাড়াহুড়ায় কথাটা তখন তাঁর খেয়ালই হয়নি।

৭৪।।০

[যাও পাখি ব'ল তারে।
সে যেন ভোলে না মোরে।।]

কলকাতা-২০
২৫শে জুলাই ১৯৭৮

প্রিয়তমাসু,

তোমার একপক্ষ-কালের জীবনে এই প্রথম পত্রপ্রাপ্তি, প্রথম প্রেমপত্র তো বটেই। না হারিয়ে গেলে আজ থেকে বিশ-পঁচিশ বছর পরে আমার কোনো অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বীকে এ চিঠি দেখিয়ে তুমি বল্‌তে পারবে : আজ্ঞে না মশাই, তুমিই এ কেরামতি প্রথম দেখাচ্ছ না, এর আগেও আমি অমন 'প্রিয়তমাসু'-মার্কা চিঠি পেয়েছি!...আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, তোমার ও-কথা শুনে একজন সুদর্শন পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়সের যুবকের চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ল।

ঠিক বললাম তো? আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে এ দুনিয়াটার হাল কেমন হবে গো, অন্তরা? তখন তোমরা 'প্রিয়তমাসু'-মার্কা চিঠি আদৌ পাবে তো? শব্দটা এখনই কেমন যেন ঘোড়ায়-টানা-ট্রামের ঘড়ঘড়ানির মতো! কেমন যেন আমাদের কালের গন্ধ! তাছাড়া তোমার বয়-ফ্রেন্ডের চোয়ালের নিম্নাংশ যে ঝুলে পড়বেই তার গ্যারেন্টি কি? তোমার দিদিমা, মানে, আমি যাঁকে সে-আমলে ওই জাতের চিঠি পাঠাতাম, তিনি যদি আমাকে ওই কথা বলতেন—অর্থাৎ আমিই তাঁকে সম্বোধন প্রথম করছি না—তাহলে আমার লোয়ার ম্যাণ্ডেবল্ ঝুলে পড়ত নির্ঘাৎ। কিন্তু তোমরা যে সে-যুগের থেকে পঞ্চাশ বছর পরে প্রেম-ট্রেম করবে। তখন ও-কথা শুনে আমার হবু নাত-জামাই হয়তো বলবে : বল্‌ডারড্যাশ্! অথবা প্রতিপ্রশ্ন করবে : সো হোয়াট?... না, ভাই অন্তরা, তুমি বরং চেপে যেও তোমার জীবনে প্রথম প্রেমপত্র পাওয়ার ব্যাপারটা। তাকে জানানোর কী দরকার? আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ছোকরা লোক সুবিধের নয়। আমার এই 'যাও পাখি ব'ল তারে' মার্কা দরদভরা চিঠিখানা দেখে ছোকরা বলবে : বুড়োর ভীমরথী হয়েছিল!

ভমীরথী! একবার যদি ছোকরাকে আজ, এই মুহূর্তে হাতের কাছে পাই (আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তো এখন হাফপ্যাণ্ট পরে লাট্টু ঘোরায়, তাকে আবার ভয় কি?) তাহলে দেখিয়ে দিই আমাকে 'বুড়ো' বলার মজাটা। কিন্তু না! আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে তার সঙ্গে পাঞ্জা কষা আমার কম্মো নয়। ততদিনে সে হয়ে উঠ্‌বে নওজোয়ান—ইয়া

ছাতি, ঈয়া জুল্‌পি, ঈ-য়া বাইসেপ! আর আমি? খসে না গেলে, পাকা পেয়ারাফুলি আমটি!

আমাদের কালে, জানলে অন্তরা, আমরা প্রেমপত্র লিখবার সময় কতকগুলো সুন্দর-সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতাম : চিত্তচকোর, মনভ্রমর, মুখপদ্ম, ইত্যাদি। যেন-তেন-প্রকারেণ রাধা-কেষ্টোকে পেড়ে ফেলতাম। প্রেমপত্র মানেই কেষ্টতত্ত্ব! মাঝে অমিট্রায়ে-বন্যার এক ঢল নেমেছিল। অবশ্য বেশিদিন জল ঘোলা করতে পারেনি। কলমের ডগায় যে ওদের ভাষাটা আসতে চায় না। তার চেয়ে কৃষ্ণলীলা অনেক সহজ, অনেক মোলায়েম। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস—এঁদের ছিল মনোপলি বিজনেস। সেই সূত্র ধরে তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে : তবু চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি।

তা শুনেছি! হ্যাঁ, বাঁশী! টেলিফোনে। বেতারে কী সুতোর—ট্যাঁ! ট্যাঁ—এ্যাঁ-এ্যাঁ!

তোমার বাবা যখন ওয়ালনাট ক্রিক থেকে এই কলকাতায় টেলিফোনে জানিয়েছিল তোমার আগমন বার্তা। শুনলাম তুমি আর তোমার মা হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসেছ।

ওরা তোমার নাম রেখেছে : অন্তরা। নামটা ভালো। তুমি তো আমারই 'অন্তর', প্লাস স্ত্রীয়াম্ আপ। কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে একটা বিলাতি নামে ডাকি - 'এ্যান্টিপডা'! Antipodes মানে পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তের মানুষ।

শুনেছি, তোমার মাথায় নাকি মেঘবরন চুল, রঙ কুঁচবরন আর দৃষ্টি এনাক্ষী-বিনিন্দিত। সে সব তো শোনা কথা—হেয়ার-সে এভিডেন্স-স্বকর্ণে সেদিন টেলিফোনে যেটুকু শুনেছি তাতে মনে হল তোমার বাণীবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর : 'বুথসাহেবেরবাচ্চালাঞ্ছিত'!

অন্তরা! তোমাকে না দেখলেও তোমার চেহারাটা আমি ঠিকই আন্দাজ করতে পারছি। আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠ্‌ছে তোমার মায়ের ওই বয়সের টুলটুলে মুখখানা। তারও অমন টাকা-টাকা চুল ছিল, অমন গাব্‌লু-গুব্‌লু গাল, আর কাঁদতও অমন 'ট্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ' করে। এক সপ্তাহ বয়স হবার আগেই তাকে কোলে নিয়েছি। একটুও অসুবিধা হত না।

তখন আমার ছিল স্কেচ-আঁকার বাতিক। হামা-দিতে শেখার পর আমি তার স্কেচ আঁকতে বসলে বোকাটা বুঝতে পারত না। তুরতুর করে এগিয়ে আসত অথবা ধর্ ধর্ করতে করতে পালিয়ে যেত। অমন অস্থির হলে কি ছবি আঁকা যায়? তুমি বুঝমান। হয়তো বুঝতে। কিন্তু তোমার আমার মাঝখানে যে অতলান্তিক অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান। তোমার স্কেচ আঁকার সুযোগ আমি পেতে পেতেই হয়তো তোমার বয়স হয়ে যাবে চার-পাঁচ। আমি যখন শক্তিগড়ে পোস্টেড ততদিনে তোমার মা ব্যাপারটা বুঝতে শিখেছে। বাবা স্কেচখাতা নিয়ে বসলে স্থির হয়ে থাকতে শিখেছে। আর আমি যখন দণ্ডকারণ্যে ডেপুটেশনে চাকুরি করতে গেছি ততদিনে সে রীতিমতো

পোজ দিতে শিখে গেছে। দুর্ভাগ্য আমার, তোমার ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠাটা আমার স্কেচ খাতায় ধরা পড়বে না। না হোক, ফটো দিয়েই সাজাবো এ্যালবাম।

মায়ের চেয়ে শতাব্দীর একপাদ কাল আগিয়ে আছো বলে যে সব বিষয়েই মাকে টেক্কা দিতে পারবে এমন কথা ভেব না কিন্তু। প্রমাণ চাও? দিচ্ছি হাতে-হাতে—

তুমি পৃথিবীর অপরপ্রান্তে বসে—একশ আশি ডিগ্রি তফাৎ থেকে একখানি প্রেমপত্র পেলে। পেলেতো? কিন্তু কী অবস্থায়? খোলা খাম! তোমার বাবা-মা এমন 'কনজারভেটিভ' যে খামের উপর ৭৪।।০ লেখা আছে দেখেও তোমার বিনা অনুমতিতে খামটা খুলে ফেলেছে! যার চিঠি সে পড়ল না, অথচ ওরা পড়ে নির্লজ্জের

মতো দাঁত বার করে হাসছে! কী করবে অন্তরা? এ যুগটাই এমন। আমাদের আমলে আমরা আরও 'প্রগ্রেসিভ মাইণ্ডেড' ছিলাম। আইবুড়ো ছেলে মেয়েদের চিঠি কক্ষনো খুলিনি। বিশ্বাস না হয় শুধিয়ে দেখ তোমার মাকে, অথবা বাবাকেই। একশ আশি ডিগ্রি

তফাত থেকে আসা কোনো প্রেমপত্র তারা খোলা খামে পেয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে দেখ। তুমি প্রতিবাদ কর, অন্তরা! আপ্রাণ চিল্লাও! আর কিছু না পার তো কাঁথাটা ভিজিয়ে দাও! মা কেচে-কেচে মরুক! মা-ই তো 'কাল্‌প্রিট'—খামটা দেখ্‌-না-দেখ খুলে ফেলেছে!

আমার দাদুকে আমি কখনো দেখিনি। মানে, আমার জন্মের আগেই তিনি দুনিয়াদারীর পালা সাঙ্গ করেছিলেন। তবে আমি হচ্ছি আবার বাবার বেশি বয়সের সন্তান, ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোটো। ইস্কুলে ভর্তি হবার আগেই তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল বিচিত্র। দাদুকে পাইনি, কিন্তু বয়সের পার্থক্যের জন্য দাদুর আদর তাঁর কাছেই কিছুটা পেয়েছি। তোমার বাবা, তোমার মায়ের বাবা, আর আমার বাবার মধ্যে একটা ক্ষীণ যোগসূত্র আছে। আমরা তিনজনেই বি.ই.কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তফাৎও আছে। আমার বাবা লগ্‌-টেব্‌ল-এর সাহায্যে বড় বড় আঁক কষতেন, আমি স্লাইজ-রুল নাড়াচাড়া করেছি, আর তোমার বাবার বাহন হচ্ছে মিনি-কম্পুটার। যাক ওসব বড় বড় কথা। যে কথা বলছিলাম। খুব ছেলেবেলায় বাবাকে বেশ ভয় পেতাম। বিরাট বড় চেহারা ছিল বলেই নয়, ভোর রাতে পাশ-বালিশ আঁকড়ে আধোঘুমের ভিতর শুনতে পেতাম—পাশের ঘর থেকে তিনি কী-সব অং-বং-চং মন্ত্র আওড়াচ্ছেন! ভয় লাগতো। পরে জেনেছি সেগুলি উপনিষদের মন্ত্র। তারপর নিকারবোকার ছেড়ে যখন হাফপ্যান্ট ধরেছি, ততদিনে তিনি আমার বন্ধু হয়ে গেছেন। লাট্টুও ঘোরাতেন না, ঘুড়িও ওড়াতেন না—কিন্তু ম্যাড-হ্যাটারের চায়ের আসরে আমরা বাপ-বেটা দুই বন্ধু হাত ধরাধরি করে যোগ দিতে যেতাম। 'এ্যালিস্‌ ইন্‌ ওয়াণ্ডারল্যান্ড' আদ্যন্ত তিনি পড়ে শুনিয়েছিলেন আমাকে। লাইন-বাই-লাইন বুঝিয়ে দিয়ে। আমি তখনো ইংরেজিতে খুব কাঁচা। কিন্তু বাবা বলতেন, কিছু নিলে কিছু দিতেও হয়। তাই পরিবর্তে আমাকে পড়ে পড়ে শোনাতে হত কৃত্তিবাসী রামায়ণ অথবা কাশীদাসী মহাভারত।

আমার ধারণা ছিল—সব ছেলেরই ওই বয়সে তাই থাকে—দুনিয়ার যা কিছু মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব তা আমার বাবা জেনে বসে আছেন। যখনই যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করেছি উনি মুখে মুখে জবাব দিয়েছেন; বইপত্র বড় একটা ঘাঁটতে দেখিনি। ইংরেজি-বাংলা-সংস্কৃত ভাষা তিনটেই নয়, গ্রিক-ল্যাটিন সাফিক্স-প্রেফিক্সগুলোও তিনি যে গুলে খেয়েছিলেন তা এখন বুঝতে পারি। গত শতাব্দীতে এসব শেখানোর রেওয়াজ ছিল। এখন ওসব ইস্কুলে শেখানো হয় না। কেমন জান? আমি হয়তো বাবাকে প্রশ্ন করলাম, 'Orthopterous মানে কী'? উনি জবাবে বলতে, 'গ্রিক ভাষায় ortho হচ্ছে সোজা, আর pteron মানে ডানা। ফলে orthopterous মানে এমন একটা জীব যার অনেকগুলো লম্বা সোজা-সোজা ঠ্যাঙ আর একজোড়া ডানা আছে। এমন একটা জীবের নাম বলতে পার, খোকন?'

আমি হয়তো ভেবেচিন্তে বলি, 'মাছি। কিংবা মৌমাছি'।

উনি বলতেন, ঠিক হয়েছে। এস, এবার একটা মৌমাছিকে স্টাডি করা যাক।

দিব্যি স্কেচ আঁকতে পারতেন তিনি। মৌমাছির ছবিটা আমার ভালোই লাগল। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার পাওয়া যাবে? জানতে হল —শুঁড়জোড়াকে antennae, ঠ্যাঙ ছয়টার প্রথম জোড়া protothorax, মাঝে জোড়া mesothorax আর শেষ জোড়া metathorax । পতঙ্গ তত্ত্বের গোটা মহাভারত না শুনে নিস্তার নেই!

তাই পরীক্ষার মুখোমুখি কোনোদিন তাঁর কাছে ভিড়িনি। 'জ্ঞান' দিয়ে কি ধুয়ে খাব? আমাকে পেতে হবে পরীক্ষার 'নম্বর'!

এমন জীবন্ত বিশ্বকোষকেও আমি অজান্তে একবার লেঙ্গি মেরেছিলাম। মানে, তাঁকে অজ্ঞতা স্বীকার করে বলতে হয়েছিল : আমি জানি না খোকন!

তখন আমার বয়স সাত-আট হবে। মানে, কোরাপুটে তোমার মায়ের যে স্কেচটা করেছিলাম আমার বয়স তখন ওই রকম। সে সময় দিনের বেলা আমি বাবার কাছে জীবজন্তু পাখি-পতঙ্গ চিনতাম আর সন্ধ্যার পর ছিল আমাদের নক্ষত্র চেনার ক্লাস। একদিন সন্ধ্যার পর কৃষ্ণনগরের লালবাড়িতে আমাকে নিয়ে বাবা ছাদে এসেছেন। তাঁর হাতে একটা স্টার-চার্ট। তাই দেখিয়ে দেখিয়ে তিনি আমাকে আকাশের নক্ষত্রগুলোকে কীভাবে সনাক্ত করা যায় তাই শেখাচ্ছিলেন। কোনটা গ্রহ, কোনটা নক্ষত্র, নীহারিকা, কী তাদের নাম। নক্ষত্র চেনার ব্যাপারটা আদৌ নীরস লাগত না আমার কাছে। কারণ বাবার একটা বদ অভ্যাস ছিল— আমিও সেটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি—এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যাওয়া। তিনি অচিরেই নক্ষত্রলোক থেকে চলে যেতেন গ্রিক উপকথায়। এ্যান্ড্রোমেডা, পারস্যুস, হারকিউলিস্, ওরায়নের গল্পে। আকাশের তারাগুলো মনে গাঁথা হয়ে যেত।

সেদিন কী খেয়াল হল, আমি জানতে চাইলাম, আচ্ছা বাবা, ওই আকাশ গঙ্গার ওপারে কী আছে?

—মহাশূন্য। স্যাগাটোরিয়াস-এর ওই আকাশ গঙ্গা হচ্ছে আমাদের নক্ষত্র জগতের শেষ সীমানা। তার ওপারে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি আলোকবর্ষের ওপারে আছে অযুত-নিযুত নক্ষত্র জগত, মানে গ্যালাক্সি। তার একটিই শুধু তুমি খালি চোখে দেখতে পাবে—এ্যান্ড্রোমেডা।

—কিন্তু এত এত নক্ষত্রজগৎ কে বানিয়েছেন? আর কেনই বা বানিয়েছেন?

আমার চলমান বিশ্বকোষ সেই একদিনই শুধু হার মেনেছিলেন। মাথার উপর উঠেছিল সপ্তর্ষি। তার দিকে তাকিয়ে যেন আপন মনেই অস্ফুটে তিনি বললেন : নাহং বেদ।

—তার মানে?

—আমি জানি না, খোকন!

ক্রমোসমের কোনো অজানা সড়ক বেয়ে আমার ওই যুগ্মবাতিক—নক্ষত্র চেনা

আর পশুপাখি চেনা—সংক্রামিত হয়েছিল তোমার মা আর মামার মধ্যে। ছয়-সাত বছর বয়সেই আকাশের সব উজ্জ্বল নক্ষত্রের সঙ্গে তোমার মায়ের মিতালী হয়ে গেছিল। চাঁদের সাতাশ বউ-এর নাম তার কণ্ঠস্থ। আমাকে ক্রমাগত তাগাদা দেয় সব কজনকে চিনিয়ে দিতে। চাঁদের সাতাশ বউকে আমিই কি চিনি ছাই? সে কথা বললে বিশ্বাস করে না, অভিমান করে। কারণ সব শিশুর মতো তারও যে তখন ধারণা হয়েছে—বাবা সব কিছু জানে। তুমি একটু বড় হয়ে তোমার মাকে তাতিয়ে দিও। দেখবে, অনেক-অনেক ভুলে যাওয়া তারার নাম তার একে একে মনে পড়বে—ঠিক যেভাবে সন্ধ্যার আকাশে একে একে এসে হাজির হয় : তারা। একটা একটি করে তারার মালা গেঁথে সে পরিয়ে দেবে তোমার ছোট্ট গলায়।

তোমার রানা-মামা তারা-ফারার ধার ধারতো না। সে মনে মনে বাঘ সিংহ-হাতি-গণ্ডার ধরে। মারে না, জ্যান্ত ধরে। আমাকে মাঝে মাঝে এসে বলে, "বাবা, ছাদে একটা ছোট্ট হাতি পুষলে কেমন হয়?'

আমি উৎসাহ দিই—'ঠিক কথা! বেশ একটা চুন্নুমুন্নু হাতির বাচ্চা! একদিন টেরিটি বাজার থেকে কিনে আনব।'

রানার মা আমাকে ধমক দিত, 'কেন পাগলকে লা-ডোবানোর কথা বলছ? নিত্যি ঘ্যানঘ্যান শুরু করবে এবার থেকে।'

সে-কথায় কান দিতাম না। বাপ-বেটায় আলোচনা করতাম—ছাদে একটা ছোট্ট হাতি থাকলে কত সুবিধা। তরকারির খোশা আর ডাস্টবিনে ফেলে আসতে হবে না। কোনো ভারী মাল সিঁড়ি বেয়ে হেঁইয়ো-হেঁইয়ো করে তুলতে হবে না। আল্‌সের বাইরে দড়ি ঝুলিয়ে দিলে হাতিসোনাই মালটা টেনে তুলতে পারবে।

ওর জন্য কিনতে হয়েছিল একটা 'এ্যানিমাল এন্‌সাইক্লোপিডিয়া'। অবসর সময়ে তাকে জীবজন্তু পশু-পাখি চেনাতে বসতাম। ওই সঙ্গে আমিও শিখতাম কত কী! ছুটির দিনে ভোরবেলা ছুটি চিড়িয়াখানা মুখো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পশু-পাখিদের চিনতাম বাপ-বেটায়। রৌদ্রের তেজ আর দেহাতীদের ভিড় হবার আগেই হাঁ-হাঁ খিদে নিয়ে ফিরে আসতাম বাড়িতে।

এই ফাঁকে একটা তত্ত্বকথা বলে রাখি, অন্তরা। কারণ সময় যখন আসবে তখন কথাটা বলবার জন্য আমি হয়তো থাকব না। তুমিও তো একদিন মা হবে! সেদিন মনে রেখ, দাদু বলে গেছল—সন্তানকে বাপ-মায়ের শ্রেষ্ঠ উপহার : Time! দামি-দামি খেলনা নয়, ঢাউস-ঢাউস বই নয়—সময়! সান্নিধ্য! একদিন না একদিন তার সুফল ফলবেই।

রানার বেলা সুফলটা আমি অবশ্য হাত-গরম পেয়েছিলাম। সে এক মজার গল্প। আচ্ছা, তোমার রানামামার যে গল্পটাই শোনাই বরং—

দণ্ডকারণ্যে ডেপুটেশনের মেয়াদ শেষ করে যখন কলকাতায় ফিরে এলাম ততদিনে বুলবুলের—মানে তোমার মায়ের—স্কুলে ঢোকার বয়স অনেকদিন পার হয়ে গেছে। এমন কি রানারও। বুলবুলকে ভর্তি করার ব্যাপারে অনেক ছোটাছুটি করতে হয়েছিল, কারণ ভালো স্কুলে ক্লাস-ফাইভে সীট পাওয়া যায় না। মজাটা হল রানার বেলা। একটা নামকরা স্কুলে প্রবেশার্থী হিসাবে তার নাম লিখিয়ে তাকে নানান বিষয়ে তালিম দিতে থাকি। বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক। মৌখিক পরীক্ষা হবে। খোদায় মালুম—কী জিজ্ঞাসা করবে। নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রীর নাম—আর কী মুখস্ত করাবো রে বাবা? রামায়ণ-মহাভারত ও মোটামুটি জানে। 'এ্যালিস্ এ্যাডভেঞ্চার' ওকে পড়ে শুনিয়েছি। 'আবোল তাবলের' অনেক কবিতা ওর কণ্ঠস্থ। নাম্‌তা কতদূর মুখস্থ রাখতে হবে? রানা সে-সময় যদি জানতে চায়—বার্ড অব প্যারাডাইস অস্ট্রেলিয়া ছাড়া স্বর্গেও পাওয়া যায় কি না, অথবা রীয়া-এমুর ঠ্যাঙেও উটপাখির মতো মাত্র একজোড়া করে আঙুল কি না, তখন আমি ধমকে উঠি : তা জেনে কি তোমার আর দুটো হাত গজাবে? নাম্‌তাটা মুখস্ত করো বরং।

নির্দিষ্ট দিনে রানাকে নিয়ে ইস্কুলে হাজির হওয়া গেল। ইদানীং বোধহয় হাজার দেড়-হাজার প্রবেশার্থীর ভিড় হয়। সে আমলে অতটা ছিল না। তবু তিন চার শ বাচ্চা স-গার্জেন হাজির হয়েছে। স্কুল-প্রাঙ্গণ খোকায় খোকারণ্য। একে-একে ডাক পড়ছে ইন্টারভিউর। যথাসময়ে রানার ডাক পড়ল। আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করি। লাউডস্পীকারে পরবর্তী পরীক্ষার্থীর নাম ঘোষিত হলে রানা বেরিয়ে আসবে।

কোথাও কিছু নেই লাউডস্পীকারে ঘোষিত হল আমার নাম! যা ব্বাবা! আমাকে ডাকে কেন? নিশ্চয় ভুল হয়েছে কোথাও কিছু। হঠাৎ দেখি ওই ঘর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে ইতি-উতি কাউকে খুঁজছেন। আমি এগিয়ে এসে আত্মপরিচয় দিতেই বলেন, আপনি একবার কাইন্ডলি ভিতরে আসুন।

সেরেছে! রানা ভীষণ একবগ্গা! সচরাচর মেজাজ খারাপ করে না। কিন্তু একবার যদি...

ভদ্রলোক আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, আপনার ছেলেকে আমরা একটা প্রশ্ন করেছি, কিন্তু জবাবে সে কী বলছে আমরা বুঝতে পারছি না।

এমনটা তো হবার কথা নয়। রানা আদৌ আধো-আধো কথা বলে না। উচ্চারণে তার কোনো জড়তা নেই। জিজ্ঞাসা করি, আপনারা ওকে কী প্রশ্ন করেছেন বলুন তো?

—আমরা ওকে একটা সবুজ পাখির নাম বলতে বলেছি। ভেবেছিলাম, ও হয় বলবে 'টিয়াপাখি' অথবা বলবে 'জানি না'। তা দুটোর একটা কথাও সে বলছে না। কী একটা মস্ত নাম বলছে। আর বলছে সেটা পাখি নয়, দেবতা! ব্যাপারটা কি?

আমি রানাকে প্রশ্ন করি, কী রানা? তুমি কোনো সবুজ পাখির নাম জানো না?

রানা রুখে ওঠে, কেন জানব না? আমি তো বারে বারেই বলছি : 'কোয়েজ্জেল ফারোমাচরাস্'। শুধু পাখি নয়—দেবতা! তা এরা কেউ কথাই বোঝে না। বারে বারে একই কথা ঘ্যানঘ্যান কচ্ছে!

আমি রানাকে ধমক দিই—'এরা নয় 'এঁরা'। আর বড়দের কি 'ঘ্যানঘ্যান করছে' বলতে হয়?

রানা গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হেডমাস্টার মশাই জিজ্ঞাসা করেন, ও কী বলছে বলুন তো?

আমি বলি, ও বলছে 'কোয়েজ্জেল ফারোমাচরাস্ মোদিনো'। অবশ্য উচ্চারণটা ঠিক ঠিক হচ্ছে কি না বলতে পারব না।

—বানানটা কী?

আমি হেসে বলি, এবার কিন্তু আপনি ওর বাবার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন।

হেডমাস্টারমশাইও হেসে ফেললেন। বলেন, না না। ব্যাপারটা শুধু জেনে নিতে চাই।

—বানানটা বোধহয় 'Quetzal pharomachrus modiono'। একটা দক্ষিণ-আমেরিকার পাখি।

—সবুজ রঙ?

—আদ্যন্ত!

—কিন্তু ও কেন বলছে—পাখিটা পাখি নয়, দেবতা?

—তার কারণ ওকে গল্প শুনিয়েছিলাম—মায়া আর ইংকা-সভ্যতায় এ পাখিটা ছিল একটা 'টোটেম'। ওরা মনে করত, এ পাখি আকাশের দেবতা। কেউ শিকার করত না।

ওঁদের কৌতূহল বোধহয় তুঙ্গে উঠেছে। একটা স্লিপ পাঠিয়ে লাইব্রেরি থেকে আনা হল ঢাউস একটা সচিত্র গ্রন্থ। দেখা গেল—রানা আর তার বাবা ভুল বলেনি।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই হেডমাস্টারমশাই বলে ওঠেন, আর একটা প্রশ্ন মিস্টার সান্যাল। বোল-ফোটার পর আপনার পুত্র কি প্রথমেই 'গুংগা' বলে চিক্কুর পেড়েছিল?

আমি হেসে বলি, আজ্ঞে না। ওর ভাইপোর নাম 'চণ্ডিদাস' নয়। পশু-পাখি চেনা ওর একটা 'হবি'। কালরাত্রেই আমরা ওই পাখিটাকে চিনেছি 'এনসাইক্লোপোডিয়া' থেকে। নিতান্ত ঘটনাচক্র বলতে পারেন।

বলাবাহুল্য, নামতায় ভুল হওয়া সত্ত্বেও তোমার মামা সেবার ভর্তি হতে পেরেছিল। কৃতিত্ব রানারও নয়, তার বাপেরও নয়, এ এক দেবতাপাখির আশীর্বাদ!

তুমি ভাগ্যবতী। তোমাকে এসব যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। শুনেছি, আমেরিকায় বাচ্চা বয়সে ঠেশে নাম্‌তা মুখস্ত করানোর চেয়ে এইসব বাইরের বই বেশি পড়ানো হয়। আমাদের অবস্থা দিন্‌কে-দিন সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌ছে। কী রকম জানো? আচ্ছা তোমার মৌ-মাসীর একটা গল্প এবার বলি শোনো :

Antara in Wonderland.

Through the Looking-glass & what Dadu found there

একদিন সকালে আমি কী একটা গল্প লিখছি। মৌ এসে কখন পাশটিতে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। ও এসেছিল একটা অজানা কথার মানে জানতে। আমি যেমন আমার বাবার কাছে গেছিলাম orthopterous কথাটার মানে জানতে। যে কথাটার মানে ও জানতে চায় সে কথাটা আমার কানে যায়নি। বোধকরি আমার তখন 'ফ্লো' এসে গেছিল। তেমন-তেমন সময় আমি একটু কালা হয়ে যাই। হঠাৎ কানে গেল মৌ আমাকে গাল পাড়ছে, বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি!

আমি তো স্তম্ভিত! বাপ্‌কে এভাবে গাল পাড়ে কেউ? কলমটা বন্ধ করে বলি, কী বললি?

—বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি!

—তুই আমাকে ওই কথা বল্‌ছিস্‌!

মৌ আঁৎকে ওঠে। শশব্যস্তে বলে, না, না, তোমাকে বলব কেন? আমি ওই কথাটার মানে জানতে এসেছি। 'হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি!' এখানে 'বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি' কথাগুলোর মানে কী?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। বলি, তাই বল! ওটা একটা 'আদরের ডাক'।

মৌ খুশি হয়ে চলে গেল। আমিও কলমের খাপ খুলে পাণ্ডুলিপির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

গোল বাধল সন্ধ্যাবেলায়। মৌ এসে অভিযোগ করল, বাবা, সকাল বেলা তুমি আমাকে কী সব ভুলভাল শিখিয়ে দিলে! স্কুলে আজ আমি বকা খেয়েছি। এই দেখ, নোট বইতে লেখা আছে 'বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি' একটা গালাগাল। মিসও ক্লাসে তাই নোট দিয়েছিলেন। আমি সেদিন অ্যাবসেন্ট ছিলাম। আজ মিস্‌ আমাকে খুব বকেছেন, 'ক্লাসে যখন নোট দেওয়া হয় তখন 'মিস্‌ বুদ্ধির ঢেঁকি'র মনটা কোথায় থাকে?

এতক্ষণে সব কথা মনে পড়ে গেল আমার। তাইতো! সকালবেলা ওকে বেমক্কা একটা ভুল কথা শিখিয়েছি নাকি?

মৌ-য়ের মা তীর্যক পন্থায় আমাকে ধমক দিলেন। অর্থাৎ বৌ-এর বদলে যেমন ঝিকে বকা হয়, তেমনি মৌ-এর বাবার বদলে মৌকেই ধমক দিলেন, তোমার বাবা যখন মনগড়া নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে মত্ত থাকেন তখন পড়া জানতে যাও কেন?

অপ্রস্তুতের একশেষ! কিন্তু কেন ওটাকে 'আদরের ডাক' মনে হল আমার? আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকি। না, ভুল বলিনি আমি। নোট বইতে যা-ই লিখুক। রবীন্দ্রনাথ 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি রচনা করেছিলেন উত্তম পুরুষে। কবির ভৃত্য প্রভুর সেবা করতে গিয়ে বিদেশে প্রাণ দিল। পাঠক যখন প্রথম স্তবকটা পড়ছে তখন সে জানে না কবিতার ক্লাইম্যাক্সটা কী হতে চলেছে। কিন্তু উত্তমপুরুষে-লেখা কবিতার কবি তো তা জানেন! সেক্ষেত্রে যে লোকটা তাঁর জন্য প্রাণ দিল তাকে প্রথম স্তবকে গাল পাড়বেন এমন মানুষ কি রবীন্দ্রনাথ! কিন্তু শুধু তাও নয়। আমার মনে হচ্ছে এর চেয়ে সুন্দরতর ব্যাখ্যা আমি আরও কোথায় শুনেছি। কার কাছে! কী করে? 'পুরাতন

ভৃত্য' কোনো কালেই আমাদের স্কুল সিলেবাসে ছিল না, আর কলেজে আমি বিজ্ঞান পড়েছি, বাংলা নয়! তবু আমার অচেতন মন বলছে, বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি একটা আদরের ডাক। কেন?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একথা বলেছিলেন স্বয়ং কবি। 'আমায় বুঝি করতে হবে আমার লেখার সমালোচন'। হ্যাঁ, অন্তরা, স্বয়ং কবি এই ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তখনই মশারি তুলে খাট থেকে নেমে পড়ি। মৌ পাশের ঘরে রাত জেগে পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করছে। তার কাছে গিয়ে বলি, মনে পড়েছে রে।

—কী বাবা?

—'বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি' কার ব্যাখ্যা অনুসারে আদরের ডাক।

মৌ হেসে ফেলে। বলে, এজন্য তোমার ঘুম আসছিল না এতক্ষণ?

আমি সে কথায় কান না দিয়ে বলি, আমি তখন কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে বি. এস্‌সি. পড়ি। সেটা উনিশ শ তেতাল্লিশ সাল। কলেজের নিমন্ত্রণ পেয়ে শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মশাই। তিনি একটা মজার গল্প শুনিয়েছিলেন। তা থেকেই আমি জানি —স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনুসারে 'বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি' কোনো গালাগাল নয়, নিতান্ত একটা আদরের ডাক। মা যখন প্রতিবেশীর কাছে বলে, 'আমার ছেলেটা যা বাঁদর হয়েছে...' তখন কী বলবি? মা ছেলেকে 'বাঁদর' বলে গাল দিল?

মধুর গন্ধে মৌ-মাছির যে অবস্থা, গল্পের গন্ধে তোমার মৌ-মাসিরও তাই। বলে, ওসব কথা থাক। তুমি গল্পটা বল বরং?

অগত্যা সবিস্তারে শোনাই গল্পটা। ক্ষিতিমোহনের ভাষায়—

অনেক-অনেকদিন আগেকার কথা। উইলিয়াম পিয়ার্সন তখন সবে গুরুদেবের সচিব হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর মনে হল, বঙ্গভাষী কবির সচিব হতে হলে তাঁকে বাংলা ভাষাটা আয়ত্ত করতে হবে। উঠে পড়ে লাগলেন পিয়ার্সন। এক সপ্তাহের মধ্যেই অক্ষর-পরিচয় শেষ হল। ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলতেও পারেন। আমাদের বলতেন তার সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে, যাতে ভাষাটা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে পারেন। একদিন হয়েছে কি, প্রশান্ত কুমার মহলানবিশ মশাই সস্ত্রীক এসেছেন পিয়ার্সনের বাড়িতে, সৌজন্য সাক্ষাতে। দ্বার খুলে বিশিষ্ট অতিথিদ্বয়কে দেখে বিনয়ে বিগলিত পিয়ার্সন যুক্ত করে তাঁদের নমস্কার করলেন। আপ্যায়ন করে বলেন, 'আসুন আসুন বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি! আসন গ্রহণ করুন।'

প্রশান্তকুমার ওঁর বেতের মোড়ায় বসতে যাচ্ছিলেন—যেন ছ্যাঁকা খেয়েছেন! ত্রিং করে দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, কী? কী বললেন আপনি?

—আমি বললেম, 'আসুন আসুন বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি! বসুন।' কেন? কোনোপ্রকার ভ্রান্তি হয়েছে কি?

—মনে হচ্ছে কিঞ্চিৎ হয়েছে! 'বেটা-বুদ্ধির ঢেঁকি' বলে আমাদের সম্ভাষণ করলেন কেন?

—আদর করে ডাকলেম, আর কি।

—ওটা একটা আদরের ডাক, একথা কে শিখিয়েছে আপনাকে?

—স্বয়ং গুরুদেব। 'পুরাতন ভৃত্য' পড়েছিলেম। ওই একটি শব্দে অনুপপত্তি উপস্থিত হল। আমি গুরুদেবকে প্রশ্ন করলেম—কথাটার অর্থ কী? তিনি বললেন, পিয়ার্সন, ওটা একটা 'আদরের ডাক' আছে!

প্রশান্তকুমার এই ব্যাখ্যায় আপত্তি জানিয়েছিলেন কি না, সে স্টাটিস্‌টিক্স্‌ সরবরাহ করতে পারেননি ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মশাই!

যে কথা বলছিলাম। আমি তো চিঠি লিখছি আজ—আটাত্তর সালের পঁচিশে জুলাই। কিন্তু তুমি এ চিঠি কবে পড়বে অন্তরা?

ওই কথাটা ভাবতে বসেই অনেক কথা মনে জাগছে, আর ব্যথায় মনটা টন্‌টনিয়ে উঠছে। তুমি এ চিঠি কবে পড়বে? আদৌ পড়বে তো কোনো একদিন? কে তোমাকে 'আ-মরি বাংলাভাষা'টা শেখাবে? মা? বাবা? তাদের সময় কই? স্কুলের চার-দেওয়াল তোমার বুকে চেপে বসবে না বটে—কিন্তু বাংলাদেশের উদার প্রান্তর, জলভরা মেঘ, শিউলির গন্ধমাখা শরৎ, শিশিরসিক্ত হেমন্তের হিম-হিম হাওয়া, এসবও তুমি পাবে না। হ্যাঁ, ভাঙা-ভাঙা কাজ-চলা বাংলা তুমি বলতে শিখবে; কিন্তু স্কুলে, পাড়ায় সর্বত্র তোমাকে ইংরেজিতেই আলাপচারি চালিয়ে যেতে হবে। তুমি এ চিঠির রসগ্রহণ একদিন না একদিন করতে পারবে তো অন্তরা? বুঝতে পারবে তো—কেন হেডমাস্টার মশাই, জানতে চেয়েছিলেন, তোমার রানামামা 'গুংগা' বলেছিল কি না?

হয়তো আজ থেকে দু-তিন বছর পরে তোমাতে-আমাতে প্রথম সাক্ষাৎ হবে। হয়তো দমদম কিংবা সানফ্রান্সিস্কো এয়ারপোর্টে। অথবা কে জানে, হয়তো তোমাদের ওয়ালনাট ক্রিক বাড়ির পোর্টিকোতে। ততদিনে তুমি হাঁটতে শিখেছ। আমাকে দেখেই তুমি সিঁটিয়ে যাবে। মায়ের পিছনে লুকিয়ে জুল-জুল চোখে আমাকে দেখতে দেখতে অস্ফুটে মাকে প্রশ্ন করবে, Who's that old guy, Mom?

তোমার মা ধম্‌কে উঠ্‌বে, Don't be silly Antara! He's Your Grand-pa।

গ্র্যান্ড-পা! সে আবার কী-জাতের জন্তু? তুমি অবাক হবে। এমন জিনিস তো তুমি আগে দেখনি কখনো। তোমার নার্সারি-ঘরে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়ার তাল খুঁজবে।

আমি তখন তোমাকে কেমন করে বোঝাব অন্তরা-তোমাকে বুকে চেপে ধরে চুমায় চুমায় তোমার ওই টমাটো-গালটা ভরে দিতে আমার কী আকূতি জাগছে। আমি হয়তো ক্যান্ডি-কুকি বার করে তোমার মন ভোলাতে চাইব। কিন্তু ওসব তুমি অনেক খেয়েছ। ভবি তাতে ভুলবে না।

ক্রমে ভয় ভাঙবে। কাছে আসবে। কোলেও উঠে বসবে। হয়তো বলবে, টেল্ মি আ স্টোরি গ্র্যান্ড-পা।

স্টোরি! আমি পাব কোথায়? ভালো 'গপ্পুড়ে' বলে যে জাঁকটা আছে, সেটা তোমার কাছে ভাঙবে। বিশ-ত্রিশ বছর ধরে বানিয়ে বানিয়ে অনেক গপ্পো ফেঁদেছি এতদিন। কিন্তু তোমার মন ভুলানো গল্প তো আমার পুঁজিতে নেই! গ্রিমস্? এ্যাণ্ডরসন? লুই ক্যারল আর স্টিভেনসন? ওসব গল্প তুমি অনেক শুনেছ, টি ভি-র পর্দায় দেখেছ। আমি হার মানব।

দিনগুলো হু-হু করে কেটে যাবে। সপ্তাহগুলো সব যেন জেট প্লেন। তোমার বাবু বলবে, গ্র্যান্ড-ক্যানিয়ন্স দেখবেন না? ইয়েসোমেটি? নায়গ্রা?

আমি বলব, দূর! আমি কোথাও যাব না। ওই ফায়ার-প্লেসের ধারে গ্র্যাণ্ড-ফাদার চেয়ারে বসে থাকব অন্তরাকে কোলে নিয়ে। তিন মাসের ভিসা শেষ হবে অচিরে। ডাক পড়বে ফিরে যাওয়ার। ততদিনে তুমি আমার ন্যাওটা হয়ে পড়েছ। বুঝতে পেরেছ—লোকটা বুড়ো বটে তবে কামড়ে দেয় না, বরং আঙুল দিয়ে ছায়া-রচনা করে সে দেওয়ালে হাতি-খরগোশ-উট বানাতে পারে; রুমাল দিয়ে ইঁদুর বানাতে পারে, ম্যাজিকের খেলা দেখাতে জানে, আর জানে, ঘোড়া হয়ে 'হেট ঘোড়া-হেট' খেলতে। ক্রমে তুমি আমার কাছের মানুষ হয়ে গেছ। আমাকে ভালোবাসতে শিখেছ।

ঠিক তখনই আসবে বাঁধন-ছেঁড়ার ডাক।

তোমার গালটা টিপে দিয়ে আমি গাড়িতে উঠে বসব। তোমার বাবা স্টিয়ারিঙে, মা তোমাকে কোলে নিয়ে আমার পাশে বসল। গাড়ি চলেছে এস.এফ. এয়ারপোর্ট। মায়ের চোখ দুটো ফুলোফুলো। আমিও পকেট থেকে রুমাল বার করে বারে বারে চশমার কাচ দুটো মুছে নিচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটাই সেদিন তোমার কাছে অদ্ভুত লাগছে, Why are they all so cranky? What's happened?

অবশেষে এয়ারপোর্ট। প্রোটেক্টেড এন্ক্লোজারে ঢুকবার মুখে তোমার মা নিচু হয়ে প্রণাম করল, তুমিও মায়ের দেখাদেখি নিচু হতেই আমি তোমাকে কোলে তুলে নিলাম। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলি, অন্তরা! প্লিজ রিমেম্বার মি!

তুমি কিছুই বুঝলে না। তবু বুড়ো-মানুষটার জন্য তোমার কেমন যেন করুণা বোধ হল। জোর দিয়ে বললে, ই-য়া, গ্র্যান্ড পা, আই উইল!

বোকা মেয়ে! তাই কি সম্ভব? পৃথিবীর অপরপ্রান্তে ফিরে-যাওয়া এই বুড়োটাকে তুমি কেমন করে মনে রাখবে? তোমার নিত্য-নতুন কত আকর্ষণ। লিজা আছে, জসুয়া আছে, মেলনী আছে, ক্রিস্টিন আছে—ওরা যে সর্বক্ষণ তোমাকে ঘিরে থাকবে, ওরা

যে প্রত্যক্ষ বর্তমান। গন্ধ্যা শহরের সেই অন্ধ এ্যান্টিপড যে বহু দূরের মানুষ। কতদিন আর তাকে মনে রাখা সম্ভব? না অন্তরা, সেজন্য তোমাকে দোষ দেব না আমি।

তারপর?

তারপর একই তালে সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহ তার চিরাচরিত ছকে সূর্য-প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। একটির পর একটি পাপড়ি খুলে অন্তরা কুঁড়ি ফুল হয়ে উঠ্‌বে আর তার গ্র্যান্ড-পা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলবে একটা অজানা অচেনা রাজ্যের দিকে।

তুমি আপার প্রেপ-এ উঠ্‌বে। কত-কত বই পড়বে। কত-কত নতুন আবিষ্কার—যে সব আবিষ্কারের কথা তোমার গ্র্যান্ড-পা কল্পনায় দেখত। মাঝে মাঝে তুমি আমার চিঠি পাবে। কোন ভাষায়? আমার চিঠি কি আমি বাংলা ভাষায় লিখব? যেমন লিখি তোমার মাকে, বাবাকে? তুমি তাই লিখতে বলবে আমাকে। কারণ তুমি জান, ওই-কথা লিখলে তোমার এন্ডিপড গ্র্যান্ড-পা খুশি হবে। কিন্তু আমি তো জানি—ইংরেজিতে চিঠি লিখলেই তোমার সুবিধা। তাই আজকের মতো সাদা বাঙলায় আমি চিঠি লিখব না। তুমি রাগ করবে; জিদ্ করে বাংলায় জবাব দেবে। সে চিঠি কিন্তু তাহলে তোমাকে দু-দুবার শিখতে হবে, অন্তরা। কারণ প্রথম চিঠিখানা পড়ে তোমার মা এমন নির্মমভাবে কলম চালাবে যে, এমন কাটাকুটিতে ক্ষতবিক্ষত চিঠি গ্র্যান্ড-পাকে পাঠাতে তোমার নিজেরই সঙ্কোচ হবে। বাধ্য হয়ে আবার কপি করতে হবে। সেটা আমি বুঝব। বুঝব যে, তার অনেকটাই তোমার মায়ের ভাষা। কিন্তু সেটা স্বীকার করব না। আত্মীয়স্বজনের কাছে তো নয়ই, এমনকি নিজের কাছেও নয়। আমি সে চিঠি পাড়ায় পাড়ায় দেখিয়ে বলব : এই দেখো! আমার নাতনি কী সুন্দর বাংলায় চিঠি লিখতে পারে। তোমরা যে বল—সে মেম হয়ে গেছে, তা মোটেই নয়।

তুমি হয়তো আমাকে খুশি করবার জন্য একদিন শাড়ি পরে বাবাকে দিয়ে ফটো তুলিয়ে আমাকে পাঠাবে। আমি বুঝব যে, তুমি শাড়ি পরো না, মিডিম্যাক্সি-ফ্রক পরো; কিন্তু সে-কথা চেপে গিয়ে তোমার দিদিমাকে বলব এই দেখ, অন্তরাও আজকাল শাড়ি পরে।

তোমার দিদিমাও বুঝবে কথাটা ফাঁকি দিয়ে গড়া; কিন্তু পাছে তোমার গ্র্যান্ড-পা আঘাত পায় তাই বল্‌বে না—ঘোড়ার ডিম! ও তোমাকে খুশি করার জন্য শাড়ি পরে ফটো তুলেছে; বরং বলবে, দেখেছ? শাড়ি পরলে ওকে ঠিক বুলবুলের মতো দেখায়!

এ নিয়ে এ পাড়ায় আমাদের তর্ক হবে। আমরা পুরনো ফটো অ্যালবাম বার করে তোমার সদ্য-তোলা ফটোর সঙ্গে তোমার মায়ের ওই বয়সের ফটো মেলাতে বসব।

আমি বলব, চোখ দুটো হয়েছে বুলবুলের মতো, কিন্তু ফেস্‌কাটিংটা পেয়েছে অমিতাভর।

তোমার দিদিমা—ও হরি, তুমি তো এখনো জানোই না—তোমার দিদিমার ধারণা, এসব বিষয়ে আমি তালকানা। তাই সে বলবে, 'তুমি কী ট্যাল্‌লা! দেখছ না চোখ দুটোই হয়েছে অমিতাভর মতো। বরং মুখের আদলটাই হয়েছে খুকুর মতো!

'ট্যাল্‌লা' কী? 'গালাগাল' না 'আদরের ডাক'? সেটা অত সহজে জানা যায় না, অন্তরা। সেটা জানতে হলে তোমাকে মৈমনসিংহের ছেলেকে বিয়ে করতে হবে!

যাহোক, আমি তর্ক করব না। কারণ আমি তো জানি—তুমি হয়েছ ঠিক অন্তরার মতো!

আমার অন্তরে যে ভবিষ্যৎ-অন্তরা লুকিয়ে আছে, ঠিক তার মতো।

তারপর?

হ্যাঁ, তারও পর তুমি কলেজে ভর্তি হবে। মোটা মোটা বই পড়তে হবে তোমাকে। তখন আর তোমাকে বোধহয় ক্লাস করতে হবে না। টি. ভি. স্ক্রিনের সামনে বসে নোট নেবে। অনেকে-অনেক বন্ধু হবে তোমার। তাদের নিয়ে হৈ চৈ, আউটিং, পিকনিক, হলিডে ক্যাম্পা! মাঝে মাঝে সপরিবারে হয়তো যশোমতীতে (ইংরেজি বানান অবশ্য Yasomite) সপরিবারে পিকনিকে যাবে। ওটা তোমার বাপির ভীষণ প্রিয়। মা বলবে, অন্তরা, বাপিকে স্টিয়ারিঙে বসতে দাও।

তুমি ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে, হোয়াই মম্? আই হ্যাভ এ-গ্রেড লাইসেন্স!

মা বলবে, তা হোক।

তুমি অভিমান করবে। তোমার বাপি সান্ত্বনা দেবে, ফরগেট অ্যাবাউট ইট!

তুমি সরে বসবে স্টিয়ারিঙ থেকে। বাপিই চালাবে গাড়িটা। ক্রমশ অভিমান দ্রব হবে তোমার। গতির আবেগে মেতে উঠবে। সারাদিন আউটিং করে ফিরে এসে মনে পড়বে : কাল আবার উইক্‌লি টেস্ট আছে। আর ওই সঙ্গে মনে পড়বে—কাল সন্ধ্যায় তোমার 'ডেট'!

'He"ll be waiting for me."

তারও পর?

আর তো জানি না অন্তরা!

জানি, কিন্তু লিখতে ভরসা পাচ্ছি না। সে-সব কথা লিখলে তোমার মা এই আনন্দের দিনে চোখে আঁচল চাপা দেবে!

এরপর আমাকে যে লিখতে হবে সেই বিশেষ সন্ধ্যাটির কথা! সেই যেদিন মা-বাপের বুক খালি করে দিয়ে তুমি নতুন মানুষের হাত ধরে নতুন সংসার পাততে রওনা হয়ে পড়বে—

'আপনি বুঝিয়া দেখ, কার ঘর কর।'

আমি তোমার বিবাহ-সন্ধ্যার কথাটা বলছি, অন্তরা!

কী সুন্দর সেজেছ তুমি! তোমার গায়ে ব্রোকেডের ব্লাউস, তোমার পরনে লাল বেনারসি, তাতে সোনালি আঁচলা, মাথায় গোলাপি ভেইল। পায়ে আলতা, কানে জড়োয়া দুল, মুখে লাজুক হাসি। কোণের ঘরে তোমাকে কনে-চন্দন পরাচ্ছিল তোমার ছোটো ভাই—বিয়ের লগ্নের আর বেশি দেরি নেই। হঠাৎ তোমার বাবা এসে ডাকল তোমাকে : অন্তরা! একবার বাইরে আসতে হবে। একজন এসেছেন, প্রণাম করে যাও।

সবাই হৈ হৈ করে প্রতিবাদ জানাবে। তোমার মায়া হবে বাপির জন্য।

এমন সময় রব উঠবে : বর এসেছে! বর এসেছে!

হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, চিৎকার চেঁচামেচিতে শোনা যাবে না লং-প্লেইং রেকর্ডের সানাই। তোমার বুকটা তখন টিপ্ টিপ্ করছে। বর তোমার অচেনা নয়—তবু বিয়ে বলে কথা!

কোথা দিয়ে সন্ধ্যাটা কেটে গেল টেরই পেলে না তুমি।

যতই একবিংশতি শতাব্দীর মানুষ হও তোমরা—ওই একটি দিন তোমার বরকে সঙ সাজতে হবে : পরনে চেলি, মাথায় টোপর, হাতে দর্পণ, আর মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি।

: মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণো সন্তু ওষধিঃ—

হ্যাঁ, চিরকালের বিবাহ বাসরের মতো আজও সবই মধুময়। বাতাস মধু, আকাশ মধু, ওষধি মধু—এই যে নক্তম্, রাত্রি, এটাই মধুময়।

তোমার বাপি চিরটাকাল যাকে সার্ট-প্যান্ট জুতো-মোজাই শুধু পরতে দেখেছ তার আজ গরদের জোড়, সিল্কের উড়ুনি। অনামিকায় কুশের অঙ্গুরীয়।

: প্রতিগৃহ্লামি! প্রতিগৃহ্লামি!

শেষ হল সম্প্রদান। তোমার মা জড়িয়ে ধরে আল্পনা-আঁকা পিঁড়ি থেকে তোমাকে তুলল। মায়ের হাত ধরে গাঁট-ছড়া-বাঁধা মানুষটার পিছন-পিছন এবার তুমি বাসর-ঘরের দিকে চলেছ। ভিড়ে-ভিড় বিবাহ-বাসর। অনেক-অনেক চেনা মুখ নজরে পড়ছে তোমার—জসুয়া, মেলনী, ক্রিস্টিন।

হঠাৎ বাসর ঘরের প্রবেশপথে তোমার মা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু চমকে উঠলে তুমি। তোমার মা কী যেন বলতে গেল—পারল না।

—কী মম্?—অস্ফুটে প্রশ্ন করলে তুমি।

দাঁতে দাঁত চেপে তোমার মা কোনোক্রমে বলল : ওঁকে প্রণাম করো।

হঠাৎ থমকে গেলে তুমি। দেখতে পেলে—বাসরঘরের দরজার উপর একখানা এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ। কে যেন বুদ্ধি করে আজকের এই বিশেষ দিনে সেই ফটোখানায় একটা জুঁইফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে।

চিনতে পারলে তুমি। মায়ের আলমারিতে অনেক-অনেক বাংলা বইয়ের ব্যাক-কভারে ওই চেহারাটা দেখেছ। শুধু তাই বা কেন—বুড়োটার কথা তো তুমি একেবারে ভুলে যাওনি। অনেক-অনেকদিন সেই বুড়োটার কথা তোমার মনে পড়েনি। এই যা। আজ পড়ল।

এ সেই বুড়োটা—যে ছেলেবেলায় তোমার গালে চুমু খেয়েছিল, দেয়ালে হাতের ছায়া ফেলে হাতি-ঘোড়া দেখিয়েছিল, রুমালে ইঁদুর বানিয়ে কত হাসিয়ে ছিল। আর তোমাকে পিঠে করে খেলেছিল হেট-ঘোড়া-হেট! এ সেই বুড়োটা!

চিনতে পেরেছ তুমি। মিটিমিটি হাসছে, আর তোমাকে আশীর্বাদ করছে ছবির ভিতর থেকে—

তোমার
গ্র্যান্ড-পা!